চিত্রবীক্ষণ

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র



মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

দ্বাদশ বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা
মে, '৭৯

চিত্রবীক্ষণ



বিষয়সূচী

সম্পাদক : অনিল সেন

প্রচ্ছদচিত্র : মহানগর (পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়)
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

চিত্রবীক্ষণে

লেখা পাঠান।

চিত্রবীক্ষণ

চলচ্চিত্র বিষয়ক যে কোন

ভালো লেখা

প্রকাশ করতে চায়।

এই বছরে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের চিত্রবীক্ষণে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল সংখ্যায় ভুল করে Vol. 13 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol. 12. অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের বদলে দ্বাদশ বর্ষ।

এছাড়া October '77 থেকে September '78 অবধি গোটা বছরের সংখ্যায় ভুল করে Vol. 12 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol. 11 অর্থাৎ দ্বাদশ বর্ষের বদলে একাদশ বর্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বছরে মাত্র তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছে অক্টোবর থেকে মার্চ একটি সংখ্যা, এপ্রিল একটি সংখ্যা এবং মে থেকে সেপ্টেম্বর আর একটি সংখ্যা।

চিত্রবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ টাকা। লেখকের মতামত নিজস্ব, সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে।

লেখা, টাকা ও চিঠিপত্রাদি
চিত্রবীক্ষণ, ২, চৌরঙ্গী রোড,
কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭৯১১)
এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

গ্রাহক

* চাঁদার হার বার্ষিক পনেরো টাকা (সডাক), রেজিস্টার্ড ডাকে তিরিশ টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।
* বৎসরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।
* চেকে টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখার ওপর চেক পাঠাতে হবে।
* টাকা পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, কতদিনের জন্য চাঁদা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালে কুপনে ওই তথ্যগুলি অবশ্যই দেয়।

লেখক :

* লেখক নয় লেখাই আমাদের বিবেচ্য। পাণ্ডুলিপি রেখে কাগজের একদিকে লিখে নিজের নাম ও ঠিকানাসহ পাঠানো প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

সমগ্র কলকাতার একমাত্র এজেন্ট
জগদীশ সিং,
নিউজ পেপার এজেন্ট, ১, চৌরঙ্গী রোড,
কলকাতা-১৩

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের আহ্বান

এবছরটা অর্থাৎ ১৯৭৯ সাল আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসেবে দেশে দেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমাদের মত দেশে যেখানে অধিকাংশ শিশুর জন্য অনাহার, অশিক্ষা আর অপুষ্টি অপেক্ষা করছে সেখানে এই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্‌যাপন নিতান্তই নিয়মরক্ষার মত একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার।

তবুও হয়তো এই নিয়মরক্ষার তাগিদেই কিছু কথা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে। আমাদের এই চিন্তা-ভাবনা অবশ্যই চলচ্চিত্র সম্পর্কিত কেননা আমরা মূলত চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

স্বাধীনতা পেরিয়ে বত্রিশ বছরেও আমাদের দেশে ছোটদের জন্য ছবির ব্যাপারটা কিছুই এগোয়নি। যতটুকু হয়েছে যা কিছু হয়েছে সবই বড় বড় শহরে—এয়ার-কণ্ডিশনড্ সিনেমা হাউসে আইসক্রীম-পপকর্ণ ইত্যাদি খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের ছবি দেখা বা দেখানোর ক্বচিৎ কদাচিৎ উৎসব জাতীয় অনুষ্ঠান।

বেশ কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বৃহৎ অর্থানুকূল্যে তৈরী হয়েছিল চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি। এই প্রতিষ্ঠানটি যেন শ্বেত হস্তীর মত। এই সংস্থার উদ্যোগে কিছু কিছু ছবি তৈরী হলেও তা দেখানোর কোনো নেটওয়ার্ক নেই। বিদেশ থেকে যেসব ছবি আনা হয়েছে তার বেশীর ভাগই বাক্সবন্দী। আর পূর্বভারতে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম নেই বললেই চলে।

বরং কিছু কিছু বেসরকারী শিশু চলচ্চিত্র সংগঠন নিজেদের উদ্যোগে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রশংসনীয়ভাবে শিশু চলচ্চিত্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন—শহর এবং শহরতলীর বহু স্কুলের ছেলেমেয়েরা এজাতীয় অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পেয়েছে। অবশ্য এই উদ্যোগ ব্যাপক আন্দোলনের চেহারা নেয়নি কোনোদিন এবং এব্যাপারে সাধারণ ফিল্ম সোসাইটিগুলি এযাবতকাল বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আর এই সব শিশু চলচ্চিত্র সংগঠনের কার্যক্রমও সাম্প্রতিক ২-৩বছরে বেশ কিছুটা স্তিমিত। প্রয়োজনীয় ছবির অভাব এবং সাংগঠনিক সমস্যাই সম্ভবত এর কারণ।

আর চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা এযাবতকাল শিশু চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষ কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। যা দু-চারটি ছবি এখানে ওখানে তৈরী হয়েছে তার মধ্যে বেশীর ভাগ ছবি শিশুচিত্র হিসেবে বিজ্ঞাপিত হলেও আসলে শিশু মানসের পরিপন্থী কাজ করেছে। একমাত্র ব্যবসায়িক ঝোঁকই এজাতীয় ছবি নির্মাণকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে।

আমাদের রাজ্য সরকার আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্‌যাপনের কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। ছবির ব্যাপারটাও এর মধ্যে রয়েছে। বেলেঘাটায় ওপেন-এয়ার শিশু চিত্রগৃহ নির্মাণ, আট-নটি শিশুচিত্র তৈরী এবং শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠান এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

এই কর্মসূচী নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু আমরা চাইছি, একান্তভাবে চাইছি এই বছর শেষ হয়ে যাবার পরেও এজাতীয় কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকুক। আর শুধু কলকাতা বা জেলা শহরগুলিতেই নয়, গ্রামবাংলার অসংখ্য ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বাচ্চাদের ভালোলাগার মত ছবি দেখানো হোক। এমন সব ছবি তৈরী করা হোক যাতে ছোটরা এখন থেকে দেশকে চিনতে পারে, পরিবেশকে চিনতে পারে, আগামী দিনের মোকাবিলায় নিজেদের তৈরী করে নিতে পারে। রাজ্যের প্রাইমারী সমেত সমস্ত স্কুলে এই ছবিগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কার্যক্রমকেও আরো ব্যাপক করে তুলতে হবে।

এছাড়া বছরে অন্তত দুটি রবিবার সকালে প্রতিটি চিত্রগৃহে, বাধ্যতামূলকভাবে নামমাত্র প্রবেশমূল্যে শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হোক। এমনভাবে এই প্রদর্শনসূচী তৈরী করতে হবে যাতে অল্পসংখ্যক ছবি নিয়েও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতিটি চিত্রগৃহে এজাতীয় প্রদর্শনী করা যায়।

আর এই পরিবেশনা প্রযোজনা ইত্যাদি গোটা কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই রাজ্যে একটি চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি গঠনের প্রশ্নটিও আজ অত্যন্ত জরুরী।

এদেশকে আগামী দিনের শিশুদের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের অঙ্গীভূত করে শিশু চলচ্চিত্রকে আরো প্রসারিত করা হোক আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ এই আহ্বানই জানাচ্ছে।

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা ঃ দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা ঃ বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভুপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস,
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা ঃ বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা ঃ মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি ঃ

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন কি জনগণমুখী হবে, অথবা উচ্ছন্নে যাবে ?

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

Objects of Federation of Film Societies of India—

(a) To promote the study of the film as an art and as **a social force**

—From the Memorandum of the Federation of Film Societies of India.

গত পঞ্চাশের দশক থেকে যে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন প্রায় ত্রিশ বছরের সময়কালের পথ পরিক্রমা করে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, সেই শিল্প-আন্দোলনের অগ্রগতির কোন সামগ্রিক রূপরেখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার জন্য এই নিবন্ধটি নয়। বরং এই আন্দোলনের মূল দুর্বলতা সম্পর্কেই কিছু কথা এখানে বলার চেষ্টা করা হবে তৎসহ তা দূরীকরণের জন্য কিছু প্রস্তাব।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন যে একটা জায়গায় এসে রুদ্ধ হয়ে গেছে—এতে কারুর কোন মিথ্যা সংশয় থাকার কথা নয়। এবং ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সাধারণ সত্য অনুযায়ী কোন চলমান শক্তিই 'রুদ্ধ' হয়ে এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, হয় সে এগিয়ে যাবে, নয় বিকৃতির পথে শুরু হবে তার পশ্চাদ্‌গমন। এই দুটির মধ্যে এই আন্দোলনের ভাগ্যে কি আছে তা নির্ভর করছে আজকের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অংশভাগী মানুষদের ওপর, বিশেষ করে সুস্থ সামাজিক চেতনাসম্পন্ন ও চলচ্চিত্রবোধ সম্পন্ন তরুণ সম্প্রদায়ের ওপর।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের বর্তমান রুদ্ধতার বা অবক্ষয়ের সম্পর্কে আদি স্রষ্টারা সহ আন্দোলনের তরুণ কর্মীরা সবাই নানা সময়ে নানান সমালোচনা করেছেন, কিন্তু যে আলোচনা আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে হয়েছে সেটি করেছেন এই আন্দোলনের আদি স্রষ্টাদের প্রধানতম ব্যক্তি সত্যজিৎ রায়। আন্দোলনের আদি পিতৃসদৃশ ব্যক্তি বলে তাঁর সমালোচনাটি এমনিতেই মূল্যবান, কিন্তু শুধু সেই জন্যই নয়, তাঁর বক্তব্য তার গভীরতা ও তীব্রতার জন্যও চিন্তা উদ্রেককারী এবং এই সমালোচনাটি সত্যজিৎ রায় করেছেন তাঁর নিজস্ব অনুপম চলচ্চিত্রের ভাষায়, সেটি আছে তাঁর একটি প্রধান ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র একটি সিকোয়েন্সে। যা আমরা অনেকেই দেখেছি।

সেখানে আমরা দেখেছি, ছবির নায়ক সিদ্ধার্থর দুটি বন্ধুকে অবস্থা স্বচ্ছলতর থাকায় যারা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে পারছিল (এবং আর্থিক সংকটে দ্বিতীয় বর্ষে উঠেই সিদ্ধার্থকে পড়া ছেড়ে চাকরির সন্ধান করতে হচ্ছিল)। তাদের একজন 'রেডক্রসে'র বাক্স ভেঙে পয়সা চুরি করে সেই পয়সায় সিদ্ধার্থকে চীনা রেস্তোরাঁয় খাদ্য ও মদ্য পান করিয়ে নিয়ে গিয়েছিল 'বেশ্যালয়ে'। অন্য বন্ধুটি সিদ্ধার্থকে নিয়ে গিয়েছিল কোন ফিল্ম সোসাইটির শো দেখতে। উদাসীন সিদ্ধার্থ যাবার আগে প্রশ্ন করেছিল সেখানে গিয়ে সে কি পাবে—উত্তরে শুনেছিল 'গরম' —অর্থাৎ এমন কিছু যৌনাত্মক রসদৃশ্য যা এদেশের সাধারণ দর্শক সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে পায়না। পরিচালক সেই 'শো'-এর কিছু অংশ দেখালেন, এবং যেহেতু তিনি রুচিবান মানুষ, তাই সেই সেই 'শো'-এর 'বেডরুম' দৃশ্যের সূচনায় ছবির সিকোয়েন্সে কাট্ করে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সভ্য কারা, তাঁদের চাহিদা কি, এত দ্রুত ফিল্ম সোসাইটিগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির মূলে কী কী শক্তি কাজ করছে—এসবের সামগ্রিক মূল্যায়ন এই সিকোয়েন্সে অবশ্যই করা হয়নি—ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এইটুকুর মধ্যে তা করতে চাননি, করা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু প্রৌঢ় পিতা যেমন নব্য পুত্রের চারিত্রিক গলদকে তুলে ধরে তিরস্কার করেন, অনেকটা তেমনি করেই এই আন্দোলনের একটা বৃহৎ অবক্ষয়কে তিনি তাঁর নিজের ভাষায় নির্মমভাবে তুলে তিরস্কৃত করেছেন—এটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যাবার কাজ নয়। বস্তুত ওই সিকোয়েন্সে এক বন্ধুর সাক্ষাৎ বেশ্যালয়ে যাওয়া ও অন্য (কিছু ভদ্রতর স্বভাবের) বন্ধুটির ফিল্ম সোসাইটির শো দেখতে যাওয়া—এই 'বেশ্যালয়' ও 'ফিল্ম সোসাইটির শো' দুয়ের সমান্তরালতা এতই স্পষ্ট যে কষাঘাত আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছয়, যদি অনুভূতি বলে বা বিবেক বলে কিছু থাকে। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠাতার যে অন্তরের জ্বালাটা আছে তাতে সন্দেহ মাত্র থাকে না এবং তখনি বোঝা যায় আজ ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের দুরবস্থা স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতাকে কী দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।

কিন্তু ১৯৬৯ সালে আমরা ওই সিকোয়েন্স তথা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবি দেখেছি. এবং তারপরেও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন চলছে, কোথাও 'ট্র্যাডিশন' ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে তো মনে হয় না। প্রশ্ন এইখানেই—এই গলদের মূলটা কোথায়, কীভাবে এই গলদ দানা বাঁধল, কেন বেশ্যালয় যাবার তাগিদেরই সমান্তরাল কিন্তু কিছুটা সূক্ষ্মতর বা ভদ্রতর (বা নিরীহ) তাগিদই আজ একদল তরুণকে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের 'সামিল' করেছে (তথাকথিত ভাবেও), যে আন্দোলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ও লিখিত

ভাবে আজো আছে—চলচ্চিত্রকে গভীরভাবে দেখা শিল্প হিসেবে এবং সামাজিক শক্তি হিসেবে।

ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, গত দুই দশক ধরে এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে যুক্ত থেকে, এবং পশ্চিমবাংলার একটি পশ্চাদপদ ও অবজ্ঞাত (যে রকম পশ্চাদপদ অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত আর কোন ফিল্ম সোসাইটি স্থাপিত হয়নি, যে সোসাইটি বর্তমানে মৃত*) কয়লাখনি অঞ্চলে একটি ফিল্ম সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি—এই সমগ্র আন্দোলনটি যে রোগে ভুগছে তাকে বলা উচিত 'শৈশবকালীন রোগ'। অর্থাৎ কিনা প্রায় শৈশবাস্থা থেকেই এই আন্দোলনটির মধ্যে একটি গলদ থেকে গেছে। এবং সেটি হচ্ছে, প্রথমাবধি এটিকে দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক সামাজিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিশুদ্ধ মধ্যবিত্তভিত্তিক কিছু 'বিদগ্ধ' সংখ্যালঘিষ্ঠ শহুরে মানুষের অতৃপ্ত চলচ্চিত্রীয় ক্ষুধার তৃপ্তি সাধনের আন্দোলন হিসেবেই গণ্য করে আসা। সেই গলদটি আদি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও ছিল। অন্ততঃ একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ফিল্ম সোসাইটিগুলির 'লক্ষ্য' বলতে যে চলচ্চিত্রকে 'সামাজিক শক্তি হিসেবে' দেখার কথাটা তাঁদের সংবিধানে ছিল—যা পালন করতে গেলে সোসাইটিগুলির কিছু 'সামাজিক দায়িত্বে'র কথা আসা অনিবার্য সেই সামাজিক শক্তি হিসেবে চলচ্চিত্রকে দেখা ও তৎসম্পর্কিত সামাজিক দায়িত্ব পালন—এগুলিকে বরাবরই গৌণ স্থান দিয়ে আসা হয়েছে। মুখ্য স্থান পেয়েছে, আঙ্গিককলায় উৎকৃষ্ট বিদেশী ছবি দেখার ব্যাপারটি, চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝার ব্যাপারটি এবং দেশীয় অসুস্থ তথাকথিত 'কমার্শিয়াল' ছবির বিকল্প কিছু তথাকথিত 'সুস্থ আনন্দের' ছবি যাতে কিছু স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত মানুষ ঘরের কাছে কম অর্থব্যয়ে উপভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। প্রথমাবধি এই আন্দোলনের কার্যক্রমের মধ্যে এটা কেউ ধরে নেননি যে, যেহেতু বিপুল প্রভাবশালী চলচ্চিত্র একটি গণমাধ্যম, সুতরাং আন্দোলনকে এভাবে চালিত করা উচিত যাতে—শুরুতে মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক হলেও ক্রমশঃ তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে যে বিপুল জনগণ আছেন, তাঁদের কাছে আসতে পারা যাবে। এটা প্রথমাবধি কেউ ধরে নেননি যে, অন্য একধরণের চলচ্চিত্র যা বিপুল সংখ্যায় জনগণ দেখে থাকেন, সেই জনগণ দর্শনধন্য ছবির প্রভাবের মধ্যে পড়ে আছে যে সাধারণ দর্শক শ্রেণী—তাঁদের কাছেও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের কোন 'সামাজিক' মূল্য থাকবে! অথচ এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

ফলে কী হয়েছে? ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন হয়ে গেছে একটি 'স্যাটারডে ক্লাব' বা 'ডাইনার্স ক্লাব' গোছের ক্লাবের তৎপরতা, যেখানে গেলে প্রচলিত মোটা ভাত ডালের বদলে কিছু ফরাসী বা চেক বা রুশ বা জার্মান ইত্যাদি কিছু তথাকথিত 'সুখাদ্য' পাওয়া যাবে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের মধ্যে যে আমোদদানের ব্যাপারটা আছে যা একধরণের ম্যাজিকের মত আমাদের মনের মধ্যে কাজ করে, যার প্রভাবে আমরা 'ববি' 'মুকদ্দর কা সিকন্দার' বা 'ধনরাজ তামাং' দেখার জন্য দীর্ঘ লাইন দিই (এবং প্রকাশ্যে নিন্দাও করি), সেই প্রমোদলাভের গূঢ় ইচ্ছাটাই শুধুমাত্র আরো একটু সূক্ষ্ম 'বিদগ্ধ' ও 'সৌখিন' চেহারায় আমাদের মধ্যে কাজ করে যখন আমরা ফিল্ম সোসাইটিগুলির এক একে পত্তন করি। আমরা সেই অনন্তকালের সবচেয়ে গালভরা মহান শব্দটি যখন উচ্চারণ করি—যার নাম শিল্প—তখনো তাকে 'উপভোগ্য বস্তু' ছাড়া আর কিছু ভাবিনা।

একজন বালকও জানে শিল্পে 'উপভোগের' ব্যাপারটা একটা মস্ত বড় প্রয়োজনীয় ব্যাপার, তাকে তুচ্ছ করা মানে শিল্পের প্রাণ সত্তার একটি মূল স্থানে আঘাত করা। কিন্তু এটা কি সবাই অনুভব করেন যে, শিল্পে 'উপভোগে'র ব্যাপারটাকেই শেষ কথা ধরলেও শিল্পের প্রাণে আঘাত করা হয়, উপভোগ্য বস্তু হয়েই শিল্প আরো অনেক কিছু—তার উপভোগ্য বস্তুসত্তাকে জড়িয়েই এবং উপভোগের স্তরকে ছাড়িয়ে আসে শিল্পের এক 'আলোকোজ্জ্বল বস্তুসত্তা', যার জন্য শিল্প শুধুমাত্র আমাদের আরাম ও উপভোগের আনন্দই দেয় না, আমাদের নিজেদের চারিদিকের বাস্তবতাকে চিনতে শেখায়, এই মানব সমাজকে, তার শক্তিগুলিকে, এমনকি আমাদের নিজেদের সত্তাকেও—শিল্পের এই সত্তা আমাদের ভিতরের সৃজনী শক্তিকে উদ্বোধিত করে, যে সৃজনীশক্তি শুধু নূতনতর শিল্প সৃষ্টিই করে না, আমাদের চারিপাশের বাস্তবতার মধ্যে যা কিছু অমানবিক তার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। বস্তুতঃ শিল্পের মহত্ত্বের পরিচয় আসলে এইখানেই। মহৎ আলোকোজ্জ্বল শিল্প উপভোগ্য শিল্প হয়েই তাই এত মহত্ত্বের পদবাচ্য। এই জন্যই টলস্টয়কে আমরা সমারসেট মমের চেয়েও মহত্তর স্রষ্টা বলে থাকি, বা কবি বোদলেয়রের চেয়ে (যাঁর কবিতার শৈল্পিক কারুকাজ নাকি তুলনাহীন, পণ্ডিতেরা বলেন) কবি গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথকে। হিচকক একজন অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পী, তুলনাহীন তাঁর শৈল্পিক কাজ এবং তাঁর ছবির উপভোগ্যতা প্রায় সর্বজনীন. কিন্তু তবুও সারা পৃথিবীর গুণী মানুষ স্বীকার করবেন আইনজনস্টাইন বা রেনোয়াঁ মহত্তর শিল্পী। শুধমাত্র উপভোগ্য শিল্পের চেয়ে এই আলোকোজ্জ্বল মহৎ শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের

* বর্তমানে মৃত।

আরো বড় প্রমাণ এই মহৎ শিল্প তার পাঠক/দর্শক/শ্রোতাকে বিভিন্ন বিচিত্র পথে ঐশ্বর্যময় করে তোলে। সেক্সপীয়ার পড়ে শুধু যে কাব্য ও নাট্যরসের উপভোগের পরম আনন্দই পাওয়া যায় তা নয়, একজন অর্থনীতিবিদকেও চিনতে শেখায় মানুষের সমাজে অর্থশক্তি বা সম্পদ (সোনা) কিভাবে কাজ করে। জাজ্বল্যমান উদাহরণ ঃ সম্পদ শক্তির চরিত্র বোঝার জন্য তরুণ কার্ল মার্ক্সের কাছে সেক্সপীয়ারের 'টিমন অব্ এথেন্সে'র অমর লাইনগুলি আলোকবর্তিকার মত কাজ করেছে। (দ্রষ্টব্য মার্ক্সের ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, মস্কো প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১৩২) রবীন্দ্রসঙ্গীত তো সমঝদারিরর পরম উপভোগের অফুরান উৎস, কিন্তু শুধুমাত্র যদি তাই হত, তাহলে তা কি এমন মহত্ত্বের পদবাচ্য হয়। এই সঙ্গীত আমাদের প্রতিদিনের সংগ্রামে, কর্মে উৎসবে, দুঃখে, শোকে অফুরান আলোর ঝর্ণার প্রেরণায় স্নাত করছে।*

বস্তুতঃ ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে যা ঘটেছে তা হচ্ছে—আমরা প্রথম থেকেই (১) চলচ্চিত্রকে শুধু 'শিল্প' হিসেবেই দেখে এসেছি, কিন্তু তার সঙ্গে (সোসাইটির লক্ষ্য বলে সংবিধানে উল্লেখিত হলেও) চলচ্চিত্রকে 'সামাজিক শক্তি' হিসেবে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইনি। বস্তুতঃ এই 'সামাজিক শক্তি' শব্দটা একটা কাগুজে শব্দ হয়েই সোসাইটির মেমোর‍্যাণ্ডামের পাতায় 'মৃত' হয়েই রয়ে গেছে। এবং একথা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার সময় এসে গেছে যে, যখনই কোন ক্ষেত্রে শিল্পকে সামাজিক শক্তি হিসেবে না-দেখার প্রবণতা দানা বাঁধে তখনই তা হয়ে ওঠে তথাকথিত 'বিশুদ্ধ শিল্প'—একেবারে বুর্জোয়া মতেই বিশুদ্ধ। এবং তারপরই বর্তমান চলতি সামাজিক ব্যবস্থার পাকশালায় এই 'বিশুদ্ধ শিল্প'টি হয়ে ওঠে শুধুমাত্র 'উপভোগ্য বস্তু'। অথবা আরো পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, তখন এই 'বিশুদ্ধ শিল্প'টি হয়ে ওঠে একটি 'সুন্দর' বর্ণোজ্জ্বল হৃষ্টপুষ্ট মোরগ যার অনিবার্য নিয়তি কোন একদল সৌখিন ভোজন-বিলাসী বুর্জোয়ার ধবধবে খাবার টেবিলে পরম 'উপভোগ্য বস্তু'-তে রূপান্তরিত হওয়া। একমাত্র শিল্পের সামাজিক শক্তির সম্পর্কে আমাদের সচেতনতাই এই জঘন্য পরিণতি থেকে শিল্পকে পারে বাঁচাতে। এই কথাটাই আমরা যদি মর্মে মর্মে উপলব্ধি না করি, কোন শিল্প আন্দোলন—তা চলচ্চিত্র বা সাহিত্য বা নাটক যাই হোক না কেন—তাকে সার্থক করতে পারব না।

কেন এই সামাজিক সচেতনতা এত জরুরি তা কিছু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। আমরা অর্থাৎ দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমন কয়েকটি ভ্রান্ত ভাবধারার মধ্যে, ভ্রান্ত শিক্ষা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এতদিন মানুষ হয়ে এসেছি (আজো হচ্ছি), যে ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে মানুষকে পরিণত করা প্রধানতঃ 'খাদক প্রাণী' হিসেবে। পুঁজিবাদী সভ্যতার এটাই সবচেয়ে বড় কীর্তি—মানুষ, যা কিনা এরিস্টটলের কাছে ছিল 'বুদ্ধিমান প্রাণী', পরে কার্ল মার্ক্সের কাছে ছিল 'মহান রাজনৈতিক প্রাণী'—পুঁজিবাদী সভ্যতা তার দেহের ও মনের ভোগ ক্ষমতাকে বিজ্ঞাপন ও ভ্রান্ত মতাদর্শগত প্ররোচনায় তীব্র থেকে তীব্রতর বাড়িয়ে এবং ভোগ্যবস্তুর নিত্য নূতন সরঞ্জাম উপকরণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে, সেই মানুষকে এক লোভী উপভোক্তা বা খাদক প্রাণী করে তুলেছে—যার কাছে ভোগ করাটা হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। মানুষের এই 'লোভ' রিপুটিকে এই সভ্যতা যেভাবে ভয়ংকর সর্বনাশা পথে চালিত করছে, তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ থেকে আমাদের অনেক স্মরণীয় শিক্ষকরা আমাদের সাবধান করে এসেছেন, কিন্তু পুঁজিবাদী সভ্যতার ভয়ানক শক্তির কাছে এঁদের উপদেশ কার্যকরী হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 'বণিক সভ্যতার কু-ফল', বলেছিলেন যখন থেকে এল টাকার ক্ষমতার দাপট তখন থেকেই এর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব—সেই কুফলটির সম্পর্কে মহাকবি গোটে একটি অসাধারণ মূল্যায়ন করেছিলেন ইউরোপের পুঁজিবাদের আদি যুগে একই কুফলকে প্রত্যক্ষ করে। গোটে তাঁর নায়ক Wilheim Meister-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন "A bourgeois can make a profit and with some difficulty even develop his mind; but he will lose his individuality, do what he will. He may not ask, "what are you?" but only "what do you have?" অর্থাৎ পুঁজিবাদের যুগে মানুষের পরিচয়—তার নিজের পরিচয়ে নয়,

---

* আমার বিনীত ধারণা, শিল্পে বিশুদ্ধ উপভোগের ব্যাপারটা গৌরবান্বিত করা হয়েছে সামন্ত যুগ থেকে বিশেষ করে, যখন পরোপজীবী নিষ্কর্মা অজস্র আরাম ও অবসর ভোগী জমিদার ও নৃপতির একটা অংশ তাদের 'অনন্ত' অবসরকে উপভোগ্য করার জন্য শিল্প উপভোগ, যেমন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নাচ ইত্যাদি উপভোগের পথ অবলম্বন করেছিলেন। অবশ্য যেহেতু এই সব শিল্প শুধুমাত্র উপভোগ্য বস্তুই ছিলনা, এর অন্য মানবিক বস্তুসত্তা ছিল, তাই দ্বান্দ্বিকতার নিয়মে এই জমিদার নৃপতিদের একটা অংশে সৃজনশীলতার চিহ্ন দেখা গেছে, যেমন চীনে কবি-নৃপতি, এদেশে সংগীত স্রষ্টা নবাব ইত্যাদি। যেটা লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে, সেই সময় তারা শিল্পের বিশুদ্ধ উপভোগের স্তর থেকে শিল্পের উন্নত স্তরে যেতে পেরেছিলেন বলেই সৃষ্টিকর্মে রত হতে পেরেছিলেন। যাঁরা পারেন নি, তাঁদের কাছে পরিবেশিত ঠুংরী বা খেয়াল, তাঁদের হাতের সুরাপাত্রের সুরার বেশি কিছু ছিলনা।

তার কি কি আছে তার পরিচয়ে, অর্থাৎ তার কত টাকা, চাকরিতে কত বড় পদ, তার কতটা ক্ষমতা, তার ভোগ্যবস্তুর ঐশ্বর্য কতটা—বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি। বলা বাহুল্য মাত্র যে, এই ব্যাপারটি পুঁজিবাদের পক্ষে চরম প্রয়োজনীয়, কেননা আমি যত আমার সম্পত্তিকে বাড়াতে চাইব ততই পুঁজিবাদের দাসে পরিণত হব, এবং আমার এই সম্পদ, বাড়ী, গাড়ী, চাকরিতে উচ্চতর পদলোভ বাড়াবার সবচেয়ে বড় চালিকা শক্তি হচ্ছে আমার 'লোভ' ও 'ভোগ' করার উদগ্র নেশা। উনবিংশ শতাব্দীর আগমনের প্রাক্কালে মহাকবি গ্যেটেও কল্পনাই করতে পারেন নি, বিংশ শতাব্দীর এই শেষপাদের মুখে পুঁজিবাদী সভ্যতা তার বিজ্ঞাপন শক্তির কি যাদু সৃষ্টি করবে—যা এখন করছে। যা কিছু নির্মিত হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে—তাকেই ফেলা হচ্ছে আমাদের ভোগ বৃত্তির কাছে তার 'রমণীয়' চেহারায়—আমাদের ভোগ করার প্রবৃত্তিকে প্রতিদিন তীব্রতর করা হচ্ছে। এই যখন অবস্থা তখন শিল্পের কী অবস্থা হতে পারে? স্বভাবতঃই এই প্রক্রিয়ায় আমরা শিল্পকেও ভোগ্য বা 'উপভোগ্য বস্তু'তে পরিণত করব। এটাই স্বাভাবিক, এটাই এই সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক নীট ফল। এবং এর প্রমাণ পদে পদে। আমরা যদি আজকালকার মধ্য-বিত্ত বালক বা কিশোরদের খবর রাখি দেখব, তারা আর 'ঠাকুরমার ঝুলি', ছোটদের রামায়ণ মহাভারত, সুকুমার রায়ের লেখায় তৃপ্ত নয়, তারা চাইছে কমিকস্ যার মধ্যে থ্রিলারের গন্ধ আছে, চাইছে খুনখারাবি রোমাঞ্চকর ঘটনার ঘনঘটা যা মনের মধ্যে নেশার মত ছড়িয়ে পড়ে। আনন্দের সঙ্গে যা দেয় শিক্ষা তার চেয়ে যা শুধু দেয় 'রোমাঞ্চ'—তার চাহিদা ক্রমশঃ উঠেছে বেড়ে। একটু বড় হয়ে এই সব কিশোর শুধু পড়বে হেডলী চেজ, এলস্টার ম্যাকলীন, স্ট্যানলী গার্ডনার বা বড় জোর আগাথা ক্রিস্টি। এই জন্যেই 'জন অরণ্য' ছবির সুকুমার সোম-নাথকে বলেছিলেন, "তুমি শালা রামায়ণ পড়েছো?" (অনবদ্য এই সংলাপ, একেবারে সঠিক সত্য।) এরই সঙ্গে ক্রমশঃ মার্কিনী পেপার ব্যাক যৌনানন্দ দেওয়া পুস্তকের ক্রমশঃ অনুপ্রবেশ—এর উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এই সমস্ত ব্যাপারটা ওই একই প্রক্রিয়ার ফল, সাহিত্যকে শুধু 'উপভোগ্য বস্তু'তে পরিণত করা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বা টলস্টয় আর কে পড়ে! চলচ্চিত্রে সেই একই ব্যাপার। একদিকে আমাদের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষ ছুটছে হিন্দি খুনখারাবি ছবির উন্মাদনার নেশায়, আর তথাকথিত বিদগ্ধ শিক্ষিত মানুষ দলে দলে ভিড় বাড়াচ্ছে ফিল্ম সোসাইটিগুলিতে কিছু তথাকথিত বিদগ্ধ 'রস' উপভোগ করতে—এর মধ্যে পড়ে শৈল্পিক কারুকাজের ভালো রস থেকে নগ্ন নারীদেহ দেখার রস, সব।

অর্থাৎ আদিতে ছিল লক্ষ্য—to study the film as an art and as a social force. সেখান থেকে আদি স্রষ্টারা 'film as a social force'-কে অবহেলা করলেন, রইল শুধু শিল্প—'বিশুদ্ধ শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র।' তারপর যে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার কথা বলা হ'ল, সেই 'অমোঘ' প্রক্রিয়ায় আজকে দাঁড়িয়েছে "শুধু উপভোগ্য বস্তু হিসেবে চলচ্চিত্র।' ফলে হাঙ্গেরীর অন্য ছবি দেখতে ভিড় হয় না, কিন্তু 'ইলেকট্রার' মত সুন্দর ছবিতে ভিড় বাড়ে—ছবির বক্তব্যের টানে নয়, নগ্ন নারী দেহ দৃশ্য আছে বলে। বুলগেরিয়ার অতি উৎকৃষ্ট ছবির চেয়ে ভীড় বাড়ে 'গোটস্ হর্ন' দেখার জন্য, একটি মর্মান্তিক দুঃসহ 'রেপ্ সীন' আছে বলে। পৃথিবীর অমর ছবি 'প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক' দেখান হলে হলের তিন চতুর্থাংশ হয়ে যায় খালি। ফ্যাস্‌বিণ্ডারের "পেড্‌লার অব ফোর সীজনস্' দেখালে সভ্যরা সোসাইটির কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেন, আর তাঁরই 'গডস অব প্লেগ' এর মত গভীর ছবি দেখালে কর্তৃপক্ষের কপালে জোটে বিরক্তিপূর্ণ মন্তব্য। সম্প্রতি কোন কোন ফিল্ম সোসাইটিতে সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবি বেশি দেখান হয় বলে একদল সভ্য ভয়ানক বিরক্তি প্রকাশ করে চলেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনজেনস্টাইন-এর 'ইভান দ্য টেরিবল' ছবি বেশির ভাগ সভ্য নিতে পারবে না বলে, তার বদলে কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হয় কোন ফরাসী প্রেমেরছবি দেখাবার কথা। সম্প্রতি এমন খবরও আছে যে, কোন মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিতে একদল সভ্য খোলাখুলি ইস্তেহার বিলি করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তাঁরা বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের জন্য নাকি দর্শনীয় ছবির মধ্যে যৌন দৃশ্য থাকা ছবিকে সেন্‌সর করছে! এর সঙ্গে হলিউড ছবি না দেখাবার জন্য অভিযোগ তো আছেই।

আর ছবি যখন শুধু 'উপভোগ্য বস্তু', তখন সেমিনার 'আলোচনা-সভা'—এসব আর কে করে! সুতরাং যে সোসাইটির সভ্য সংখ্যা সাতশ, একটা সেমিনার ডাকলে তাতে তিরিশ জনও উপস্থিত থাকেন না। কোন কোন সোসাইটি জোর করে সভ্যদের আলোচনা শোনাবার জন্য শো দেখাবার আগে আধ ঘণ্টায় আলোচনা সেরে 'শো' শুরু করে দিতে বাধ্য হন। এবং সেসব সেমিনারেও 'চলচ্চিত্রকে সামাজিক শক্তি' হিসেবে আলোচনা কদাচিৎ স্থান পায়। এবং অত্যন্ত বেদনার কথা এই যে, আন্দোলনের আদি পথিকৃত নিজেই আজকাল 'সামাজিক শক্তি' হিসেবে চলচ্চিত্রকে প্রায়শঃই ভুলে যান। সমস্ত অবস্থাটাকে যা আরো ঘোরালো করে তোলে।*

* 'অরণ্যের দিন রাত্রি'—বিদেশী কিছু সমালোচকদের মতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছবির একটি, কত অসংখ্য স্তরের ছবি, কত বিভিন্ন থীমের, অনবদ্য সাঙ্গীতিক গঠনের ছবি, এতে ভারতের

(পরের পৃষ্ঠায়)

তাই আজকের এই আন্দোলনের অধঃপতনের গতি রোধ করা একমাত্র সেই সব সৎ ও সাহসী সামাজিকভাবে সচেতন তরুণদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা আন্দোলনের 'পথ প্রদর্শকদের ভুল'কে (Sin of the pioneers) সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে, এদেশে সামাজিক শক্তি বিন্যাসকে সঠিক অবধান করে, চলচ্চিত্রের সামাজিক শক্তিকে তার শিল্পরূপের মতই মর্য্যাদা দিয়ে বলিষ্ঠ হাতে নূতন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। এই সংগে স্মর্তব্য, আন্দোলনের পথ প্রদর্শকরা যে সদাত্মক অবদান রেখেছেন তারও, সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন দরকার, বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের। চলচ্চিত্রকে সামাজিক শক্তি হিসেবে দেখাবার ব্যাপারে তাঁর ইদানিংকার অনীহাকে স্মরণে রেখেই একথা স্বীকার করা দরকার যে, সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলনের পিছনে তাঁর মহৎ ও সদাত্মক অবদান তাঁর 'ভুল'-এর চেয়ে অনেক বড়। যে কোন আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, 'পথিকৃতদের ভুল'কে সংশোধন করার দরকার পড়ে, এক্ষেত্রেও সেটা দরকার, এবং তার মানে পথিকৃতদের সামগ্রিক সদাত্মক অবদান, যার ভিত্তির ওপর আন্দোলন দাঁড়িয়ে, সেই ভিত্তিকে ভেঙ্গে ফেলার উগ্রতা নয়।*

এই বিষয়ে কিছু কিছু কার্যক্রম আমাদের ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোক্তারা এখনই নিতে পারেন, কম বা বেশি সাধ্য অনুযায়ী। এ সম্পর্কে আমার সীমিত অভিজ্ঞতা ও ধারণা অনুযায়ী কিছু কার্যক্রমের কথা নিবেদন করছি। বন্ধুজন, যাঁরা আজকের ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলনের অবক্ষয়ের কথায় চিন্তিত, তাঁরা যদি এর মুক্তির কথা ভেবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, আলোচনা সভায়, এমনকি আড্ডাতেও নিষ্ঠার সঙ্গে পর্য্যাপ্ত আলোচনা করেন, তাহলে আরো ভালো সমাধানের পথ আমরা বার করতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার প্রস্তাবগুলিও তাঁরা যেন দয়া করে বিচার করেন।

(১) প্রস্তাব ঃ আমার মতে যা সর্বপ্রথম করণীয়, তা হচ্ছে —এই ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের তুমুল ও গভীর আলোচনা ও বিশ্লেষণে নেমে পড়া।

(২) ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরের মানুষের কাছে ধীরে ধীরে যতটা সম্ভব নিয়ে যাওয়া, বিশেষত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর কাছাকাছি। এবং যেহেতু খুব সঙ্গত কারণেই ঐসব মানুষ এই সব আন্দোলনকে 'একদল সৌখিন মানুষের আন্দোলন' বলেই জেনে এসেছেন, তাই এক্ষেত্রে মহম্মাদেরই যাওয়া উচিত পর্বতের কাছে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে আমাদেরই ছবি নিয়ে, ১৬ঃ মিঃ মিঃ প্রজেক্টার নিয়ে যাওয়া উচিত কাছাকাছি কোন ট্রেড ইউনিয়নের আসরে, কোন শ্রমিক বা কৃষক অধ্যুষিত অঞ্চলে। এটা আরো ভালোভাবে সম্ভব মফঃস্বলের সোসাইটিগুলির পক্ষে। উপযুক্ত ছবি নিয়ে, কোন গ্রামের স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছবি দেখান ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখা—এগুলি যতটা দুঃসাধ্য ভাবা হয় তত দুঃসাধ্য নয়। কলকাতায় 'সিনে সেন্ট্রাল' বা 'সিনে ক্লাব' এধরণের কাজ কিছু করেছেন। কিন্তু এগুলি মেদিনীপুর, বা আসানসোলের সোসাইটিই বা পারবেন না কেন ? স্মর্তব্য, এর দ্বারা আমাদেরও চরিত্র সংশোধন হয়।

(৩) আলোচনা সভা ঃ ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের বোঝান যে শুধু ভাল ছবির 'শিল্প উপভোগের' জন্যই তাঁকে সভ্য করা হয়নি, বা সোসাইটির পত্তন করা হয়নি। সেমিনার বা আলোচনা সভাগুলিতে তাঁদের সহযোগিতাও আবশ্যক। আবশ্যিক শর্ত হিসেবে আইন করে একটা নিয়ম চালু করার কথা ভাবা দরকার, যাতে করে প্রত্যেক সভ্য অন্ততঃ বছরে এতগুলি ন্যূনতম আলোচনা সভায় যোগ দেন, নাহলে তাঁর সদস্যপত্র খারিজ হতে পারে। চাঁদা দেবার মতই এটিকে বাধ্যতামূলক করা দরকার। ফেডারেশনেরও উচিত আইন করে ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে বাধ্য করা যে বছরে অন্ততঃ এতগুলি (ন্যূনতম) সেমিনার তাদের ডাকতেই হবে।

(৪) অনুষ্ঠিত সেমিনারের চরিত্র বদল করারও প্রয়োজন প্রচণ্ড। সেমিনারের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সোসাইটির শোতে দেখান

সুন্দরী রমণীরা আছে, ভারতের সুন্দর অরণ্য আছে—অথচ 'Certain western sensibility informs its structure and form', একদিক থেকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলে এর স্বাদ চেখভীয়, অন্যদিক দেকে এর স্বাদ মোৎজার্টীয়—অথচ এমন ছবি বাঙালীরা নিল না বলে—সমস্ত অবস্থাটা সত্যজিৎ রায়ের কাছে মনে হচ্ছে 'নৈরাশ্যসূচক।' (Sight & Sound, Spring, 1977, pp-94-98) অর্থাৎ একবারো তিনি এটা ভেবে দেখার প্রয়োজনও অনুভব করলেন না যে, ছবিটি সামাজিক শক্তি হিসেবে স্বদেশে কি ভূমিকা পালন করেছে, এই ভূমিকার নঙাত্মক দিকটির জন্যই বাঙালীরা ছবিটিকে গ্রহণ করে নি। ছবিটির শৈল্পিক ঐশ্বর্যের পরিচয় জেনেও। একথাটার সত্যতা তিনি যাচাই করতেও চান না।

---

* সত্যজিৎ রায়কে বাদ দিয়ে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের কোন ভবিষ্যত এই মুহূর্তে আছে বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি না। তাঁর ইদানিংকালের অন্তবিরোধগুলি সম্পর্কে অবহিত থেকে তাঁর যা শ্রেষ্ঠ বস্তু—যা এখনো ফুরিয়ে যায়নি—সেগুলিকে যত বেশি পরিমাণে সম্ভব আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য। কেননা একথা ভোলা সম্ভব নয়, যে তিনিই একটা নূতন চলচ্চিত্রীয় যুগের সৃষ্টি করেছেন ও সেই যুগের মধ্যেই এখনো আমাদের অবস্থান।

চলচ্চিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, যে সব ছবি সত্যকার জনগণ দেখছেন, সেই জনগণ দর্শনধন্য হিন্দি বা আঞ্চলিক ছবিগুলিকেও আলোচনায় আনা দরকার। এবং দরকার আলোচনাকে গণমুখী করা, যাতে সীমাবদ্ধ সভ্য ছাড়াও অন্যান্যরাও তার সুযোগ নিতে পারেন। যে সব ছবি শতকরা এক ভাগ মানুষ দেখেন, তার চেয়ে যে সব ছবি স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহগুলিতে অগণ্য সাধারণ মানুষকে দিনে তিন বার করে অপসংস্কৃতির আফিম গিলিয়েছে—সেগুলির আলোচনা আরো জরুরি। এটা এতদিন হয়নি বলেই অনুষ্ঠিত আলোচনাগুলি 'এ্যাকাডেমিক' বা সৌখিন হয়ে অসার মনে হয়, এবং সেজন্যও অনেক সদস্য সেমিনারে আসেন না। এতদিন সোসাইটিগুলি যে কৃত্রিম কাঁচের ঘরে বন্দী হয়ে সৌখিন ও সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধতার রোগে ভুগে এসেছেন, স্বদেশের অগণ্য মানুষের দর্শনধন্য ছবিগুলির পরাক্রান্ত শক্তিকে না বুঝতে পেরে, বিশুদ্ধ কিছু গালাগালি ছুঁড়ে—ফিল্ম সোসাইটির কাঁচের ঘরের মধ্যে কিছু সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণালের বা কিছু গোদার রেনোয়াঁ ফ্যাসবিণ্ডারের ছবি দেখে মিথ্যা গৌরবে 'মাথাভারি' করে চলে আসেন ও সাধারণ দর্শক শ্রেণীর কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং পরিণামে ফিল্ম সোসাইটিগুলিও যে আর এক ধরণের অপসংস্কৃতিরই বীজাণু বহন করতে শুরু করেছে (যার বিরুদ্ধে সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে কষাঘাত)—এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে ফিল্ম সোসাইটিতে সত্যকার শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ মানুষকে নেমে আসতে হবে সাধারণ দশক শ্রেণী যে চলচ্চিত্রের আওতার মধ্যে পড়ে আছেন—সেই সাধারণ দর্শক শ্রেণীর জগতে, তাঁদের কাছে তাঁদের মত করে খুলে ধরতে তাঁদের দর্শনধন্য হিন্দী ছবিগুলির আসল চরিত্র, এগুলির পিছনে কোন শক্তির কী ভয়ংকর চাতুরিপূর্ণ খেলা চলছে। এগুলি কি ভাবে করা যায়, তার চমৎকার উদাহরণ আছে আমেরিকার বিশ্বখ্যাত বামপন্থী চলচ্চিত্র পত্রিকা 'সিনেয়াস্ত'য়ে প্রকাশিত, 'এণ্টার দ্য ড্রাগন', 'এক্স্‌সরসিস্ট' ছবির আলোচনায়।

(৪) সোসাইটিগুলি কর্তৃক প্রকাশিত পত্র পত্রিকা—এক্ষেত্রেও ঠিক আগের কথা প্রযোজ্য। বস্তুতঃ এই পত্রিকাগুলির প্রতিটি সংখ্যায় একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ থাকা দরকার যেখানে জনগণ দর্শনধন্য ছবির নিপুণ বিশ্লেষণ থাকবে। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে সাধারণতঃ যা ভাবা হয়ে থাকে যে 'ববি' বা 'মকদ্দর কা সিকান্দার' বা 'ঘরোন্দা' (এই শেষোক্ত ছবিগুলি আরো বিপদজনক কেননা এখানে চাতুরিটা এমন যে অনেক বুদ্ধিমান দর্শকও এসব ছবিকে ভাল বলে সার্টিফিকেট দিয়ে বসেন) ইত্যাদি আফিম চলচ্চিত্র নিয়ে গভীর আলোচনা সম্ভব নয়—একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। বরং এই সব আফিম চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে এর স্রষ্টারা ও তাদের মদতদাতারা যে নিপুণ বুদ্ধির খেলা দেখায়, তাকে তুলে ধরাটা কম চিন্তাকর্ষক নয়। মূলতঃ এগুলির পিছনে বুর্জোয়া বুদ্ধির যে চাতুর্যপূর্ণ খেলা আছে সেটা অবশ্যই দুর্বুদ্ধি কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় এরা প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকারদের চেয়ে কম নয়, নিজেদের লাইনে এরা আরো পারদর্শী।* এই সব ছবিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এতকাল আমরা বোকা বনেছি, আর নয়, এরপর এদের শক্তির সম্যক পরিচয় জেনেই এদের মোকাবিলা করা দরকার—এবং এবিষয়ে ফিল্ম সোসাইটির পত্র পত্রিকার একটা দায়িত্ব আছে। এর দ্বারাই একটা 'চিত্রবীক্ষণ' বা 'চিত্রকল্প' বা 'চিত্রভাষ' ইত্যাদি সত্যকার জনগণের কাছে পাঠ্য হবে, নাহলে শুধু কিছু সৌখিন নাকউঁচুদের হাতে ঘুরে এদের কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটবে।

(৫) যে সব প্রগতিশীল সৎ চলচ্চিত্রকারের ছবি প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে বা তাদের দ্বারা 'কণ্ডিশনড্' সাধারণ দর্শকদের নতন কিছু নেওয়ার অসাড়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকতে চায়, সেই সব ছবির স্বপক্ষে ফিল্ম সোসাইটিগুলির কর্তব্য আছে। তাদের জন্য প্রচারে নামতে হবে। অর্থাৎ ১৯৭২ সালে 'কলকাতা ৭১'-এর স্বপক্ষে নেমেছিল সিনে সেণ্ট্রাল, এবং বর্তমানে 'মুক্তিচাই' বা 'দৌড়' ছবির স্বপক্ষে নেমেছেন কলকাতা সিনে ক্লাব—ঠিক সেইভাবে—বরং আরো জোরালভাবে। অন্যদিকে মৃণাল সেনের 'কোরাস' ছবি নিয়ে একটি ফিল্ম সোসাইটির বিদ্রূপ ও অপপ্রচার একটি জঘন্য ইতিহাস হয়ে আছে।

(৫) চলচ্চিত্র নিয়ে নতন যে সব মানুষ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করছেন—তার গুরুত্ব অনুযায়ী, প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য প্রত্যেক ফিল্ম সোসাইটির কিছু উদ্যোগ নেওয়া কর্তব্য। আর্থিক সামর্থ্য থাকলে (যা অনেকেরই আছে) নতুন লেখকের গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়া উচিত, অন্ততঃ পক্ষে আর্থিক সাহায্য দেওয়া কর্তব্য—যদিও দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র একটা ফিল্ম সোসাইটিই (কলকাতা সিনে ক্লাব) একটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

(৬) ফিল্ম সোসাইটিগুলির নিজস্ব চলচ্চিত্র নির্মাণ, এটি এদেশে এই মুহূর্তে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তা সম্ভব না হলেও

* এবিষয়ে যাঁদের এখনো সন্দেহ আছে তাঁদের সিনেয়াস্ত পত্রিকার উক্ত দুটি আলোচনা এবং বর্তমান লেখকের 'চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতি' নিবন্ধ (শ্রীনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি' গ্রন্থ, এ, মুখার্জী এণ্ড কোং প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১৫৪ দ্রষ্টব্য এবং 'গণ দর্শনধন্য ছবি প্রসঙ্গে' (নন্দন, পৌষ সংখ্যা ১৯৭৯) নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তরুণ যে সাহসী দু চারজন নূতন চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন, যদি তাঁদের ছবির সুস্থ সমাজমুখী প্রবণতা থাকে, তাহলে তাঁদের আর্থিক সাহায্য করা কর্তব্য।

(৭) নূতন সভ্য গ্রহণ করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে সব মানুষের সমাজ সচেতনতা আছে তাঁদের কী করে বেশি সংখ্যায় গ্রহণ করা যায়। যদি সম্ভব হয়, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সদস্যদের কিছু সুবিধা দেওয়া উচিত। পূর্বোক্ত আলোচনা সভা ও পত্রিকা বা ইস্তেহারের মাধ্যমে সেই সব তরুণকে, শ্রমিক ও কৃষককে (শিল্পাঞ্চলের বা মফঃস্বল অঞ্চলে এদের মধ্য থেকে কিছু সদস্য যে করা যায়, তা কয়লাখনি অঞ্চলে ফিল্ম সোসাইটি করার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি এবং সেটা ১৯৭১-৭২ সালে, এখন সেটা আরো বেশি সম্ভব।) ক্রমাগত উৎসাহিত করা, যাঁদের আছে দূরদৃষ্টি, বলিষ্ঠতা ও সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে সুস্থ ধারণা—যাঁরা একদিন এই শ্লথ বিশুদ্ধ প্রমোদমুখী মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক আন্দোলনকে সত্যকার জনগণের চাহিদা পূরণের পথে নিয়ে যাবেন। একে বলা যেতে পারে, আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্র বদলের সুস্থ প্রচেষ্টা। বলাবাহুল্য মাত্র, বাবুকেন্দ্রিক কলকাতার চেয়ে এ ব্যাপারে মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলির সুযোগ বেশি।

(৮) উল্লেখিত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলির মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা তার পূর্ণতর বিকাশ দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় মূল ফেডারেশন এত বেশি কলকাতাকেন্দ্রিক যে মফঃস্বল সোসাইটিগুলি যথেষ্ট অবহেলিত। কিছুটা কলকাতাকেন্দ্রিকতা বর্তমান পরিস্থিতিতে অনিবার্য, কিন্তু এই কেন্দ্রিকতা এখন যে চেহারা নিয়েছে, বিশেষতঃ সাম্প্রতিক ফেডারেশনের কর্মী সমিতি নির্বাচনে—তা দুঃখজনক শুধু নয়, রীতিমত <u>লজ্জাজনক!</u> ফলাফল বিশ্লেষণ করে এমন ধারণা হয় যে, যেখানে মফঃস্বলের প্রতিনিধিরা কলকাতার সোসাইটিগুলির নির্বাচনপ্রার্থীর বেশির ভাগকে ভোট দিয়েছেন, সেখানে কলকাতায় প্রতিনিধিরা মফঃস্বলের সোসাইটির নির্বাচনপ্রার্থীকে প্রায়শঃই ভোট দেননি—ফলে একজন ছাড়া মফঃস্বল সোসাইটিগুলির কোন নির্বাচন প্রার্থীই কর্মসমিতিতে স্থান পান নি; তাও তিনি নৈহাটির নির্বাচনপ্রার্থী—যে নৈহাটি কলকাতার কাছেই। বলাবাহুল্য, এরকম কলকাতাকেন্দ্রিকতা সেই গোষ্ঠীবদ্ধতারই নামান্তর—যা আজ ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের দুরবস্থার অন্যতম কারণ। ভবিষ্যতে এই স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে অপেক্ষাকৃত অসংগঠিত মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলির প্রতিনিধিত্বকে সংরক্ষিত করার জন্য ফেডারেশনের এখনই উপযুক্ত বিধি নিয়ম রচনা করা উচিত, নতুবা এই আন্দোলনে মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলি তাদের অবদান রাখার ব্যাপারে নৈরাশ্যগ্রস্ত হয়ে পড়বে—এবং পূর্বোক্ত পরিকল্পনার একটিরও রূপায়ণ সম্ভব হবে না। পুনশ্চ স্মর্তব্য, <u>মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলিই আন্দোলনের ভবিষ্যত।</u> ফিল্ম সোসাইটির মধ্যবিত্তকেন্দ্রিকতার কাঁচের ঘর যেখানেই প্রথম ভাঙার সম্ভবনা যদি মূল নেতৃত্ব তা চান।

(৯) প্রত্যেক ফিল্ম সোসাইটির নিজস্ব গ্রন্থাগার থাকা উচিত, যেখানে গ্রন্থ পত্রিকা শুধু আলমারিতে 'কেউ খোলে না পাতা' হয়ে বিরাজ করবে না (এখন যা ঘটে), বরং যা উৎসাহীদের হাতে পড়বে এবং পাঠচক্র তৈরী করাবে। অবশ্যই গ্রন্থ সংরক্ষণেরও জন্য সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট বিধি নিয়ম দরকার, কেননা এ দেশে চলচ্চিত্র বিষয়ক বিদেশী গ্রন্থ বারবার বাজারে লভ্য নয়। কিন্তু বই হারাবার ভয়েই কাউকে পড়তে দেওয়া হবে না—এটাও কোন যুক্তি হতে পারে না।

(১০) সবচেয়ে যেটা জরুরি তা হচ্ছে, <u>প্রত্যেক ফিল্ম সোসাইটির নিজস্ব একটি পরিষ্কার শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, এবং উদারতর অর্থে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে—যার ভিত্তি হবে প্রশস্ত (broad based),</u> এবং তার পূর্ণ মূল্যায়ণ অবশ্যই চলবে গণতান্ত্রিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে। কিন্তু নির্দিষ্ট কার্যবিধি প্রণয়ণের মতই, সদস্যদের সংখ্যা-গরিষ্ঠের দ্বারা গ্রাহ্য মতাদর্শগত (idcological) কাঠামো রাখতেই হবে; যেখানে চলচ্চিত্রকে শুধু শিল্প হিসেবেই নয় সামাজিক শক্তি হিসেবেই দেখা হবে। এবং <u>এর প্রধানতম কাজ হবে ফিল্ম সোসাইটিকে ক্রমশঃ গণমুখী করে তোলা।</u>

বলাবাহুল্য মাত্র, এখানে কোন দলীয় রাজনৈতিক মতদর্শের কথা বলা হচ্ছে না।

আমার মনে হয়, আমরা যদি শুধু এইটুকু দিয়েই, এবং তাও যতটা সাধ্য, শুরু করি আমাদের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন একদিকে পথপ্রদশকদের সদাত্মক অবদানকে গ্রহণ করে অথচ তাদের 'ভুল' এবং আবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত হয়ে সত্যকার 'আন্দোলন' হয়ে উঠবে। এখন পর্যন্ত আন্দোলন বলে যা বলা হয় সেটা হচ্ছে নিজেকে ভোলান, কেননা যে আন্দোলনের সঙ্গে এমন কি দূর ভবিষ্যতেও জনগণের কোন সংযোগের সম্ভাবনা নেই, তাকে আন্দোলন বলা উচিত নয়।

<u>'সব শিল্পর মধ্যে চলচ্চিত্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' আসুন, লেনিনের এই ভবিষ্যৎ বাণীকে, সার্থক করার জন্য আমরা যথা সাধ্য করি।</u>

<u>অথবা</u>

<u>ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন জনগণ বিচ্ছিন্ন একটি সৌখিন কাগুজে আন্দোলন মাত্র হয়ে ক্রমশঃ বিকৃত ও জীর্ণ হয়ে ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হোক।</u>

<u>এবং</u>

নূতন কিছুর <u>জন্ম হোক্</u>।

সত্যজিৎ রায়ের জগৎ

চলচ্চিত্র-শিল্পকে যাঁরা চারুকলার স্তরে তুলে দিয়েছেন, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁদেরই একজন। এখানে তিনি চলচ্চিত্র-নির্মাণ সম্পর্কে লেখক জোসেফাস ড্যানিয়েল্‌স্‌-এর সঙ্গে আলোচনা করছেন।

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম কলকাতায় ১৯২১ সালের ২রা মে, একটি প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবী পরিবারে। ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা এই মানুষটি এমনিতে প্রশান্ত, কিন্তু চলচ্চিত্রে বাস্তবতা সম্বন্ধে বলতে বলতে তিনি আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসের ভিত্তিতে তিনি যে তিনটি ছবি তুলেছিলেন, তাদের প্রথমটি 'পথের পাঁচালী'। এটিই তাঁর জীবনে প্রথম তোলা ছবি। তিনি নিজেই এর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন, তারপর মূলধন যোগাতে কাউকে রাজি করাতে না পেরে নিজেই কষ্টে সৃষ্টে তেইশ হাজার টাকা জমিয়ে নিয়ে ছুটির দিনে আর সপ্তাহান্তে ছবি তোলা শুরু করেছিলেন। মোট মাত্র সত্তর দিন ছবি তোলা হলেও এটি সম্পূর্ণ করতে তিন বছর লাগে। ১৯৫৫ সালে ভারতে মুক্তি পেয়েই 'পথের পাঁচালী' বুদ্ধিজীবী সমাজে সাড়া জাগায়। তারপর ছবিটি যায় ভারতের বাইরে, সর্বত্রই দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল ছবিটির নায়ক শিশু অপু। ১৯৫৬ সালে ফ্রান্সের ক্যান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি 'মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্ররূপ' বিবেচিত হয়ে পুরস্কার পায়। পরের বছর ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান পুরস্কার পায়—অপুকে নিয়ে রায়ের দ্বিতীয় ছবি 'অপরাজিত'।

অপুত্রয়ীর তৃতীয় ছবি 'অপুর সংসার'। তিনটি ছবিতে বলা হয়েছে বাংলা দেশে বাল্য, যৌবন আর পূর্ণ বয়সের একটি কাহিনী। ছবি তিনটি ১৬টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। লন্ডনের 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকা লেখেন: "অপুর জীবন কাহিনী নিয়ে রায়ের তিনখানা ছবি যে মাত্রা, প্রসার এবং অবিচ্ছিন্ন সাফল্যের দিক দিয়ে অদ্বিতীয়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।" শিল্পের মাধ্যমে মানবিক যোগাযোগে সহায়তা করেছেন বলে ১৯৬৭ সালে রায় র‍্যামন ম্যাগ্‌সেসে পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৬৯ সালে চলচ্চিত্র-নির্মাতা এবং সমালোচক চিদানন্দ দাশগুপ্ত বলেছেন, রায় "একটি ব্যতিক্রম, একটি বিস্ময়, কোনারকের মন্দির এবং বারাণসীর বয়নশিল্পের মতোই ভারতের গর্বের বস্তু।"

প্রশ্ন: 'পথের পাঁচালী' ছবি তুলবার প্রেরণা আপনি পেয়েছিলেন কিভাবে?

সত্যজিৎ রায়: একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের শিল্প-নির্দেশক রূপে ছয় মাস লণ্ডনে অবস্থান কালে প্রায় রোজই সিনেমায় যেতাম. সেখানকার চিত্র জগতের অনেক তাত্ত্বিক আর সমালোচকের সঙ্গে আলোচনাও হত। ভিত্তরিও দে সিকা-র 'বাইসিক্‌ল্‌ থীফ' ছবিটি তখনই দেখি। তার আগেই আমি 'পথের পাঁচালী' নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, কিন্তু অপেশাদার, অখ্যাত অভিনেতা আর কর্মীদল নিয়ে কাজ করা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলাম। 'বাইসিক্‌ল্‌ থীফ' আমার অনেক ধারণা পাল্টে দিল। ভারতে ফিরবার পথে জাহাজেই 'পথের পাঁচালী' চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়াটি লিখে ফেললাম।

প্রশ্ন: আপনি অপেশাদারদের কথা ভাবছিলেন কেন?

সত্যজিৎ রায়: আমি নিজেই যে তখন অপেশাদার। জানতাম ছবি তুলতে সাধারণতঃ যাঁরা টাকা দেন, আমাকে তাঁরা টাকা দেবেন না। পেশাদারদের নিয়ে কাজ করাও শক্ত হত। আমার মতলব ছিল অপেশাদারদের নিয়ে একটি ছোট্ট গোষ্ঠী তৈরী ক'রে নিজেই নিজের কর্তা হবো। যাঁরা বলতেন পেশাদারদের না নিলে চলবে না, তাঁদের কথা কান পেতে শুনতাম বটে, কিন্তু ঠিক করেই রেখেছিলাম আমি আমার নিজের মতেই চলব।

প্রশ্ন: এখনও আপনার অনেক শিল্পী অপেশাদার, তাদের খোঁজ পান কিভাবে?

সত্যজিৎ রায়: একটি উদাহরণ দিচ্ছি। অপুকে নিয়ে দ্বিতীয় ছবিটির জন্য আমি একটি দশ বছরের ছেলে খুঁজছিলাম। প্রথম ছবিতে অপুর বয়স ছিল ছয়। দ্বিতীয় ছবির কাহিনী শুরু তার চার বছর পরে। তাই আমি চাইছিলাম এমন একটি দশ বছরের ছেলে, যার থাকবে ঐ ছয় বছরের ছেলেটির মতো স্বপ্নালু দৃষ্টি, মুখের আদল আর গায়ের রঙ্‌। একদিন বাসে চড়ে সেই ছেলেকে মুখোমুখি দেখলাম। তার সঙ্গে কথা বললাম, সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম আমার ছবিতে সে অভিনয় করবে কিনা। সে বলল, "কেন করব না?"

প্রশ্ন: আপনার খ্যাতি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু পেশাদারদের নিয়েই আপনি ছবি করতে পারেন। তবু অপেশাদার শিল্পী নেন কেন?

সত্যজিৎ রায়: ভারতে পেশাদার অভিনেতার সংখ্যা তেমন বেশী নেই। তাছাড়া, একই শিল্পী নিয়ে আমি বার বার ছবি করতে চাই না। যখনই চরিত্রের খসড়া করি, তখনই মনে মনে তার একটা স্পষ্ট চেহারা খাড়া করে নিই। তারপর সেই

চেহারার মানুষ খুঁজে বেড়াই। পেশাদার কাউকে না পেলে অপেশাদারের খোঁজ করি।

প্রশ্ন ঃ কোথায় খোঁজ করেন ?

সত্যজিৎ রায় ঃ কখনো কখনো কাগজে বিজ্ঞাপন দিই। যারা সাড়া দেয় তাদের প্রত্যেককে ডেকে দেখি। কখনো বা রাস্তায় মুখ দেখে বেড়াই। দরকার মতো চেহারা মিললে কথা বলিয়ে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে দেখি কাজ চলবে কিনা. যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাসের ছেলেটিকে। অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমার তিনটি ছবির প্রায় সবগুলি ভূমিকার জন্যই শিল্পী ঠিক করেছিলাম ঐভাবে। একজন অভিনেত্রী ছিলেন আমার বিশেষ পরিচিতা বন্ধুপত্নী, যিনি আগে কোনো ছবিতে অভিনয় করেননি। একটি বৃদ্ধকে পাই বারাণসীতে নদীর ধারে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ওপর, অপু-ত্রয়ীর দ্বিতীয় ছবিতে যিনি অভিনয় করেছেন। এই ছবিটির চিত্রনাট্য আমি লিখি বারাণসীতেই, এবং ছবির অনেক দৃশ্যেই ছিল ঐ ঘাটের সিঁড়িগুলি। কত মানুষের মনে যে এই অভিনয়-পিপাসা রয়েছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। একবার বললেই এঁরা রাজি হয়ে যান। অবশ্য সবাই নয়, কিন্তু আপনারা যা ধারণা করেন তার চাইতে অনেক বেশী।

প্রশ্ন ঃ যাঁদের অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই, তাঁদের ভেতর থেকে অভিনয় বার করে আনেন কি করে ?

সত্যজিৎ রায় ঃ অভিনয় করবার আর ক্যামেরার মুখোমুখি হবার ইচ্ছে থাকলেই হয়, ব্যক্তিটা তখন সহজ। তখন যেমনটি দরকার ঠিক তেমনি অভিনয় করিয়ে নেওয়া সর্বদাই সম্ভব। অবশ্য একজন পেশাদারকে সামান্য একটু নির্দেশ দিয়েই খুব অল্প সময়ে যা করিয়ে নেওয়া যায়, একজন অপেশাদারকে দিয়ে তা করাতে গেলে কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে। কিন্তু ছোট ছোট ভূমিকায়, অথবা যাতে বেশী সংলাপ নেই সেই রকম ভূমিকায়, অপেশাদারদের দিয়ে খুব ভালো কাজ হয়। তাদের 'অভিনয়'-হীন অভিনয়, দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের মতো স্বাভাবিক আচরণ আর কথাবার্তা চমৎকার রসসৃষ্টি করতে পারে। আমার রচিত সংলাপ মঞ্চঘেঁষা বা সাহিত্যঘেঁষা নয়, সরাসরি বাস্তব জীবন থেকেই নেওয়া কিন্তু বাস্তব জীবনের বাহুল্য বর্জিত। ছায়া-ছবিতে চাই প্রায় বাস্তব জীবনের কথাবার্তার মতো সংলাপ, সাহিত্যগন্ধী বা থিয়েটারী সংলাপ নয়। "প্রায়" বলছি এই কারণে যে, আমার ছবির সংলাপের চাইতে বাস্তব জীবনে লোকে অনেক বেশী কথা বলে, বাস্তব জীবনের কথাবার্তায় ফাঁক আর বিরতি অনেক বেশী। আমি আমার ছবির সংলাপে বাস্তব জীবনের ঐ সব ফাঁক, বিরতি, আর বাড়তি কথাগুলো ছেঁটে ফেলি। আমার সংলাপ অপেশাদাররাও সহজেই বলতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি আপনার ছবিগুলির আর্থিক দিকের সঙ্গেও জড়িত ?

সত্যজিৎ রায় ঃ আর্থিক ব্যাপারে আমি ভীষণ আনাড়ী। তাই ওদিকটা দেখেন আমার একজন প্রডাকশন ম্যানেজার। অন্য লোক টাকা যোগান, আমি তাঁদের জন্য ছবি করি। আমি কাজের জন্য দক্ষিণা নিই, ছবির মুনাফা তাঁরা পান। আমার ছবি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, বিশেষ করে সে ছবি দেশের বাইরে যাবার সময়, আমি আর নিজেকে জড়াতে চাই না, কারণ তাতে অফিস, ফাইল আর হিসেব রাখার অনেক হাঙ্গামা। কোন ছবির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তার জন্যে আর একটুও মাথা না ঘামিয়ে পরের ছবির দিকে এগোই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি আপনার ছবির দৃশ্যগুলো অনেকবার করে তোলেন ?

সত্যজিৎ রায় ঃ না, সাধারণতঃ দু-তিন বারের বেশী না। প্রথম বারেরটাই সাধারণতঃ সব চেয়ে ভালো হয়, কখনও কখনও দ্বিতীয় বারেরটা। সামঞ্জস্য বিধানের জটিলতা না থাকলে তিন বারের বেশী কোনো দৃশ্য বড় একটা তুলি না। যেমন ধরুন, একটি দৃশ্য ছিল, তিনটি ছেলে মেয়ে ছুটবে আর একটি কুকুর ছুটবে তাদের পিছনে পিছনে। আমরা ছবি তুলছিলাম এক পাড়াগাঁয়ে, আর কুকুরটা ছিল একটা বেওয়ারিস গেঁয়ো কুকুর। দৃশ্যটি ঠিক মতো পাবার জন্য আমাকে এগারোবার ছবি তুলতে হয়েছিল। একটি দৃশ্য এতবার আর কখনও তুলিনি। আমাকে খুব হিসেবী হতে হয়, কারণ আমি অল্পবাজেটের বাংলা ছবি তুলি। ভারতের অল্প সংখ্যক লোকই বাংলা বোঝেন। আমি টিঁকে আছি আমার ছবি বিদেশেও চলে বলে। তাই প্রযোজকদের আমার ওপর এই আস্থা আছে যে, তাঁদের লগ্নী টাকা আমি তাঁদের এনে দিতে পারব।

প্রশ্ন ঃ আপনার ছবিগুলিতে কি কোনো বাণী থাকে, না তাদের উদ্দেশ্য শুধু আনন্দদান ?

সত্যজিৎ রায় ঃ প্রথম চারবারে আমি তিন রকমের ছবি করেছিলাম। তারপর কয়েকটি ছবিতে আমি বিশেষ বিশেষ সময়ের রূপ ফুটিয়ে তুলেছি। সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজ এবং তার নানা সমস্যার কাহিনী এঁকেছি। পাশাপাশি থেকে পুরাতন এবং নূতনের যে দ্বন্দ্ব চলে সেই দ্বন্দ্বই আমার ছবির বিষয়বস্তু। এই বিষয়টিই ঘুরে ফিরে আমার সব ছবিতেই এসে পড়ে, যদিও সচেতনভাবে নয়। আমার প্রথম মৌলিক চিত্রনাট্যটি ছিল দার্জিলিং-এ বেড়াতে গেছে, এমন একটি অভিজাত পরিবারকে নিয়ে। একজন সেকেলেপন্থী, কর্তৃত্বপ্রিয় পিতার হুকুমতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর একেলে তরুণ-তরুণী ছেলেমেয়েরা বিদ্রোহ করলে কি রকম পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে, আমার চিত্রনাট্যে

তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। যা দেখতে মাথা খাটাতে হয় না, ভারতীয় দর্শক সেই ধরণের ছবি দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু আমার ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়, তলিয়ে বুঝতে হয়, প্রতিটি শব্দ কান পেতে শুনতে হয়, প্রতিটি ঘটনার ওপর নজর রাখতে হয়। আমার ছবিতে এমন কি পটভূমিকারও গুরুত্ব আছে। প্রত্যেকটি বস্তুই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করছে। আপনি অনুভব করবেন ওটি ওখানে থেকে ওর নিজস্ব কাহিনী বলছে। এই জন্যেই আমার ছবি যিনি প্রথমবার দেখবেন, তিনি তেমন উৎসাহিত নাও বোধ করতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখলে তাঁর ভালো লাগতে শুরু করবে। তারপর তিনি সেটি তৃতীয়বার দেখবেন।

প্রশ্ন ঃ আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে কি আপনার নজর থাকে?

সত্যজিৎ রায় ঃ আমি নিজেকে বাঙালী বলে ভাবি, আমার ছবির প্রধান লক্ষ্য বাঙালী দর্শক। আমি আগে জানতে পারিনা ছবিটা ভারতের বাইরে জনপ্রিয় হবে কিনা, কারণ অন্য দেশের রুচি আমার জানা নেই। ভারতের কোন অংশ বা ভারত-সম্পর্কিত কোন্ বিষয়ে অভারতীয়দের আগ্রহ, আমি তা বুঝতে পারি নি। যাই হোক, দেখতে পাচ্ছি বিশেষ বিশেষ সময়ের জীবন বা গ্রাম্য কাহিনী নিয়ে তোলা আমার ছবিগুলি বিদেশে সমাদৃত হয়েছে, কিন্তু বর্তমান ভারত বা পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য ভাবধারার মিশ্রণে তোলা আমার ছবি আন্তর্জাতিক বাজারে তেমন সফল হয়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনার ছবির সঙ্গে কি আপনার ব্যক্তিত্বও বদলায়?

সত্যজিৎ রায় ঃ বিষাদ-গম্ভীর ছবি তুলবার সময় কিছুদিন মনটা ভারী থাকে বটে, কিন্তু ছবির কাজ শেষ হলেই আমি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাই। বিভিন্ন রকমের মেজাজ নিয়ে আমি ছবি করেছি। অর্থাৎ একটা কমেডির পর যে ট্র্যাজিডিই করব, তা নয়। হয়তো চলে যাব একশ বছর পিছিয়ে, করব তৎকালীন ছবি। ভারতের ঐতিহাসিক আর ভৌগোলিক দিকটি এখন পর্যন্ত বহুলাংশে চলচ্চিত্রে অনাবিষ্কৃত রয়েছে। এদিক দিয়ে অনেক কিছু করবার আছে। তাছাড়া, আন্তো-নিয়োনি যেমন বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে পর পর ছয়টি ছবি করেছেন, সেভাবে নিজেরই পুনরাবৃত্তি করার কোন মানে হয় না। এ রকম করা মানে সময়ের ভীষণ অপচয়। বহু বিভিন্ন ধরনের ছবি করবার আমার যে সুযোগ, তার পুরো সদ্ব্যবহার না করা আমার পক্ষে বোকামি হবে।

প্রশ্ন ঃ এখানকার অনেক আন্তর্জাতিক ছবিতে যে নগ্নতা এবং প্রকাশ্য যৌন আবেদন দেখা যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে আপনার মত কি?

সত্যজিৎ রায় ঃ ওতে একটু বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। শোবার ঘরের একটি জোরালো দৃশ্য থাকলে টিকিট বিক্রির দিক দিয়ে ছবিটি নিরাপদ, এটা বোঝা শক্ত নয়। ছবি আমি অনেক দেখি, তাদের বেশির ভাগই মনে হয় নিতান্তই বাজে, অসংলগ্ন, আনাড়ী আর ভাঁওতায় ভরা। এমনিতে সে সব ছবি দর্শকরা পয়সা দিয়ে দেখতে আসত না, কিন্তু এই ধরনের ছবির নির্মাতারা আত্মরক্ষা করেন ছবির ভেতর এমন কিছু কিছু বস্তু ঢুকিয়ে দিয়ে যাতে টিকিট ভাল বিক্রি হয়। শোবার ঘরের দৃশ্যগুলি যাতে বাজে না হয়, সেদিকে নির্মাতারা বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। এ ব্যাপারে তাঁরা খুবই দক্ষ, বাজে হয় শুধু ছবির বাকি সবটাই।

প্রশ্ন ঃ চলচ্চিত্রে অন্যান্য পরিচালকরা যা করেছেন, তার প্রভাব আপনার ওপর পড়ে কি?

সত্যজিৎ রায় ঃ শুধু এই মাত্র যে মাঝে মাঝে আমার ভাবনা হয় আমার ছবিগুলিকে বড় বেশী সাদামাটা বা নীরস মনে করে পাশ্চাত্য দেশের কেউ কেউ বলবেন কিনা যে 'এগুলো কিছুই হয়নি'। বস্তুতঃ একজন সমালোচক—বোধহয় কেনেথ টাইন্যান —তাঁর একটি লেখায় আমার শ্রেষ্ঠ ছবি 'চারুলতা'-র সমালোচনা করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর একটি বুদ্ধিজীবী পরিবার নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি কাহিনীকে ভিত্তি করে ওই ছবিটি তৈরী। নায়িকা চারুলতা তার এক দেওরের প্রেমে পড়েছিল। টাইন্যান প্রশ্ন করেছিলেন, তারা চুম্বন করেনি কেন, বাস্তবকে আড়ালে লুকিয়ে না রেখে তাদের চুম্বন আলিঙ্গনাদি দেখানো হয় নি কেন। কিন্তু এসব ব্যাপার পাশ্চাত্য দেশে বা এমন কি প্রাচ্যেও এখন যত সহজে বা যত তাড়াতাড়ি হতে পারে, আমাদের দেশে ঐ সময়ে তা হওয়া সম্ভব ছিলনা। এখনও কলকাতার রাস্তায় ছেলেমেয়েরা চুম্বন তো দূরের কথা, হাত ধরাধরিও করে না। কোনো বিশেষ সময়ের ছবিতে তাই দেখান উচিত, যা সে সত্যিই ছিল বা হত।

প্রশ্ন ঃ আপনার সর্বশেষ ছবি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র কি রকম সমালোচনা হয়েছে।

সত্যজিৎ রায় ঃ অনেক সমালোচক বলেছেন, ছবিটি তাৎপর্যহীন, অবান্তর। সব চেয়ে ভালো সমালোচনায় বলা হয়েছিল, ছবিটি জায়গায় জায়গায় চমৎকার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেমন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত তা হয়ে ওঠে নি। জানি না তাঁদের ওকথার অর্থ কি। আমার মনে হয় ছবিটি দেখে বেশ খুশী হওয়ার মতো। আমার তো এ ছবি খুবই ভালো লেগেছে, এবং এ পর্যন্ত ছয় সাত বার দেখেছি। মেজাজের দিক দিয়ে ছবিটি খুবই সমকালীন। এতে রোমান্স আছে, আর আছে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র, যাদের মূল্যবোধও বিভিন্ন।

প্রশ্ন ঃ ছবিটির বিষয়বস্তু কি?

সত্যজিৎ রায় ঃ ছবিটি কয়েকটি মানুষ সম্বন্ধে। চারটি

বন্ধু থাকত কলকাতায়, নানা বিধিনিষেধ দিয়ে ঘেরা পরিবেশে। তারা চাইল সপ্তাহান্তে কিছু সময়ের জন্য বাধাহীন জীবনের স্বাদ পেয়ে আসতে। এদের একজন দৌড়ঝাঁপে ওস্তাদ, ক্রিকেট খেলোয়াড়। তার দেখা হল তারই মতো চট্‌পটে, দুর্দান্ত প্রকৃতির একটি মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু তারপর মেয়েটির কোনো ছাপ রইল না তার মনে। দ্বিতীয় ছেলেটির কোনো রকম উদ্বেগ বা ব্যর্থতাবোধ নেই, জন্ম থেকেই সে পরগাছার মতো। কিন্তু ভারি রসিক আর স্ফূর্তিবাজ বলে তার সঙ্গ সবাই পছন্দ করে। কোন মেয়ের সঙ্গে তার ভাব নেই। মেলায় গিয়ে সে জুয়ার আড্ডায় মেতে রইল। বাকি দুজন গভীরভাবেই ঘটনা স্রোতে জড়িয়ে পড়ল। এদের একজন একটু ভীরু প্রকৃতির, তার মনে নানারকম বিধিনিষেধের বাধা। সে একটি কারখানার লেবার অফিসার। একটি বিধবা তাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছিল, কিন্তু তার পরিণাম হল মর্মান্তিক। কারণ, মেয়েটির প্রেমে সাড়া দিতে সে নিজের মনকে কিছুতেই রাজি করাতে পারল না। চতুর্থ ছেলেটিও নিজেকে গুরুতরভাবে জড়িয়ে ফেলল। কাহিনীটি বেশ জটিল, সংলাপও সরল নয়। সব সময় বুদ্ধি সজাগ রেখে ছবিটি দেখতে হবে। ছবিটি কোন একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে নয়, প্রতিটি চরিত্রের আছে নিজস্ব গুরুত্ব। ছবিটি খুবই চিত্তাকর্ষক। সমালোচকরা ছবির আসল বিষয়টাই ধরতে পারেন নি। সমালোচকদের বেশীর ভাগই তো বেশী বয়সের মানুষ।

এই সাক্ষাৎকারটি বেশ কয়েক বছর আগে 'স্প্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের প্রয়োগ এবং প্রসঙ্গত

ধ্রুব ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত যেকোন শিল্পকলার অন্তরালেই এক মূল সুরের কাজ করে। সঙ্গীত যেমন বিমূর্ত ধ্বনির বিস্তার তেমন কথা আর সুরের মনিকাঞ্চন যোগও। এক্ষেত্রে এই বিস্তারের সাথে মানুষের আবেগ ও ভাবপ্রকাশের সথে সংযোগও যথেষ্ট। এবং সঙ্গীতের এই প্রকাশ এত সূক্ষ্মভাবে জাগতিক ঘটনাগুলির সাথে জড়িত যে তার প্রয়োগ সঠিক ভাবে হলে শিল্পের মূল কথা—আবেগ সুসংবদ্ধ প্রকাশকে আরো শক্ত ভিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এর প্রধান কারণ সঙ্গীত মানুষের প্রাচীনতম শিল্প। চার্চে এবং মন্দিরে সঙ্গীতকে মুক্তির মাধ্যম বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল অনেক আগেই। ওঁরা হয়ত লক্ষ্য করেছিলেন তাল, লয়, মানুষের বোধকে এমন এক প্রত্যন্ত প্রদেশে পৌঁছে দিতে পারে যার কোন তুলনা নেই। দ্বিতীয়ত সাঙ্গীতিক মূর্চ্ছনার ব্যবহার এবং তার ব্যপ্ত এক বিরাট জায়গা জুড়ে অবস্থিত। আমাদের রাগ সঙ্গীতে যে কোন মূল রাগ ধরে যেমন ভৈরব, খাম্বাজ বা মল্লারকে অনুসরণ করেও গড়ে উঠেছে আরো নানান ধরণের লব্ধ রাগ। এক্ষেত্রে আরো একটা বিষয় স্পষ্ট—সঙ্গীতের প্রকাশে মূল হিসাবে কাজ করে গতি (movement) এবং ছন্দ (rhythm) এর সঠিক ব্যবহার। সমস্ত মহাবিশ্বের চাল চলন এবং ঘটনার ঘনঘটা এই দুই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বলা যেতে পারে গতি এবং ছন্দের বিস্তারের উপর নির্ভর করেই এই চলমান মহাবিশ্বের সূচনা এবং অন্তিম গতি।

এক্ষেত্রে সঙ্গীত প্রকাশের যন্ত্রগুলিতে ছন্দ এবং গতি পদার্থ-বিদ্যার সূত্র দ্বারা এমন ভাবে গ্রথিত যে ছন্দের বিস্তার, গতির উপর নির্ভরশীল এবং গতির প্রকাশ ছন্দের উপর নির্ভরশীল। সে ক্ষেত্রে কথার প্রবেশ যখন আসে তখন ঐ কথাকে এমন ভাবে সাজিয়ে নিতে হয় বা ভেঙ্গে নিতে হয় যা মূল সুরের বিস্তারের উপর নির্ভরশীল হয় এবং যখন তা সবচেয়ে শ্রুতিমধুর হিসেবে সাজান হয় তখনই তাই হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। মূল সুর সা—রে—গা—মা ইত্যাদিকে ভেঙ্গে সাজিয়ে ছন্দের বিস্তারকে বলে আলাপ এবং যখন কথাকে ছন্দে গ্রথিত করে গতিতে বিস্তার হয়, তখন তাকে বলে খেয়াল এবং ধ্রুপদ শ্রেণীভুক্ত। যেমন "শবরী সুবাসে দেখ ওয়াকি" এই কথাকে খাম্বাজ রাগে গ্রথিত করে বিস্তার করেছেন মথুরার মাধোজি। এই ছন্দের বিস্তার সূর্য্য, চন্দ্রের অবস্থানের উপর, আকাশের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যেমন ভোর বেলা সূর্য্য আকাশে উঠে যাচ্ছে তখন ভৈরব সুরের বিস্তার হয় আবার আকাশে মেঘ এসেছে ঘনঘটা হয়ে তখন গীত হয় মেঘমল্লার রাগিনী। সুর হিসাবে মেঘমল্লারের স্ত্রী চরিত্র তাই রাগিনী।

রাগের স্ত্রী এবং পুরুষ চরিত্র নির্ভর করে উদ্দিষ্ট পার্থিব যোগাযোগের চরিত্রের উপর। বিদেশী সঙ্গীতেও এমন ধারণার সাথে আমরা পরিচিত যেমন Sunset of the Rhine অথবা Moonlight sonata ইত্যাদি। চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের যোগাযোগ

তার জন্মলগ্নেই। ছবিতে কথা এসেছে অনেক পরে প্রায় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পর। কিন্তু সঙ্গীতের সাথে যোগাযোগ ছিল প্রায় প্রথম দিককার ছবিতেই। যেমন প্রথম আক্ষরিক অর্থেই silent-films গুলোতে ছবি চলাকালীন তার পাশে concert বাজান হত। এর প্রথম কারণ ছিল ছবি কি আকার নেবে দর্শকের মনে তার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকায় সঙ্গীত মাঝখানের এই শূন্য স্থানকে পূরণ করতে পারে এমনতরো ধারণা এবং সঙ্গীত যে সব সময়েই এক ধরণের "musical relief" হিসাবে কাজ করে তা তখনকার নির্মাতারা জানতেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ল্যুমেয়ার ব্রাদার্সের ছবি উদ্বোধনের সময়ও পিয়ানোতে জনপ্রিয় সুর বাজান হয়েছিল। এরপর প্রায় প্রত্যেক সিনেমা হলই নিজেদের পছন্দ মতো "অর্কেস্ট্রা দল" রাখতে শুরু করলেন। সেক্ষেত্রে একই সিনেমার ভাগ্যে নানান স্থানে নানান সুরের আবহ সঙ্গীত জুটত। এরপর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এডিসন কম্পানী ছবির সাথে সাথে নির্দিষ্ট সঙ্গীত লিখতে শুরু করলেন। অর্থাৎ কোথায় পিয়ানো বাজবে, কোথায় বেহালা বাজবে, তাদের কি সুর হবে তা তারা ঠিক করে দিতে লাগলেন। এই নজরটা এসে যাওয়ার সাথে সাথেই ছবিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ অনেক বেশী সুসংবদ্ধ হয়ে গেল। যেমন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সেইন্ট-সায়েন্স প্রথম "Film d' Art" হিসাবে বিজ্ঞাপিত "The Assassination of the due of guise" ছবির অসাধারণ সুর সংযোজনা করলেন। এর এই সুর সংযোজনার নাম অপিয়াস ১২৮। যাতে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, স্ট্রিং, পিয়ানো, হারমোনিয়াম। ছবির মূল চরিত্রের সাথে সঙ্গীতের যোগাযোগ খুব সঠিক ভাবে করা হয়েছিল। এমন করা হয়েছিল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান ছবি "আরা-না-পগ্", ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ছবি "বিচার্ড-ওয়ার্গনারে।"

এখন এ কথা প্রায় সমস্ত চিত্ররসিকই জেনে গেছেন ছবির জগতে এক বিরাট step ছিল গ্রিফিথের "বার্থ অব এ নেশন"। এ ছবি সম্বন্ধে আলোচনা এই শতাব্দী জুড়ে হয়েছে। এই ছবির সুর রচনাও কার্য্যকরী ভাবে প্রথম সোপান তুলে ধরেছিল। ভিক্টোরিয়ান এজের সাহিত্য ও শিল্পে বিদগ্ধ গ্রিফিথ সুর রচনার ক্ষেত্রে পুরাতন প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পীদের সাহায্য নেন। লোক গাথা এবং সিম্ফনি এবং অন্যান্য "অর্কেস্ট্রার ক্ষেত্রে গ্রিফিথ ও জোসেফ কার্ল ব্রেইন নির্বাচন করেন In the Hall of the Mountain King" প্রভৃতি সঙ্গীত এবং বিটোভেন, সেই-কোভস্কি, লিজস্ট, রসিনি, ভার্দি প্রভৃতির সুর রচনা থেকে। এক্ষেত্রে তাদের সঙ্গীতের সঞ্চার ও বিস্তারকে কাজে লাগান হয় ছবির যুদ্ধকালীন পটভূমিকায়, প্রেমের দৃশ্য, নিগ্রোদের উপর অত্যাচার দেখানোর সময়। যে কাজটি গ্রিফিথ করেছিলেন তাহল সঙ্গীতের সঞ্চারের মধ্যে অবস্থিত আবেগকে দৃশ্যগত ঘটনার সাথে এমন ভাবে মিশিয়ে দিতে যায় ফলে ছবির চিত্রগ্রাহ্যতা আরো বেড়ে যায়।

গ্রিফিথ যেমন প্রতিষ্ঠিত অসাধারণ সঙ্গীতকে ছবিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন, ছবি নির্মাণ করার সময় সোভিয়েত দেশের পরিচালকদের পরিচালক আইজেনস্টাইন ছবির দৃশ্য সংগঠনের প্রয়োজনে ছবির জন্য অসাধারণ সুর রচনা করালেন এডমাণ্ড মাইসেলের সঙ্গীত পরিচালনায়। "ব্যাটেলশিপ পটেমকিন" ছবির জগতে দৃশ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে এক স্বতস্ফূর্ত বিপ্লব আনে। ছবির দৃশ্য সংযোজনের এই নূতন ব্যাকরণ সংঘটিত হয়েছিল বিপ্লব থেকে উদ্ভূত জনচিত্তের সাথে শিল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিমূর্ত সুরগুলির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ফলে। ছবিতে সুর রচনা করেছিলেন এডমাউণ্ড মাইসেল। তাদের সঙ্গীতের ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যুরি ডেভিডভের "The October Revolution and the Arts" বইতে পড়েছিলাম,

"They tried to give pride, of place to rhythm and not melody ; to a simultaneous harmony of musical themes instead of to their gradual development in the time plane. In general the chief priority became music's structural links, not its temporal ones, a principle which we have found to be characteristic of the montage method and which constitutes its back bone."

অর্থাৎ এক্ষেত্রে সঙ্গীতের বিস্তার ছিল দৃশ্যগত মন্তাজের পরিপূরক, 'মন্তাজ' শব্দটি ফরাসী যার অর্থ সংযোজন। কিন্তু রাশিয়ার চলচ্চিত্রে দেখা গেল সম্পাদনার সময় ক দৃশ্য ও খ দৃশ্যের সংযোজন শুধুমাত্র গাণিতিক যোগ না হয়ে তা এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করল যাকে আইজেনস্টাইন বলেছেন "সংঘাত" অর্থাৎ প্রতিটি সেলুলয়েডের মধ্যেকার দৃশ্যের সংযোজন এভাবে হবে যাকে চৈতন্য দিয়ে দেখতে হবে, শুধু মাত্র খালি চোখের দেখা নয়। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের এই নূতন ব্যাকরণ এর সাথে সঙ্গীতের সংযোজন এমন ভাবে করা হল যাতে যে আদর্শভাবের সৃষ্টির কথা ভাবা হচ্ছে তা সার্থক হয়। চলচ্চিত্রে ব্যাটেলশিপ্ পটেমকিনের সঙ্গীত রচনা এমন সার্থক ও অর্থবহ হয়েছিল যে ধনতান্ত্রিক দেশে ছবি চলতে দেওয়া হলেও তার সঙ্গীত banned করে দেওয়া হয়েছিল। জার্মানীতে সঙ্গীত বন্ধ করার ব্যাপারে বলা হয়েছিল "dangerous to the state".

সঙ্গীতের এই সংযোজন এর সার্থক কারণ হিসাবে আইজেন-স্টাইনের আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, কেউ কাঁদে তার কারণ এই নয় তারা দুঃখিত বরং তারা দুঃখিত বলেই কাঁদে

(জেমসের সাইকোলজিক্যাল সূত্র)। এই বয়ানে যেমন এক ধরণের aesthetic paradox রয়েছে, তেমন রয়েছে যে আমাদের মধ্যবর্তী নিজস্ব অভিব্যক্তিই তার পরিপূরক অভিব্যক্তির জন্ম দেয়। কোন চরিত্রের আবেগের প্রকাশের জন্য ছবিতে যেমন চরিত্রের গতিশীলতার দরকার হতে পারে, তেমন প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয় তার অঙ্গভঙ্গী (gesture) এই চরিত্রের গতিশীলতা এবং অঙ্গভঙ্গীও নির্ভর করে চরিত্রের পারিপার্শ্বিকতা, অবস্থান, সময়-অসময় এবং তার ব্যক্তি চরিত্রের ব্যতিক্রমের উপর। অর্থাৎ কোন চরিত্রের সঠিক সংযোজনের সময় সঙ্গীতের ব্যবহার হবে তার চারিত্রিক, মানসিক, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থানের উপর। রাত্রির অন্ধকারে কোন গরীব বাচ্চা ছেলে রাস্তায় এক টাকা কুড়িয়ে পেল, তার মুখ আনন্দে উপচে পড়ছে, এমন সময় কেউ ভৈরব রাগ বাজিয়ে দিলেন আবহসঙ্গীত হিসাবে, সেক্ষেত্রে ভুল হবে এই সঙ্গীতের প্রধান সময়কাল ভোরবেলাকে অস্বীকার করা। ফলে সেই সঙ্গীত নির্বাচন কোন অর্থেই সার্থক সঙ্গীত নির্দেশনা বলা চলে না।

এক্ষেত্রে আরেকজনের ক্ষেত্রে সুর রচনা হত অসাধারণ। উনি চার্লস চ্যাপলিন। 'লাইম লাইট'-এর সুর রচনায় সঙ্গীতের নৈপুণ্য এবং অপরিসীম জ্ঞান ছবির মতোই অসাধারণ উঁচু স্তরে ছিলো। "The Kid" ছবিতেও স্বপ্নদৃশ্যে সঙ্গীতের রূপান্তরগুলি ছিলো উঁচু মানের। এক্ষেত্রে এখনো প্রবীণ পরিচালকদের মধ্যে অনেক আছেন যাদের ছবিতে সঙ্গীতের স্থান অন্যান্যদের তুলনায় বেশী। যেমন ক্রফো এবং গদারের ছবিতে। ফেলিনির "I Remember" ছবিটিতেও সঙ্গীতের ব্যবহার অন্যদের তুলনায় বেশী।

সাইলেন্ট ছবির সময়কাল এখনকার ছবির সময়কাল থেকে সাধারণতঃ কম ছিল। এবং ঘটনার প্রকাশেও সে সময় পরিচালকদের লক্ষ্য করতে হত চরিত্রের গতিশীলতার উপর। কারণ সংলাপের সুযোগ নিয়ে একটানা "relax scene" তৈরী করা সে সময় সম্ভব ছিল না। ফলে রূপের দিক দিয়ে সঙ্গীতের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হলেও তা নির্বাচিত হত যত্ন সহকারে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের সাধারণ চলচ্চিত্রের অবস্থা খুব কাহিল। এখানে কথাপ্রধান সঙ্গীতের ব্যবহার এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যা সঙ্গীতের আদর্শকেও ব্যাঘাত করেছে এবং anatomy গঠনে কোন রকম কার্যকরী হচ্ছে না। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার চলচ্চিত্র একটা গতিশীল শিল্প আবার গতির সাথে সঙ্গীতের যোগাযোগ অসাধারণ তাই সঙ্গীতের সাথে চলচ্চিত্রের যোগ হবে সেখানেই যেখানে তাদের মৌলিক ধর্ম একত্রিত হয়।

ছবিতে সংলাপ আসার পর অর্থাৎ শব্দ আসার পরেও চলচ্চিত্রের ধর্মের দিক থেকে পরিচালকরা বুঝতে পেরেছিলেন, সংলাপের আধিক্য হলে চলচ্চিত্র হয়ে পড়ে বর্ণনামূলক যা আদৌ শিল্পচিত্রের অন্যতম ধর্ম হতে পারে না। তাই আবেগের প্রকাশে তারা আরো বেশী যত্নবান রইলেন সঙ্গীতের ব্যবহারের উপর। শব্দ আসার পর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন গ্রেট বৃটেনের উইলিয়াম এল্টিয়ন, আর্থার বেঞ্জামিন, আর্থার ব্লিস, ফ্রান্সের আর্থার হোনেগার, মউরিস জর্ডবার, ডেরিয়াস মিলাউড ইত্যাদিরা। রাশিয়াতে ছবিতে শব্দ আসলো ১৯৩১ সালে। প্রথম দিককার ছবিতেই তরুণ সঙ্গীত পরিচালক ডিমিট্রি মস্তাকোভিচ অসাধারণ সঙ্গীত নির্দেশনা করলেন, 'অ্যালোন, গোল্ডেন মাউন্টেন' ছবিতে। উনি সঙ্গীতের টুকরো টুকরো, কথা, ভাঙা সংলাপ জুড়ে এমন এক নাটকীয় একত্রতা তৈরি করলেন যা চলচ্চিত্রে এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হয়ে রইল। আর তারই সাথে প্রবীন প্রকোবাইভ সঙ্গীত পরিচালনা করলেন 'আলেকজেণ্ডার নেভস্কি' এবং 'ইভান দ্য টেরিবল' এর দুটি পর্ব-যার উত্থান, পতন, স্তব্ধতা, এখনো অসাধারণ বলে চিহ্নিত।

এক্ষেত্রে সঙ্গীত পরিচালকরা বুঝতে পারছিলেন সঙ্গীত নিজেই একটা পূর্ণ মাধ্যম এবং শিল্পে তার একার প্রবেশ নিশ্চিত। কিন্তু শব্দ-ছবিতেও চিত্রময়তা বা visual-ই হল চলচ্চিত্রের প্রধান গুণ। সেক্ষেত্রে চিত্রে দর্শনগ্রাহ্যতা বাড়াতে সাহায্য করে সঙ্গীত। সঙ্গীত ছাড়াও চিত্র সম্ভব কিন্তু তার সম্পূর্ণতায় একটা ফাঁক থাকে, তা হল তাতে গতির সঞ্চার চূড়ান্ত পর্যায়ে আনা যায় না। এক্ষেত্রে সঙ্গীত কাজ করে "servant art" হিসাবে। (কোন সঙ্গীত রসিক যেন এই বক্তব্যে দুঃখিত না হন) সঙ্গীতের এই ব্যবহার অপেরা বা যাত্রা অথবা নাটকে অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল। কিন্তু চলচ্চিত্রে এই ব্যবহার যত কার্যকরী হল অন্যান্য মাধ্যম ততখানি যেতে পারে নি।

ছবিতে সঙ্গীতের ব্যবহার কী পরিমাণে হবে তা নির্ভর করে চলচ্চিত্রের চরিত্রের উপর। প্রথমতঃ এখনকার শহরের ছবিতে যেখানে সঙ্গীত জীবনের চলাফেরায় আস্তে আস্তে কমে আসছে এবং তা দখল করে নিচ্ছে নানান ধরণের যান্ত্রিক শব্দ সেখানে ধ্রুপদ সঙ্গীতের ব্যবহারও প্রয়োজন মত না হলে যথেচ্ছচার। egg-head intellectuals-রা প্রশংসা করতে পারেন কিন্তু তাহলে ছবিতে সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। ধরা যাক যেখানে হাল চাষ হচ্ছে, গরুর সাথে কথা বলছে চাষী এক অপূর্ব ভাষায় সেটা নিশ্চয়ই ট্রাকটার দেখাবার সময় সম্ভব নয়। এখানে এমন কথা বলা হচ্ছে না ট্রাকটার চাষের ক্ষেত্রে কাজে লাগান হবে না। বরং দেখান হচ্ছে artistic quantities এর রূপও তার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। কনে নিয়ে পাল্কী চলেছে "হুকুম্বা হুকুম্বা" করতে করতে এই কথা বা শব্দগুলো এক অদ্ভুত লোকসুরে বাঁধা কিন্তু সে ক্ষেত্রে তা পরিবর্তিত হয়ে গ্রামেও কনে যাচ্ছে রিক্সায় বা ট্যাক্সিতে। ছন্দটা দূরে চলে যাচ্ছে এবং তা পরিবর্তিত হয়ে আসছে যান্ত্রিক শব্দ। পাখীর সংখ্যাও কমে আসছে।

এর ফলে sound films-এর ক্ষেত্রে বিদেশে (এবং এদেশেও) electronic music direction, কম্পুটার কর্তৃক সঙ্গীত পরিচালনা এবং অদ্ভুত সব শব্দকে সঙ্গীতের আকার দেওয়া হচ্ছে। আবার অবশ্যই এর quality নির্ভর করবে রচয়িতার পারদর্শিতার উপর। সেক্ষেত্রে শিল্পের ভেতরকার ধারক গুণাগুণ থেকে যাওয়ার সাথেসাথেই লক্ষ্য করা যায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত জাগরণকে। অবশ্য এর সাথে এটাও আজ নিশ্চিত ভাবে বলা যায় এখনকার সময় কোন এক বিশেষ মুহূর্তের দিকে ধাবমান হতে পারে নি। এই সময়কে বলা যেতে পারে নানান ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা নানান বিপরীতার্থক সময়ের যোগফল। তবুও জীবনের সংজ্ঞা হিসেবে শিল্পীদের গ্রহণযোগ্য হল, an emotional link with others এবং তাও ভেঙে খান খান হয়ে যায় প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু দিয়ে। সেক্ষেত্রে এরই প্রতিফলন চলচ্চিত্রে আসার সময় পরিচালকদের লক্ষ্য রাখা দরকার, শিল্পের নন্দনতত্ত্বের প্রসার হয় উদার অনুভবের প্রসন্নতায়। সঙ্গীতের মূলগত ধর্মও তাই। রাগিণী, তান, লয়, রস সব ভুলে গেলেও বাকী থাকে মাধর্য্য, বিশুদ্ধ মাধুর্য্য।

উপরের এই ধ্যান ধারণাকে চলচ্চিত্রে আমাদের দেশে সঞ্চারিত করেন সত্যজিৎ রায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন, পেশাদার শিল্পীর মতোই পিয়ানো বাজাতে পারেন। তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী'র সুর ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম সার্থক সঙ্গীত রচনা। টিন, বাক্স, পেয়ালা, পাখীদের কিচির মিচির, তার সানাইয়ের ব্যবহার এভাবে মিশে গিয়েছিল যার তুলনা নেই। সর্বজয়ার কান্নার সাথে তার সানাইয়ের ব্যবহার এবং ইন্দির ঠাকরুণ দাওয়ায় বসে খালি গলায় ' হরি দিন তো গেল, বেলা তো হল" এমন একটা effect সৃষ্টি করেছেন যা আগামী দিনের lesson হিসেবে নিতে হবে এবং হচ্ছে।

'জলসাঘর' ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের এক অভিজাত মানুষকে নিয়ে, ছবিতে সঙ্গীত নির্দেশনা করেছিলেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খান, এক্ষেত্রে সঙ্গীতের দায়িত্ব ছিল অসাধারণ। ছবির কেন্দ্র চরিত্র সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই বেঁচে আছেন, তাঁর চরিত্র এবং প্রকাশ সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা উম্মাসিক flash আছে। মন্তাজের টেকনিক দুটি মাত্র মূল shot নিয়ে আবেগ প্রকাশ করা হয়েছিল 'জলসাঘর'-এ। ওস্তাদ গান ধরেছেন, ইন্টারকাট করে দেখান হল বাইরে প্রসন্ন আকাশ, আবার ঘোড়ার হ্রেস্বার সাথে সানাই এর সুর মূর্ছনা যোগ করে দেওয়া হয়েছিল অতীতের জীবনকে ধরার জন্য।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে 'রবীন্দ্রনাথ' ছবিতেও আবহ সঙ্গীতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সুর ছিল অসাধারণ। বিদেশী সঙ্গীত যন্ত্র, যেমন যুদ্ধের ভয়াবহতা বোঝান হয়েছে ড্রাম বাজিয়ে ও ভারতীয় সঙ্গীতযন্ত্রকে মিশিয়ে তোলা হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ' (প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে বলি আইজেনস্টাইনের ও অন্যান্যদের টাইপেজের উপর লেখা পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথ' চিত্রটি আমার দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি টাইপেজের ফিল্‌মের একটি, অন্য ছবির নাম 'অক্টোবর')। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'তেও তাই। সেখানে দার্জিলিং এর পারিপার্শ্বিক শব্দগুলির সাথে ছবিকে এক করে দেওয়া হয়েছে। যেমন গীর্জার ঘন্টা, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, পাখীর ডাককে আবহ সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করেছেন তারই সাথে লাবণ্য (করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়) "নিজ বাসভূমে" গানটির একটা অংশ গাইছেন। 'অভিযান'-এ সত্যজিৎ রায় আবার অসাধারণ সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। আবহ সঙ্গীতে দেশওয়ালিদের টুকরো গান, গুলাবীর মুখে গান ইত্যাদি ভেঙে জুড়ে এক বিরাট সম্পদে পরিণত করেছিলেন।

তারপর 'চারুলতা'য় আবার অসাধারণ সঙ্গীত পরিচালনা। মোজার্টের রেকর্ড সত্যজিৎ রায়ের খুব প্রিয় ছিল আগে থেকেই। তার থেকে সঙ্গীত নিলেন এবং তারই সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ভেঙে এমন এক সঙ্গীতের হাট তৈরী করলেন যার তুলনীয় ব্যাপার এখনো ভারতীয় ছবিতে আসে নি। এ ছবিতে চারিটি সাঙ্গীতিক মোটিভ আছে, একটা 'চারুলতা'র নিঃসঙ্গতা বোঝাবার জন্য, দ্বিতীয়টি অমলের কাছে চারুর ভেঙে পড়ার দৃশ্য, তৃতীয়টি স্কচ সুরের অবলম্বনে এবং চতুর্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুসারে। স্থায়িত্বের দিক দিয়ে মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে এগার মিনিট।

সঙ্গীতের ব্যবহারকে আরেকবার অসাধারণ স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। সে ছবি ছিল 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'। ওই ছবির প্রত্যেকটি গান উনি রচনা করেছেন। সাদামাটা কথাতে অসাধারণ সুর ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে কথা আর সুরের এমন ব্যবহার আর হয় নি। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে সত্যজিৎ রায় কি পরিমাণ দখল রাখেন তাও এই চিত্রে দেখা গেল। প্রাদেশিক সঙ্গীত সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের আগ্রহ ফিল্মে আসার পর দিনের পর দিন বাড়ছিলো। সেই আগ্রহকে উনি কাজে লাগালেন এই ছবিতে।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি বাদেও ভারতীয় চলচ্চিত্রে আরো সুন্দর সঙ্গীত পরিচালনা হয়েছে। যেমন এম. এস. সথ্যুর 'গরম হাওয়া' শ্যাম বেনেগালের 'অঙ্কুর' (যার শেষ দৃশ্যে সঙ্গীতের বিস্তার নিঃসন্দেহে অসাধারণ), মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' ইত্যাদি। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে সঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে সবচেয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হয় চিত্র পরিচালকের'। কারণ শেষপর্যন্ত ওনার হাতেই film-এর ভাগ্য নির্ভর করে। ভারতীয় চিত্রে এমন অনেক সঙ্গীত পরিচালক আছেন যাদের সংগীত সম্পর্কে ধ্যান ধারণার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেমন কুমার শ্রীশচিন দেববর্মন, মদন মোহন (বেশী দিন হয় নি মারা গেছেন), ইত্যাদিরা। এদের potentiality-কে কাজে লাগাবার মতো চিত্র পরিচালক না থাকাতেই তাঁদের অসাধারণত্ব ধরা পড়ল না।

"পড়োসান" বলে এক অত্যন্ত খেলো ছবিতে আলাদাভাবে দেখলে রাহুল দেববর্মন উঁচু দরের উত্তর এবং দক্ষিণী ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ছবির নিছক দৃশ্য সংগঠনগুলির সাথে আদৌ উন্নত ধরণের সঙ্গীতের প্রয়োজন হয় না। শেষ পর্যন্ত তা বুঝতে পেরেই বোধ হয় নির্মিত হয়, পেটেন্ট মিউজিক। হলিউডের সৃষ্টি এই ধরণের মিউজিক প্রেম পর্যায়. action দৃশ্য ইত্যাদির জন্য যথাক্রমে রাখা থাকে stock সঙ্গীত। গানের ব্যাপারেও নায়ক, নায়িকাদের পছন্দমত গায়ক, গায়িকা থাকে। সাধারণ ভাবে এর জন্য মহৎ সঙ্গীতের প্রভাবও ভীষণ ভাবে কমে আসছে, ভারতীয় ছবিতে।

তাছাড়া উন্নততর পরিচালকদেরও সঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে এদেশে ভীষণ সচেতনতা দরকার। ভারতীয় রাগ সঙ্গীত এবং লোক সঙ্গীতের span অত্যন্ত বেশী। এদেশের যে কোন ধর্মীয় আন্দোলন থেকে জন্ম নিয়েছে অসাধারণ সব সঙ্গীত। বৈষ্ণব সঙ্গীত, শাক্ত সঙ্গীত ইত্যাদি ধর্মীয় সঙ্গীতের সাথে অভিজাত শ্রেণী থেকে আগত সঙ্গীত, প্রাচীন সঙ্গীত, অন্য সব বাদ্য যন্ত্র তো আছেই। এছাড়া নদীর পাড়ে পাড়ে জন্ম নিয়েছে গ্রামীণ সঙ্গীত। ত্রিপুরায় থাকাকালীন দেখেছিলাম, ওখানকার সঙ্গীত কি ব্যাপক। উপজাতিদের গলাই সঙ্গীতের গলার খুব কাছাকাছি। ওদের প্রায় প্রত্যেকেই গান গায়। উৎসবের শ্রোতারাও এক সময় গানে জড়িয়ে পড়েন। আবার এমন অনেক শ্রমিক আছেন যাদের রাত্রিবেলা বিশ্রাম হয় খোল, করতালের মধ্য দিয়ে। এই বিপুল সঙ্গীতের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সঙ্গীত বেছে চলচ্চিত্রে ব্যবহার যেমন অসাধারণ কাজ, তেমন পরিশ্রমসাধ্যও। সত্যজিৎ রায়ের মতন পরিশ্রম করেই আগামী দিনের শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও সঙ্গীত পরিচালকরাও যেন এই কঠিন কাজটি করেন।

"PHOTOGRAPHY" is said to have been invented in the year 1839. It came into commercial use in 1840 when Bournes, who were probably operating as Artists in Calcutta, started a photographic studio. A few years later, Mr. Bourne went into partnership with Mr. Shepherd, a reputed photographer based in Simla.

At that time, the studio served mainly the Europeans in India, the Governor Generals and Viceroys, and also the Indian Princes and Zamindars. While visiting their clients, Bourne and Shepherd took a vast photographic record monuments, festivals, industries and people, many of which still form a part of Bourne and Shepherd's Library.

Bourne and Shepherd have had for over a century many talented photographers whose creativity kept the studio in the forefront of photographic development. Their incessant drive and energy made this studio one of the most well-known and respected in the field of professional photography. Among their contributions to archives are the famous photographic coverages of Prince of Wales' visit in 1876 and of Delhi Durbars of 1903 and 1911.

Bourne and Shepherd today still carry the vast tradition in classical portraiture. But a new dimension has been added with their branching out in applied photography with emphasis on Advertising and Industrial aspects.

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(গত সংখ্যার পর)

দৃশ্য—৬৯

স্থান—অনিরুদ্ধর ধানক্ষেত এবং পাশের রাস্তা।

সময়—জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। শীতকাল।

শীতের শুরু। মাঠের ধান পাকতে শুরু করেছে।

দুর্গা : উঁহু মা!

লোটন : কি হল?

দুর্গা : কাঁটা।

কাট টু।

ছিরু ও গড়াই ধানক্ষেত থেকে সব দেখে।

লোটন : (off voice) কি গ্যাচে?

কাট টু।

দুর্গা পায়ের কাঁটা বার করে ছুঁড়ে ফেলে।

দুর্গা : হাঁা, চলো!

ওরা চলতে শুরু করে, দুর্গা গুনগুন্ করে গায়

দুর্গা : পায়ের কাঁটা না হয়ে সই
বুকের কাঁটা হলে পরে
বুকের মধু পান করিতে
হুল বসায়ে, হুল বসায়ে, হুল বসায়ে····

ধীরে ধীরে অন্ধকারে ওরা মিলিয়ে গেলে ফোর গ্রাউণ্ডে ছিরু

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার



দুর্গা (সন্ধ্যা রায়)
ছবি : ধীরেন দেব



পদ্মবৌ (মাধবী চক্রবর্তী)
ছবি : ধীরেন দেব

একবোঝা বাসন নিয়ে ঘরের পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে পদ্ম। পুকুরের সামনে দাঁড়ায়। ওপারে ছিরু পালের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে শাপান্ত করতে শুরু করে।

পদ্ম : কুঠে হবে, হাতে কুঠে হবে! যে হাতে আমার জমির ধান কেটেছে—সে হাত খসে খসে পড়বে, ...চোখ দুটো গলে গলে পড়বে! · শ্যাল কুকুরে ঠুকরে ঠুকরে খাবে এই বলে দিলাম!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪২

স্থান—ছিরু পালের ঘরের বাহির অংশ এবং বারান্দা।

সময়—দিন।

ছিরু পাল বারান্দায় বসে হুঁকো টানতে টানতে হিসাবের খাতা দেখছে। পদ্মর গালাগালি সে যেন বেশ উপভোগ করছে। বৌ লক্ষ্মীমণি এক বাটি জল নিয়ে আসে। ছিরু পাল অভ্যাস মত ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। লক্ষ্মীমণি সেই জল নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। পদ্মর গালাগালিটা শোনে।

পদ্ম : (off voice) শ্মশানে ঠাঁই হবে না! সব্বস্ব যাবে! কুড়ে কুড়ে খাবে ঐ বাকুড়ি ধানের চাল! ঐ চালে কলেরা হবে! শিবরাত্রির সলতে ঐ ব্যাটা ধড়ফড়্ ধড়ফড়্ করে মরবে।

ইতিমধ্যে ছিরু পালের মা একগোছা শুকনো তালপাতা নিয়ে বাড়ীতে ঢোকে।

পদ্ম : (off voice) নিজে মরবে না,—বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতে হবে! চোখের সামনে বৌ, ব্যাটা, মা....

ছিরুর মা : কে রে? .. কে?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৩

স্থান—খিড়কি পুকুর।

সময়—দিন।

পদ্ম খিড়কি পুকুরে নামে। বাসন মাজতে শুরু করে এবং বলে চলে—

পদ্ম : নিব্বংশ...নিব্বংশ হবে সব! একটার পর একটা প্যাট্ প্যাট্ প্যাট্ প্যাট্ করে যাও যাও—

হঠাৎ পদ্মর গলা ছাপিয়ে শোনা যায় ছিরুর মা'র গলা। তিনি পুকুরের উল্টো পারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ছিরুর মা : কেনে রে?....কেনে? হাপরমুখীর এত ফোঁস-ফোঁসানী কেনে?

কাট্ টু।

পুকুরের পারে বসে থাকা এক ঝাঁক কাক তাঁর চীৎকার শুনে উড়ে যায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম।

পদ্ম : (আরও গলা চড়িয়ে) বুঝতে লারছে! আবাগীর বেটী চুন্নী মাগী বুঝতে লারছে....

ছিরুর মা : যে বলে, মরবে সে! মইরবে তার সাধের বারো ভাতার, মইরবে তার ঢলানি গতরের চুলবুলানি ....শুঁটকি হয়ে...চিমসে হয়ে....

পদ্ম : শুঁটকি হবে তোর গভ্ভের ঝাড়! তাকা কেনে? নাতি-পুতি-ব্যাটার-বৌয়ের দিকে তাকা কেনে রে খালভরি....

পাড়া প্রতিবেশীরা আশ-পাশের ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দুজনের ঝগড়া শোনে।

ছিরুর মা : আলো, অ শতেকখোয়ারী! কি তোর ঐ ভাঁদা গতরের ত্যাজও কমল বলে! আহা-হা পচানী ধইল্লো বলে! গন্ধে মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ কইল্লো বলে—

পদ্ম : মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করুক বুড়ি শকুনির মুখে! ওপরে যদি ভগ্মান থাকে তো

ছিরুর মা : হ্যাঁ হ্যাঁ, ভগমান আছে! আছে যে আঁটকুড়ির বেটী পাটকুড়ি! নৈলে গভ্ভে হাজা লেগে বাঁজা হবি কেনে? এই বয়সে কোল খালি থাকবে কেনে?

কাট্ টু।

পদ্ম আঘাত পায়। নিষ্ঠুর সত্য কথাটি শুনে সে আর স্থির থাকতে পারে না। পদ্ম উঠে দাঁড়ায়। চোখে মুখে তার পরাজয়ের ছাপ।

ছিরুর মা : (off voice) "বাঁজা মাগীর কোল খালি বংশের গুড়ে পইল্লো বালি" নিব্বংশ হবিরে মাগী, নিব্বংশ হবি। এই বলে দিলাম।

পদ্ম বাসনপত্রগুলো জড়ো করে তাড়াতাড়ি করে পেছনের দরজা দিয়েই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৪

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতরের অংশ ও বারান্দা।

সময়—দিন।

পদ্ম ভেতরে ঢোকে। ভাঙ্গাচোরা কামারশালাটা পেরিয়ে বারান্দায় বাসনগুলো রাখে। উত্তেজনা প্রশমিত করতে সে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়ায়।

দেখা যায় অনিরুদ্ধ বারান্দা থেকে জামার বোতাম আটকাতে আটকাতে উঠোনে নেমে আসছে।

অনিরুদ্ধ : শালার গুষ্ঠীর আমি যদি ষষ্ঠীপূজো না করেছি তো—

পদ্ম : (তাড়াতাড়ি এগিয়ে অনিরুদ্ধর পথ আগলে দাঁড়ায়) না না, আর ঝন্‌ঝোটে কাজ নেই, শোন—

অনিরুদ্ধ : পথ ছাড়্। ওখানে যেছি না।

পদ্ম : তবে?

অনিরুদ্ধ : থানায়? ও শালা ছিরে পালের ভিটেয় আমি ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৫

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা, ডিসপেনসারির সামনে।

সময়—দিন।

গাঁয়ের নাপিত তারা জগন ডাক্তারের দাড়ি কামাচ্ছে।

তারা : বলেন কি?

জগন : (উত্তেজিত ভঙ্গিতে) তবে? সব পাখি-পড়া করে শিখিয়ে দিয়েছি। থানায় গিয়ে শুধু ওগরাবে, আর এই (হাতকড়া পরানোর ভঙ্গি করে) ছিরে শালার হাতে।

তারা : নড়বেন না।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ ও উঠোন।

সময়—দিন।

পদ্ম : তুমি কি ক্ষেপেছ?

অনিরুদ্ধ : কেনে?

পদ্ম : ছিরুর সঙ্গে ছোট দারোগার সাঁটের কথা জানো না?....একসঙ্গে নেশা-ভাং করে দুজন!

অনিরুদ্ধ : তাই বলে লাথি হজম করব!

অনিরুদ্ধ দরজার দিকে ছুটে যায়।

পদ্ম : (পিছু পিছু গিয়ে) উ কি?... কোথা চল্লে?

অনিরুদ্ধ উত্তর দেয় না। বেরিয়ে যায়।

পদ্ম : (দরজার কাছে পৌঁছে) শোনো....যেয়ো না—

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

অনিরুদ্ধ বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। পদ্ম দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে জোরে বলে—

পদ্ম : শোন, যেয়ো না—

অনিরুদ্ধ উত্তর দেয় না।

পদ্ম : থানা পুলিশ করছ, এরপর হাঙ্গামা হবে কিন্তুক—

অনিরুদ্ধ এগিয়েই যায়।

পদ্ম : আমাদের ঘরও তল্লাশী করবে—

অনিরুদ্ধ শুনেও যেন শোনে না।

পদ্ম : আমায় শুদ্দু নিয়ে টানাটানি করবে, এজলাসে ওঠাবে—এই বলে দিলাম।

অনিরুদ্ধ এবার থামে। বিচলিত চোখে তাকায়। পদ্মর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

পদ্ম : (হাসতে হাসতে) পেছু ডাকছি। এট্টু খেয়ে যাও!

অনিরুদ্ধ এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে। তারপর পদ্মর সামনে এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং সজোরে তার গালে চড় মারে।

পদ্ম : বাপ্ রে!

অনিরুদ্ধ : ডাকবি? ডাকবি আর পেছু?

পদ্ম হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে। কাঁধটা কাঁপতে থাকে। বোঝা যায় সে কাঁদছে।

অনিরুদ্ধকে বিচলিত মনে হয়।

কাট্ টু।

পদ্মর ক্লোজ-আপ।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : এই!.. এই!....এই পদ্ম!....কি হয়েছে?

পদ্ম উত্তর দেয় না। অনিরুদ্ধ পাশে বসে তার হাত দুটো মুখ থেকে সরাতে চেষ্টা করে।

অনিরুদ্ধ : দেখি, দেখি—আহা দেখি না! ঐ ছাখো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে....আরে, বলছি তো

যাবো না। এই ভাখ্, জামা খুলে রাখছি…
হল তো ?

হঠাৎ পদ্ম অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে। তার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই।

পদ্ম : হি হি হি,…সত্যি ?

অনিরুদ্ধ পদ্মর এমন ব্যবহারে আঘাত পায়। চকিতে উঠে দাঁড়ায় সে।

পদ্মও দাঁড়িয়ে পড়ে।

পদ্ম : সত্যি, যাবে না বলো।

অনিরুদ্ধ উত্তর দেয় না। এমন সময় বাইরে থেকে জগন ডাক্তারের গলা শোনা যায়।

জগন : (off voice) কৈ—রে—! অনিরুদ্ধ—!….
ও—ই—!

ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় জগন ডাক্তার সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে তারা নাপিত।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৮

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ ও বারান্দা।

সময়—দিন।

জগন ডাক্তারের গলা শুনে অনিরুদ্ধ বাইরের দিকে এগিয়ে যায়। পদ্ম তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে ভেতরে আসে ও দরজার আড়ালে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৪৯

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

জগন ডাক্তার সাইকেল নিয়ে এগিয়ে আসে। তারা রয়েছে পেছনে। অনিরুদ্ধ ফ্রেমে ঢুকতেই

জগন : একি !….এখনো যাস্‌নি ?

অনিরুদ্ধ : আজ্ঞে….

জগন : পৈ পৈ করে বলে দিলাম সকাল আটটার মধ্যে
গিয়ে ধরবি ! ঠিক আছে, যা যা, এই সাইকেলটা
নিয়ে যা। জলদি !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫০

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ।

সময়—দিন।

পদ্ম দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যেন বিপদের আঁচ পায়। সে দরজার শেকলটি নাড়ে অনিরুদ্ধর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫১

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

অনিরুদ্ধ : কিন্তু ইদিকে যে সবাই বুলছে—

জগন : কি বুলছে ?

অনিরুদ্ধ : বুলছে যে, থানা পুলিশ…হাঙ্গামা…ঘরের মেয়ো-
ছেলেকে যদি জড়িয়ে দেয়—

জগন : এঁঃ—! জড়িয়ে দিলেই হল,—না! বাবার
বাবা নেই ? থানার ওপর পুলিশ-সাহেব নেই….
ম্যাস্টেট নেই….কমিশনার নেই ?

অনিরুদ্ধ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে মাথা নাড়ে।

জগন : তবে ? তার ওপর ছোট লাট্….বড় লাট্….
তেমন হলে আমায় এসে বলবি !….একটা দরখাস্ত
ঠুকব….বাপ্ বাপ্ বলে সবশুদ্ধ্ এসে পড়বে !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫২

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ।

সময়—দিন।

পদ্ম আবার দরজার শেকল নাড়ে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৩

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

কয়েক মুহূর্ত অনিরুদ্ধ জগনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর যেন হঠাৎই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে

অনিরুদ্ধ : তাহলে এই আমি চললাম।

জগনের কাছ থেকে সাইকেলটা নিয়ে অনিরুদ্ধ চলতে শুরু করে।

জগন : চুরি করেছে বলবি না—বলবি আক্রোশে ক্ষেতি
করবার জন্য কেটেছে—

অনিরুদ্ধ : (হাত নেড়ে) আচ্ছা—

অনিরুদ্ধ সাইকেলে চেপে চলে যায়। জগন ডাক্তারকে বেশ খুশি খুশি লাগে। জগন ও তারা দুজনেই চলে যায়।

জগন : চল মন নিজ নিকেতনে—

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৪

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর অংশ।

সময়—দিন।

পদ্ম অসহায়ভাবে দরজার আড়াল থেকে অনিরুদ্ধকে জগনের সাইকেলে চেপে চলে যেতে দেখে আর দরজার শেকল নাড়ে। কোন উপায় না দেখে উঠোন পেরিয়ে বাইরে বেরোতে যায়। কিন্তু হঠাৎ থেমে যায় পদ্ম।

কাট্ টু।

দরজার পেছনে কার শাড়ির কিছু অংশ যেন দেখা যায়। কে লুকিয়ে আছে সেখানে।

কাট্ টু।

পদ্ম : (দু পা এগিয়ে এসে) কে ? কে ওখানে ?

কাট্ টু।

দরজার পেছন থেকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে লক্ষ্মীমণি বেরিয়ে আসে। কোলে তার ছেলে।

লক্ষ্মী : আমি কামার বৌ।

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—পদ্মর মুখ রাগে শক্ত হয়ে যায়।

কাট্ টু।

লক্ষ্মী : তোমার পায়ে ধত্তে এসেছি ভাই।

সত্যিই সে পদ্মর পা ধরতে নুইয়ে পড়ে।

পদ্ম : (পিছিয়ে এসে) না না, এ কি ?

লক্ষ্মী : আমার ছেলেটাকে তোমরা গাল দিও না! যে করেছে তাকে দাও,…কি বলব তাতে ?

ক্লোজ শট্—পদ্ম বিস্মিত হয়। লক্ষ্মীমণি শাড়ির খুঁট খুলে টাকা বার করে।

লক্ষ্মী : তোমাদের অনেক ক্ষেতি করেছে। চাষীর মেয়ে …আমি জানি এ ক'টা…না না, রাখো এ তোমাকে রাখতে হবে।

দুটো দশ টাকার নোট সে পদ্মর হাতে গুঁজে দেয়।

লক্ষ্মী : শুধু একে একটু আশীর্ব্বাদ করো ভাই!

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—পদ্ম।

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—লক্ষ্মীমণি আর কোলের বাচ্চাটা

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—লক্ষ্মীমণি।

কাট্ টু।

পদ্ম কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে এগিয়ে আসে লক্ষ্মীমণির দিকে। এবং বাচ্চাটির মাথায় হাত দেয়।

কাট্ টু।

আবেগে লক্ষ্মীর চোখ ছলছল্ করে ওঠে। সে বলে—

লক্ষ্মী : লুকিয়ে এসেছি। জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবে না।

তাড়াতাড়ি সে খিড়কির দরজা দিয়ে চলে যেতে গিয়েও থামে এবং মুখ ফেরায়

লক্ষ্মী : ভগমান তোমার ভালো করুন।

লক্ষ্মীমণি এবার চলে যায়। ক্যামেরা চার্জ করে পদ্মকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৫

স্থান—গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

জগন ডাক্তার খালি পায়ে হেঁটে চলেছে। একটা বাঁকের কাছে এসে বিপরীত দিক থেকে আসা দুর্গার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগে আর কি!

দুর্গা : হাই মা!…আপনার পাও গাড়ী ?

জগন : থানায় ?

দুর্গা : এ্যাঁ!

জগন : থানায় থানায়,…তোর দাদা কোথায় রে ?

দুর্গা : কে জানে বাপু! সাত সকালে বুনো শোরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ কত্তে কত্তে কুথাকে যেন বেরয়ে গেল!

জগন : গ্যাছে!…ঠিক জানিস ?

দুর্গা : কেনে ?

জগন : ভূমিকম্প!

দুর্গা : এ্যাঁ ?

উৎফুল্ল মনে জগন ডাক্তার ঘুরতে শুরু করে আর গুন্‌গুন্ করে গায়—

জগন : "তুর্কি নাচন নাচবে যখন আপন ভুলে,
ছিরু পাল, হে ছিরু পাল, ধুতির বাঁধন পড়বে খুলে,
তুর্কি নাচন!"

দুর্গা : (বিস্মিত হয়ে) এ্যাঁ!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৬

স্থান—জমিদারের কাছারী বাড়ীর বারান্দা ও বাগান।

সময়—দিন।

ক্যামেরা ক্ষত-বিক্ষত পাতু বায়েনের পিঠের ওপর থেকে ট্রাক ব্যাক্ করলে দেখা যায় পাতু হাত জোড় করে বারান্দায় বসে। কল্পনার নতুন তরুণ জমিদার আরাম কেদারায় তাঁর সামনে বসে।

জমিদার : হুঁ···গোমস্তা মশাই।

প্রধান গোমস্তা দাসজী এগিয়ে আসেন।

জমিদার : Who is this ছিরু পাল?

গোমস্তা : আজ্ঞে ঐ শিবানীপুরের···পুরনো প্রজা···কর্তা-মশাই বেঁচে থাকতে—

সে জমিদারের কানে কানে কি যেন নীচু স্বরে বলে।

জমিদার : I see!···তা এরকম ঝনঝাট্ বাধায় কেন?

পাতু : এঁজ্ঞে ঝনঝাট্ কি বুলছেন হুজুর! কাল যেতে আরো কি করেছে জানেন?···উদিকে দেখেন গা ····এতক্ষণে থানা····পুলিশ—

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৭

স্থান—গাঁয়ের অন্য রাস্তা।

সময়—দিন।

ট্রলি শট্। একদল পুলিশ একজন সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে গ্রামে ঢুকছে। অনিরুদ্ধ জগন ডাক্তারের সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ওদের নিয়ে আসছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৮

স্থান—ছিরুর বাড়ীর গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ছিরু পালের হাতে একটা বড় রুই মাছ। মাছটা তুলে সে ঝুড়ি ভর্তি তরকারীর ওপর রাখে। ক্যামেরা টিল্ট্-আপ করলে দেখা যায় গড়াই সামনের দরজা দিয়ে উঠোনে ঢুকছে।

গড়াই : মিত্তে! এসে গ্যাছে।

ছিরু : ছোট,···না বড়?

গড়াই : ছোট দারোগা।

ছিরু : (অন্যমনস্কভাবে গড়াই-এর হাতে ঝুড়িটা তুলে দিয়ে) খিড়কি বাগান থেকে দুটো ফুলকপি তুলে দিস।

গড়াই মাথা নেড়ে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৫৯

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

স্কুল চলছে। হঠাৎ দেবু পণ্ডিত ও ছাত্ররা কোলাহল শুনতে পেয়ে উৎসুক চোখে উঠে দাঁড়ায়।

সাব ইন্সপেক্টর ও অনিরুদ্ধ সহ পুলিশের দল এগিয়ে আসছে। পেছনে একদল গাঁয়ের লোক—ভবেশ, হরিশ, হরেন, মুকুন্দ, বৃন্দাবন, মথুর সবাই চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। উত্তেজনা বেড়ে ওঠে।

অনিরুদ্ধ : (সাইকেলটা গিরীশের হাতে দিয়ে, ছিরুর বাড়ীর পথ দেখিয়ে) আসেন, আসেন ইদিকে····

এস-আই : দাঁড়া, তল্লাশীর আগে দু-একজন সাক্ষী তো চাই!···আপনারা দু-একজন আসুনতো।

কাট্ টু।

ভবেশ, হরিশ-এর দলের কম্পোজিট শট্।

ভবেশ : এই ররেছে!

এস-আই : কি হল?···আসুন!

ভবেশ : আমি····(হরিশকে) যাও না হে····

হরিশ : কেনে?····তুমি যাও না!

হরেন ইতিমধ্যে ঝুপ্ করে লুকিয়ে পড়ে এবং অলক্ষ্যে সরে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬০

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেনসারির সামনে ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ক্যামেরা প্যান্ করে জগন ডাক্তারের সঙ্গে গিরীশকেও ধরে। গিরীশ এসেছে সাইকেলটা ফেরত দিতে।

জগন : কোন শালা যাবে না!···মুখে বলবে 'ছি হরি' 'ছি হরি'—ওখানে স-ব ব্যাটা থরহরি!

দৃশ্য—৬১

স্থান—গাঁয়ের রাস্তা—সজনেতলা।

সময়—দিন।

তারা নাপিত একটা তেঁতুল গাছের তলায় বসে আছে। হরেন ছুটতে ছুটতে এসে তার সামনে বসে।

হরেন : এই! কুইক!

তারা : কি হল?

হরেন : চুল···দাড়ি···গোঁফ···! টেক্ টাইম···টেক্ টাইম!····লং টাইম!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬২

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

আরো লোক ভিড় করে আসে। সাব ইন্সপেক্টর অনিরুদ্ধকে বলে—

এস-আই : কৈ হে, একটু নড়েচড়ে ছাখো!

অনিরুদ্ধ দেবু পণ্ডিতের কাছে এগিয়ে আসে। মুহূর্তে দ্বিধা ঝেড়ে বলে—

অনিরুদ্ধ : দেবু-ভাই!....একবার আসবে আমার সঙ্গে?

মথুর : এখন 'ভাই'! ...কে 'ভাই?'

অনিরুদ্ধ : (কড়া স্বরে) তোমার সঙ্গে কথা কইছি না!.... ...দেবুভাই আমার পাঠশালার বন্ধু! (দেবুকে) দেবু-ভাই!

দেবু পণ্ডিত কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে। তারপর অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে চড়া গলায় বলে—

দেবু : না অনিরুদ্ধ! সে পাঠশালা যেখানে বসত, কাল সেখানে তুমি থুতু ফেলে চলে গ্যাছো!

অনিরুদ্ধ থমকে যায়। সাব ইন্সপেক্টর এগিয়ে আসেন।

এস-আই : বুঝলে বাবা অপ-কম্মকার! যা মনে হচ্ছে, পালে তোমার বাতাস নেই। চলো, এমনি তাহলে দেখে আসি।

দৃশ্য—৬৩

স্থান—ছিরু পালের বাড়ীর গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

একটা খালি মরাই-এর দরজার ওপর থেকে ক্যামেরা জুম্ ব্যাক করলে দেখা যায় গোলাঘরের সামনে সাব ইন্সপেক্টরের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে ছিরু পাল। কয়েকটা কনস্টেবল এদিক-ওদিক ঘুরছে।

মরাই-এর মধ্য থেকে তিনজন কনস্টেবল বেরিয়ে আসে। এস-আই তাদের দিকে এগিয়ে যায়।

এস-আই : কি রে? কিছু পেলি?

কনস্টেবল : এজ্ঞে—না, শুধু একটা চামচিকে!

কনস্টেবলটি কথা বলতে বলতে মাথা নাড়ে এবং হাতের মুঠো খুলতেই ভুষি ধুলো পড়ে আর একটা চামচিকে উড়ে যায়।

মথুর : শালার কম্মকার! মিছমিছি মোড়লের মাথা হেঁট করলে! ই শুধু তোমার মাথা হেঁট নয় মোড়ল—ই গাঁয়ে যত সদগোপ আছে—এ আমাদের সকলের অপমান।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬৪

স্থান—পুরোন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্যামেরা অনিরুদ্ধের ভিউ পয়েন্ট থেকে ভবেশ, হরিশ, দেবু পণ্ডিত, মুকুন্দ, বৃন্দাবন, মথুরের দিকে এগিয়ে যায়। ওরা সবাই যেন বিরক্ত, বিক্ষুব্ধ।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধর সঙ্গে ক্যামেরা সাইড ট্রলি করে। ছিরু পালের গোলাঘর থেকে সে বেরিয়ে আসছে, পরাজিত, বিধ্বস্ত চেহারা।

কাট্ টু।

এস-আই : তাহলে আর কি! (কনস্টেবলদের) চল্‌রে!

হঠাৎ তাঁরা অফ্ ভয়েস-এ চীৎকার শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

হরেন : (off) স্টপ! স্টপ!

হরেনকে দেখা যায়। নিজের কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা। তারার গলায় গামছা জড়িয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে হরেন।

হরেন : কাম্ হেয়ার! কাম্—কাম্—ইউ নরসুন্দর।

এস-আই : একি? ব্যাপার কি?

হরেন : ব্যাপার!....এ্যারেস্ট হিম্। উইথ ডিউ রেসপেক্ট এণ্ড হাম্বল্ সাবমিশন্ এ্যারেস্ট হিম্।

এস-আই : এঁ্যা?

হরেন : ইয়েস! হি ইজ এ হারামজাদা, বজ্জাৎ। (এস-আইকে) লুক্ এ্যাট্ দিস্....লুক্ এ্যাট্ দিস্ ....এণ্ড লুক্ এ্যাট্ দিস্....

বলেই সে মাথার কাপড় তুলে আর্ধেক কামানো দাড়ি-গোঁফ ও চুল দেখায়।

কাট্ টু।

ভিড়ের মধ্যে অল্পবয়সী ছেলেরা খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

কাট্ টু।

হরেন : (চীৎকার করে) শাট্ আ—প—!

এস-আই : মাই গড্!...একি?

তারা : (হাত জোড় করে) এজ্ঞে আমার কি দোষ বলেন?

হরেন : হোয়া—ট—!!

তারা : এজ্ঞে, আমায় এসে বল্লেন চুল-দাড়ি কাটবেন। তা আমি বল্লাম, কাটেন—সে খুব ভালো কথা, কিন্তু আমার মজুরীটা নগদা—

হরেন : ইয়েস-ইয়েস হাউ ক্যাশ! তা দেব না বলেছি আমি!

তারা : কিন্তু দিলেন কোথায় বলেন?

হরেন : আজ দিই নাই—কিন্তু বলেছি তো কাল দেবো!

তারা : আজ্ঞে, তাতে যদি বলে থাকি বাকিটাও তাহলে কাল কামাবো—

হরেন : হো—য়া—ট্—!!

সকলে সশব্দে হেসে ওঠে।

কাট্ টু।

হরিশ : (মথুরকে তিরস্কার করে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে) হাসিস না, হাসিস না—এতে হাসবার কি আছে!

হঠাৎ তারাকে টানতে টানতে আবার হরেন চলতে থাকে।

হরেন : অ-ল্—রাইট!·· আয়! আয় আমার সঙ্গে! আই শ্যাল ক্যাশ ইউ।···নগদাই দিব তোকে—!

কাট্ টু।

ভবেশ, হরিশ ও সবাই ওদের যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকে।

কাট্ টু।

এস-আই : (কনষ্টেবলদের) চল্‌রে!

হরেন : জোক্? বাউনের সঙ্গে ঠাট্টা! আয়! আয় ইদিক! আয়!

ওরা ধীরে ধীরে চোখের বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু।

ভবেশ : হরিশের দল।

হরিশ : ছি ছি ছি···কি হচ্ছে এসব বলো তো?

মুকুন্দ : ব্যাঙের লাথি, বুঝলে—ব্যাঙের লাথি!

ভবেশ : (দেবুর কাছে এসে) সব ঐ কম্মকারের হাওয়া! সাপের পাঁচ পা দেখেছে হারামজাদারা—

দেবু ভবেশের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে।

দেবু : (ম্লান হেসে) হুঁ ··কাল রাতে ছিরু যখন চৌধুরী মশাইকে অমন করে অপমান করল—তখন তো কেউ ব্যাঙের লাথির কথা ভাবেননি?····নাকি, ওর টাকা আছে বলে?

দেবুর কথায় ভবেশ ও সবাই থমকে যায়।

দেবু বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করলে হঠাৎ তার চোখ পড়ে

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। মন্দিরের চাতালের পাথরে লেখা "যাবচ্চন্দ্রার্ক-মেদিনী।"

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিতের ক্লোজ-আপ।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। সেই পাথর, সঙ্গে বাজনা শোনা যায়।

কাট্ টু।

দেবু ধীরে ধীরে পাথর থেকে মুখ তুলে তাকায়।

কাট্ টু।

ভবেশ, হরিশ, মুকুন্দ ও বৃন্দাবনদের দল।

কাট্ টু।

দেবু : (স্বর বদলে) যদি বিচার কত্তে চান, নেয্য বিচার করেন! ছিরু, জগন—সবার আগে এদের ডেকে বোঝান—যারা ওপর থেকে ভাঙছে!··· নৈলে, বজ্র আঁটুনি····ফস্কা গেরো!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।

ক্যামেরা ভবেশ, হরিশদের দলটার ওপর চার্জ করে। তারা যেন সন্দিগ্ধ, বিচলিত।

কাট্ টু।

দেবু ক্যামেরা থেকে দূরে চলে যায়।

কাট্ টু।

ভবেশ, হরিশ, বৃন্দাবনরা পরস্পরের দিকে তাকায়, অবশেষে বৃন্দাবন এগিয়ে আসে।

বৃন্দাবন : পণ্ডিত শোনো!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬৫

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—রাত্রি।

সভাস্থলের ওপরে জ্বলছে আলো। ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করলে দেখা যায় মিটিং শুরু হচ্ছে। চারদিক থেকে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে।

—আবার কিসের তলব পড়ল গো, এ্যাঁ?

—আসেন আসেন ঠাকুরমশাই····

—বলি জগনকে খপর দিতে গেইছে কেউ?

দেখা যায় দেবু পণ্ডিত বৃদ্ধ চৌধুরীমশাইকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসছে।

সবাই : আরে, আসেন····আসেন····

দেবু : আমি কিন্তু আপনার ছয়ে কথা দিয়ে এসেচি,.... ছিরু কালকের ব্যাপারে—

চৌধুরী : আহা, ঠিক আছে...ঠিক আছে....

দৃশ্য—৬৬

স্থান—ছিরু পালের গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্। ছিরু দাসজীর সামনা সামনি বসে আছে। একটা হ্যারিকেন জ্বলছে সামনে। দুজনেই মদ খাচ্ছে আর একটা ডিস থেকে পেঁয়াজি তুলে নিয়ে চিবোচ্ছে।

ছিরু : বটে!

দাসজী : বাঃ! নৈলে শুদু শুদু দৌড়ে-দাবড়ে খপরটা দিতে এলাম?

ক্লোজ-আপ। ছিরু পাল।

ছিরু : শা-লা পা-তু বা-য়ে ন ...!

দাসজী : মুড়িয়ে দাও, বুঝলে,—যেখানে যত বেসুরো ঢোলের চপ্ চপানি আছে, এই বেলা সব মুড়িয়ে দাও!....কত্তারা দেখেও দেখবে না...

ছিরু : কেনে?

দাসজী : খুলে ভাখো—

এই বলে সে একটি পুরনো গয়নার বাক্স ছিরু পালের হাতে তুলে দেয়।

দাসজী : আটশো'....হাজার....যা পারো আজ রাতেই চাই—

ছিরু পাল বাক্সটি খুলে চমকে ওঠে।

ছিরু : এ কি!

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। গয়নার বাক্সে একটি পুরনো দামী গয়না।

ছিরু : (দাসজীর দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে) এ তো....

দাসজী : হেঃ হেঃ হেঃ....লক্ষ্মীর আসনে ইঁদুরের গত্ত!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬৭

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—রাত্রি।

গাঁয়ের রাখাল বুড়ো ছুটতে ছুটতে এসে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়ায়।

হরেন : বিচেস্, আই ওয়ান্ট বিচের। মাই মোস্ট ভ্যালুয়েবল্ গোঁফ হাজ বিন্ কাট্।

মুড়ো : শুনেন গো,—ডাক্তারবাবু বুল্লে,—সি আসবে না ক'!

ভবেশ : কেনে? আসবে না কেনে?

মুড়ো : বুল্লে, মজলিশে গিয়ে বল্ গা,—যদি ছিরু পালের পাছায় পঁচিশ ঘা বেঁত লাগাতে পারে—তাহলে যাবো!

ভবেশ : (হতচকিত হয়ে) আর ছিরু?

মুড়ো : সি-ও আসবে না ক'!...বেজায় জ্বর! তার মা বুল্লে, ভেতর বাড়ীতে কেঁথামুরি দিয়ে শুঁয়ে আছে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬৮

স্থান—বায়েনপাড়া—ধর্মরাজতলা।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্। চটিপরা একজোড়া পা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। আকন্দ ঝোপের কাছে দাঁড়ায়। পা জোড়ার মালিক ছিরু পাল। সে তখন বিড়ি খাচ্ছে।

একটু দূরে একদল লোকের বচসা শোনা যায়। ছিরু পাল সেদিকে তাকায়।

—পঞ্চায়েতের পাঁচজন যা বিচের করবে তুকে তা মানতে হবে।

কাট্ টু।

একটু দূরে ধর্মরাজতলায় বাউড়িরা নিজেদের পঞ্চায়েত বসিয়েছে।

ঈশান : বল্, বল্ তবে তু পতিত হবি না কেনে? তোর বুনের লেগে যে আমাদের সকলের মুখে চুণকালি পইল্লো!

পাতু : তার লেগে আমায় দুষ্ছ কেনে—

হঠাৎই পাতু বায়েন বারান্দায় ছুটে গিয়ে দুর্গার চুল ধরে টানতে আরম্ভ করে।

পাতু : হারামজাদী!....আয়!...আয় ইদিক!....আয়—

দুর্গা : ছাড়্!...এই দাদা!...ছেড়ে দে বুলছি...

পাতু : শোনো!....ভালো করে কান খুলে শোনো তুমরা! ....আজ থেকে বুনের সঙ্গে আমার কুনো সম্পক্ক নাই! আজ থেকে আমি 'পেথকান্ন।'

দুর্গা : (নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে) এঁ—পেথকান্ন! বলি, কুন বাপের জন্মে তুর অন্ন আমি খাই রে?

পাতু : কি বুল্লি?

সবাই : আহা ছাড়্ ছাড়্—

পাতুর মা : অ বাবা পাতু—

পাতু : এই তুই!…তুই শিয়ালকে ভাঙা বেড়া দেখিয়েছিস্ নিজের গতভের মেয়্যার গতর খাটানো পয়সা ভা-রী মিষ্টি, লয়?…ভা-রী মিষ্টি!

পাতুর মা : হায় আমার নেকন রে—এখন কেন্দে কি হবে—কেন্দে?

দুর্গা : এঁ্যা—! ভাত দেবার ভাতার লয়, কিল মারবার গোসাই!

পাতু : মারব এক চড়…

দুর্গা : (গর্বের সঙ্গে) বেশ কইরবে আইসবে!…যে খুশি আইসবে আমার ঘরে! তাতে কার কি? এ ঘর আমার নিজের রোজগারে গড়েছি—

দুর্গা ছুটে নিজের ঘরের বারান্দায় চলে যায়। পাতু বায়েনও ছুটে গিয়ে একটা কাটারি নিয়ে আসে।

পাতু : তবে শুনে রাখ্! ফের যদি কুনোদিন উ শালার ছিরে পাল আসে—তবে ভাগাড়ের গরুর মতো ছাল ছাড়াবো তবে আমার নাম পাতু বায়েন—

কাট্ টু।

ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ছিরু পালের চোখ প্রতিশোধের ইচ্ছায় জল্‌জল্ করে ওঠে। তাড়াতাড়ি বিড়িতে অনেকগুলো টান দেয় এবং চারদিক দেখে নেয়। পাতু বায়েনের ভাঙা কুঁড়ে ঘরের পেছন দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সেই আধ-পোড়া বিড়িটা খড়ের চালে গুঁজে দেয়।

তারপর ছুটে পালাতে শুরু করে। অন্ধকারে রাস্তায় পড়ে থাকা কতগুলো মাটির ঘড়ার সঙ্গে আচমকা ধাক্কা খায় ছিরু পালের পা। ঘড়াগুলো গড়াতে শুরু করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৬৯

স্থান—বায়েনপাড়ার ঝোপঝাড় ও সরু গলি পথ।

কয়েকটা নেড়ি কুকুর ঝোপের পাশে বসে নোংরা খাচ্ছে। ছিরু পালকে তারা দেখে।

কাট্ টু।

ছিরু পাল পালাচ্ছে।

কাট্ টু।

কুকুরগুলো তার পেছন পেছন দৌড়তে শুরু করে।

কাট্ টু।

ছিরু পাল পড়ে যায়। এক পায়ের চটি খুলে পড়ে। ছিরু পাল চটিটা কুড়োতে যাবে।

কাট্ টু।

কুকুরগুলো তাড়া করে আসে।

কাট্ টু।

ছিরু পাল চটিটা ফেলেই পালিয়ে যায়

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭০

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

পদ্ম বারান্দার এক কোণে বসে রান্না করছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সে দরজার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

মাতাল অনিরুদ্ধ উঠোনে ঢুকছে। হাতে তার একটি বোতল।

অনিরুদ্ধ : তুমি ভব বিরিঞ্চি বিষ্ণুরূপ জগৎজীব পালিনী—

কাট্ টু।

পদ্ম : (উঠে দাঁড়িয়ে) হেই মা!

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ধপাস্ করে বারান্দার এক কোণে বসে পড়ে।

পদ্ম : (কাছে গিয়ে) ফের গিলেছ?

অনিরুদ্ধ : আজ কিছু বুলিস না রে পদ্ম! (বুকে হাত রেখে) ইখানটা একেবারে—

পদ্ম : কেনে? তোমার পুলিশ কিছু কল্লে না?

অনিরুদ্ধ : হ্যাঁ, কল্লে!…একবার সাপের মুখে চুমু খেলে… একবার ব্যাঙের মুখে চুমু খেলে…আমায় বুল্লে 'উহুঁ'….উদিকে শালা ছিরেকেও ধারেধোরে বুল্লে 'হুঁ হুঁ'….

হঠাৎ পদ্ম দূরে কোন কিছুর শব্দ শুনে চমকে যায়, অন্যমনস্ক হয়।

পদ্ম : উ কি?…শুনছ!…উ কি গো?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭১

স্থান—গ্রামের স্কাইলাইন।

সময়—রাত্রি।

দূরে দেখা যায় আকাশ অব্দি লক্‌লক্ করে উঠছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭২

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

পদ্ম অনিরুদ্ধকে ঠেলে তোলে। দরজার কাছে এসে দূরে আগুন দেখতে পায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৩

স্থান—গাঁয়ের রাস্তা।

সময়—রাত্রি।

গাঁয়ের লোকেরা ছুটোছুটি করছে।

—আগুন! আগুন!!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৪

স্থান—গাঁয়ের অন্য রাস্তা।

সময়—রাত্রি।

আর একদল গাঁয়ের লোক ছোটাছুটি করছে।

—আগুন! আগুন!!

দৃশ্য—৭৫

স্থান—গাঁয়ের অন্য আরেক রাস্তা।

সময়—রাত্রি।

আর একদল গাঁয়ের লোক ছোটাছুটি করছে।

—আগুন! আগুন!!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৬

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—রাত্রি।

চণ্ডীমণ্ডপের লোকরা হঠাৎ দূরে আগুন দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং সবাই-ই ছুটতে থাকে বায়েনপাড়ার দিকে।

হরেন : লুক···ফায়ার!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৭

স্থান—গাঁয়ের স্কাই লাইন।

সময়—রাত্রি।

ক্যামেরা জুম্ করলে দেখা যায় বাউড়িপাড়ার সারা আকাশে আগুন। জ্বলছে বাউড়িপাড়া।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৮

স্থান—জগন ডাক্তারের বাড়ীর বারান্দা ও ডিসপেন্সারি।

সময়—রাত্রি।

জগন ডাক্তার ছুটে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। তাঁর চশমার কাঁচে বাউড়িপাড়ার আগুনের ঝিলিক দেখা যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৭৯

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—রাত্রি।

বাউড়িপাড়ার আগুনের মধ্য দিয়ে ক্যামেরা এগিয়ে যায়। চারিদিকে আতঙ্কের ছায়া। লোকরা সবদিকে ছুটোছুটি করে এক প্যান্ডিমোনিয়াম সৃষ্টি করেছে।

কে একজন হাঁসের খাঁচা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে প্রাণীগুলি বেরিয়ে পড়ে।

দুর্গা তাদের গরুগুলোকে নিরাপদ জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাতু বায়েন এবং অন্যান্যরা বাঁশ দিয়ে একটা আগুন-ধরা জ্বলন্ত বাঁশের কাঠামো ভাঙছে।

জগন ডাক্তার বাঁশি বাজাতে বাজাতে সেখানে হাজির হয়। চীৎকার করে বলে—

জগন : হট্ যাও—! হট্ যাও—! জল্ লাও!—জল্!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮০

স্থান—বায়েনপাড়ার বাঁশের ঝাড় ও পুকুর।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্। কাদায় ভরা একটা ডোবা। অনেকগুলো হাত। বালতি, কলসী বিভিন্ন জিনিষ দিয়ে ডোবার জল তোলা হচ্ছে।

কাট্ টু।

বাঁশ ঝাড়। একদল লোক চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ছুটে আসছে। ফ্রেম থেকে চকিতে বেরিয়ে যায়।

হরেন একটু পিছিয়ে পড়েছে। হঠাৎ সে কি দেখে যেন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

কাট্ টু।

হরেনের ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখা যায় পাতু বায়েনের বৌ জল ভরা কলসী নিয়ে ছুটে যাচ্ছে কুঁড়ে ঘরের দিকে। তার চলার তালে কোমর দুলছে।

কাট্ টু।

হরেনের কামার্ত মুখের ওপর ক্যামেরা জুম্ করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮১

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—রাত্রি।

জগন ডাক্তার তাঁর বাঁশি বাজিয়ে চীৎকার করে।

জগন : উ—ধা—র— !

সে দৌড়ে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। আগুনের শিখার ওপর ক্যামেরা কিছুক্ষণ স্থির থাকে। লোকরা চারদিকে ছুটছে।

পাতু বায়েন খালি কলসী নিয়ে ফ্রেমে ঢোকে, উল্টোদিক থেকে পাতুর বৌ জল ভরা কলসী তার হাতে তুলে দেয় এবং ছুটে আবার ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। জগন ডাক্তার আগুনে জল ঢালে।

কাট্ টু।

অন্যান্য বাউড়িরাও আগুনে জল ঢালে।

কাট্ টু।

জগন ডাক্তার সবাইকে নির্দেশ দেয়।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত একটু দূর থেকে জগন ডাক্তারের কাজ দেখে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮২

স্থান—বায়েনপাড়ার বাঁশ ঝাড় ও পুকুর।

সময়—রাত্রি।

পাতুর বৌ ছুটে খালি কলসী ভরতে পুকুরে যায়। ক্যামেরা জুম্ ফরোয়ার্ড করে দেখায় হরেন তাকে লক্ষ্য করছে।

কাট্ টু।

পাতুর বৌ জল ভরছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৩

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—রাত্রি।

জগন ডাক্তার বাঁশি বাজিয়ে চীৎকার করছে।

কাট টু।

দুর্গা আগুন থেকে একটা বাচ্চাকে উদ্ধার করে আনে।

কাট্ টু।

একটা জলন্ত কুঁড়েঘর ভেঙে পড়ে।

কাট্ টু।

লোকরা চারদিকে ছুটছে। সম্পূর্ণ দিশেহারা ভাব।

কাট্ টু।

ধর্মরাজতলার গাছে আগুন ধরেছে। দড়ি দিয়ে বাঁধা মাটির তৈরী ঘোড়াগুলো মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৪

স্থান—বায়েনপাড়ার বাঁশঝাড় ও পুকুর।

সময়—রাত্রি।

একদল বাউড়ি মেয়ে কলসী ভরে জল নিয়ে তাদের বাড়ীর দিকে ছুটে যায়। পাতুর বৌ সম্পূর্ণ ভিজে শরীরে জল নিয়ে আসছে কয়েক গজ পেছনে। একা। ক্যামেরার ফ্রেম পেরিয়ে যাবার ঠিক মুহূর্তে চকচকে আধুলি ধরা একটা হাত তার সামনে ঝুলতে থাকে।

পাতুর বৌ বিস্মিত হয়।

কাট্ টু।

হরেন আধুলিটা ধরে আছে।

কাট্ টু।

পাতুর বৌ হতচকিত।

কাট্ টু।

হরেন হাসে।

কাট্ টু।

পাতুর বৌ।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। আধুলি।

কাট্ টু।

হরেন চোখ টিপে ইঙ্গিত করে।

কাট্ টু।

পাতুর বৌ। হতচকিত ভাব কাটিয়ে সে এখন ধাঁধাঁয় পড়ে।

ব্যাক গ্রাউণ্ডে মৃদু লয়ে টাকার ঝনঝন্ শব্দ শোনা যায়, আস্তে আস্তে শব্দ বাড়তে থাকে, একসময় চারদিকের কোলাহল ছাপিয়ে ওঠে টাকার ঝনঝনানি।

হরেন ও পাতুর বৌ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন মোহিত হয়ে পড়েছে দুজনে। ক্যামেরা কোণাকুণি হয়ে ট্রলি করে দুজনের শরীরের মাঝখানটাকে দেখায়। দেখা যায় পাতুর মা আসছে। হঠাৎ সে থেমে দাঁড়িয়ে ঐ দৃশ্য দেখে। তারপর পা টিপে টিপে এসে ডাইনীর মত ফিস্ ফিস্ করে বলে

পাতুর মা: বাউন নারায়ণ !···যাঃ! যা কেনে!

সঙ্গে সঙ্গে আধুলিটা কেড়ে নেয় পাতুর মা।

দৃশ্য স্থির হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে চারদিকের কোলাহল আবার শুনতে পাওয়া যায় এবং শব্দের পীচ্ বাড়তে বাড়তে ক্লাইমেক্সে পৌঁছয়।

মিক্স ইন্টু।

দৃশ্য—৮৫

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—সকাল।

পূব আকাশের সামনে একটা পোড়া কুঁড়ে ঘরের কাঠামো।

একটা মোরগ আউট ফ্রেম থেকে এসে একটা খুঁটির ওপর বসে 'কোঁকর কোঁ কোঁকর কোঁ' করে ডাকতে শুরু করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৬

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—সকাল।

ক্যামেরা পোড়া ছাই হয়ে যাওয়া বায়েনপাড়াকে দেখায়। বাউড়ি ও বাউড়ি মেয়েরা পোড়া ছাইগাদা থেকে যা পাচ্ছে কুড়োচ্ছে। দুর্গা বারান্দা ঝাঁট দেয়। পাতুর বৌ বিলাপরত।

জগন ডাক্তার একখানা নোটবুক আর পেন্সিল হাতে সামনে হাজির হয়।

জগন : এ ঘর কার?

নারান : আজ্ঞে আথ্নার।

জগন : আথনা?

নারান : আজ্ঞে আখোহরি—

জগন : ও! রাখোহরি!....মোট ৪৩...

জগন ডাক্তার বাইরে চলে যেতেই ক্যামেরা প্যান্ করে। পাতু বায়েনকে দেখা যায় পোড়া ঢাকটা নিয়ে সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বসে আছে বারান্দায়।

পাতু ঢাকটাকে আদর করে। তার চোখে কোন বক্তব্য নেই। ধীরে ধীরে সাউণ্ডট্র্যাকে বোধনের বাজনা বেজে উঠতে থাকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৭

স্থান—দুর্গাপূজা মণ্ডপ।

সময়—দিন। আশ্বিনের শেষ।

ক্যামেরা দুর্গা মূর্তির মুখের ওপর থেকে জুম্ ব্যাক করে দেখায় পাতু বায়েন অতি উৎসাহে নেচে নেচে ঢাক বাজাচ্ছে।

এরপর কয়েকটি কাটা কাটা ক্লোজ-আপ।

(১) একটু বাঁকা ফ্রেমিং-য়ে তরোয়াল সহ দুর্গার ডান হাত।

(২) বর্শা ধরা দুর্গার হাতের ক্লোজ শট্।

(৩) দুর্গার হাতে ধনুক।

(৪) দুর্গার হাতে কুঠার।

(৫) ডানদিক থেকে দুর্গা মূর্তির ক্লোজ-আপ।

(৬) বিগ্ ক্লোজ-আপ—অসুর।

(৭) বাঁ দিক থেকে দুর্গা মূর্তির ক্লোজ শট্।

(৮) সিংহের মুখের ক্লোজ শট্।

(৯) সোজাসুজি দুর্গার মুখের বিগ্ ক্লোজ শট্।

(১০) ক্লোজ শট্—দুর্গার মুখ।

(১১) ক্লোজ শট্—দুর্গা।

(১২) ক্লোজ শট্—ঢাল হাতে দুর্গা।

(১৩) মিড শট্—লক্ষ্মী সরস্বতী সহ দুর্গা।

(১৪) মিড শট্—সম্পূর্ণ দুর্গা মূর্তি।

(১৫) মিড শট্—দুর্গা প্রতিমাকে ধরে নামানো হচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৮

স্থান—দুর্গা পূজার ভাসান।

সময়—দিন।

ঢাকের ওপর থেকে ক্যামেরা টিল্ট-আপ্ করে দেখানো হয় দুর্গা মূর্তি এবং সামনে চলছে লাঠিখেলা।

ক্যামেরা জুম্ ব্যাক্ করলে দেখা যায় দুর্গা প্রতিমাকে বাঁশের মাথায় করে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পাতু বায়েন ঢাক বাজাচ্ছে।

বিসর্জনের মিছিল চলছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৮৯

স্থান—কালী পূজা।

সময়—রাত্রি। কার্তিক মাস।

ক্যামেরা উদ্যত খড়্গ থেকে জুম্ ব্যাক করে দেখায় বলির প্রস্তুতি চলছে। পাতু বায়েন ঢাক বাজায়।

—মা....মা....জয় মা।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯০

স্থান—গাজন।

সময়—দিন, চৈত্র সংক্রান্তি।

গাজনের নাচের দৃশ্য থেকে ক্যামেরা প্যান্ করে দেখায় পাতু বায়েনও নাচতে নাচতে ঢাক বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯১

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—সকাল।

পাতু বায়েন এখনও ঢাকটা কোলে নিয়ে বসে আছে। জগন ডাক্তারের কথায় পাতুর ধ্যান ভাঙে।

জগন : (off voice) এ্যাই পাতু!....পাতু!

পাতু জগন ডাক্তার ও অন্যান্য বাউড়িদের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

জগন : শোন্, এদের বলেছি—তুইও যাবি, বুঝলি! সাহায্যের জন্য দরখাস্ত লিখছি ম্যাজেট সাহেবের কাছে,—ওব্‌লা গিয়ে টিপছাপ দিয়ে আসবি।

ইতিমধ্যে ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় দুর্গা এক ঝুড়ি ছাই-নোংরা নিয়ে ঢুকছে। পাশের নর্দমায় সেগুলো ফেলতে গিয়ে সে হঠাৎ থেমে যায়।

কাট্ টু।

ছিরু পালের পরিত্যক্ত একপাটি চটি।

কাট্ টু।

দুর্গা।

কাট্ টু।

ছিরু পালের পরিত্যক্ত চটি।

কাট্ টু।

দুর্গা চটিটা কুড়িয়ে নেয়। তার চোখে চিন্তার ছায়া।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯২

স্থান—বাঁশের ঝাড়ের পাশে গাঁয়ের পথ।

সময়—দিন।

পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিরু পাল গুটি গুটি পায়ে বাঁশ ঝাড়ের কাছে দাঁড়ায় এবং উঁকি মারে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৩

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

একদল বাউড়ি জগন ডাক্তারের বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৪

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

বিগ ক্লোজ শট্। একটি দরখাস্ত। কয়েকজন টিপছাপ লাগায়।

জগন : (off voice) ঈশেন বাউড়ি....এ্যাঃ এ্যাঃ এ্যাঃ

কাট্ টু।

মিড্ লং শটে দেখা যায় একদল বাউড়ি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

জগন : নরহরি! নরহরি দে—দে এইখানে....এ্যা এ্যাঃ... ! ভ্যাকা...ভ্যাকা আছিস নাকি রে?

হঠাৎ সে ঘরের বাইরে তাকিয়ে দুর্গাকে দেখতে পায় এবং চীৎকার করে

জগন : এ্যাই,—এ্যাই দুগ্‌গা!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৫

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

দুর্গা একটা ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে বাঁশ ঝাড়ের দিকে যাচ্ছিল। জগন ডাক্তারের গলা শুনে সে ওদিক ফেরে—

দুর্গা : কি?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৬

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

জগন : টিপছাপ দিয়ে যা!

দৃশ্য—৯৭

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি

সময়—দিন।

দুর্গা : আমার সময় নাই—

সে চলতে শুরু করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৮

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

জগন : নৈলে কিছু পাবি না বললাম—

কাট্ টু।

দৃশ্য—৯৯

স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্‌সারি

সময়—দিন।

দুর্গা কোন ভ্রুক্ষেপ না করে চলতে থাকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১০০

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

জগন : ভ্যাকা বাউড়ি—

কাট্ টু।

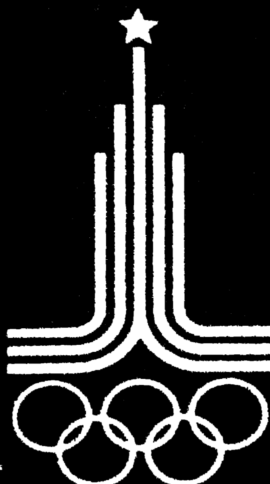
(চলবে)

АЭРОФЛОТ

Soviet airlines







МОСКВА MOSCOW

To The Olympic Games

CALCUTTA

58, Chowringhee Road
Calcutta-700 071
Tel : 449831/443765

BOMBAY

7, Stadium House
Opp. Ambassador Hotel
Veer Nariman Road
Bombay-400 020
Tel : 295750/295500

LHI

18, Barakhamba
New Delhi-1
Tel : 42843/40411/40426

Published by Asoke Chatterjee from Cine Central, Calcutta, 2 Chowrin
Road, Calcutta-13 Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRA

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

দ্বাদশ বর্ষ
নবম সংখ্যা
জুন, '৭১



চিত্রবীক্ষণ

সম্পাদক : অনিল সেন

প্রচ্ছদচিত্র : 'ডুমড্ গোলস' (বুলগেরিয়া)
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

বিষয়সূচী

চিত্রবীক্ষণে
লেখা পাঠান।
চিত্রবীক্ষণ
চলচ্চিত্র বিষয়ক যে কোন
ভালো লেখা
প্রকাশ করতে চায়।

এই বছরে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের চিত্রবীক্ষণে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল সংখ্যায় ভুল করে Vol. 13 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol. 12. অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের বদলে দ্বাদশ বর্ষ।

এছাড়া October '77 থেকে September '78 অবধি গোটা বছরের সংখ্যায় ভুল করে Vol. 12 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol. 11 অর্থাৎ দ্বাদশ বর্ষের বদলে একাদশ বর্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বছরে মাত্র তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছে অক্টোবর থেকে মার্চ একটি সংখ্যা, এপ্রিল একটি সংখ্যা এবং মে থেকে সেপ্টেম্বর আর একটি সংখ্যা।

* চিত্রবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ টাকা। লেখকের মতামত নিজস্ব, সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে।

* লেখা, টাকা ও চিঠিপত্রাদি
চিত্রবীক্ষণ, ২, চৌরঙ্গী রোড,
কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭৯১১)
এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার প্রতি কলম লাইন—৩·০০ টাকা। সর্বনিম্ন তিন লাইন আট টাকা। বাৎসরিক চুক্তিতে বিশেষ সুবিধাজনক হার। বক্স নম্বরের জন্য অতিরিক্ত ২·০০ টাকা দেয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গ্রাহক

* চাঁদার হার বার্ষিক পনেরো টাকা (সডাক), রেজিস্টার্ড ডাকে তিরিশ টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।

* বৎসরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।

* চেকে টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখার ওপর চেক পাঠাতে হবে।

* টাকা পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, কতদিনের জন্য চাঁদা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালে কুপনে ওই তথ্যগুলি অবশ্যই দেয়।

লেখক :

* লেখক নয় লেখাই আমাদের বিবেচ্য। পাণ্ডুলিপি রেখে কাগজের একদিকে লিখে নিজের নাম ও ঠিকানাসহ পাঠানো প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

সমগ্র কলকাতার একমাত্র এজেন্ট
জগদীশ সিং,
নিউজ পেপার এজেন্ট, ১, চৌরঙ্গী রোড,
কলকাতা-১৩

এই রাজ্যের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন ও বামফ্রণ্ট সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের রাজ্যে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে প্রসারিত করার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর আগে এই রাজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে এ জাতীয় উদ্যোগ-আয়োজন আমরা দেখিনি, একথা অকপটে বলা যায়। এবং এভাবে সরকারী সহযোগিতায় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন প্রত্যাশিত কার্যক্রম নিয়ে ব্যাপক জনমানসে জীবনধর্মী চলচ্চিত্রের সপক্ষে এক সহায়ক ভূমিকা পালন করতে অগ্রণী হয়ে উঠবে এ আশা প্রকাশ করা সম্ভবত অসঙ্গত হবে না।

আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই সাধ্যমত চেষ্টা করেছে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। রাজ্য চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদে ফিল্ম সোসাইটি প্রতিনিধিদের মনোনয়ন, সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার সহযোগিতায় কিউবান চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠান এবং ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন ইত্যাদি এই সহযোগিতামূলক মনোভাবেরই ফলশ্রুতি। ফিল্ম সোসাইটির ওপর তথ্যচিত্র নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া এই রাজ্যে এই সরকারই প্রথম করেছেন। সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা এর মধ্যেই একটি ছবি করেছেন, পিপলস্ সিনে সোসাইটি ও ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিকেও দুটি ছবির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এছাড়া সরকার ফিল্ম সোসাইটি সমূহের দীর্ঘদিনের দাবী অনুযায়ী কলকাতায় একটি আর্ট থিয়েটার তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাপারে ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের সভাপতি সত্যজিৎ রায়কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যে কমিটির মধ্যে ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিও আছেন।

বামফ্রন্ট সরকার ফিল্ম সোসাইটি সমূহের কেন্দ্রীয় সংগঠন ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজকে বিগত আর্থিক বছরে সাড়ে আঠারো হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দিয়েছেন। ফেডারেশন এই অনুদান নিয়ে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত এক বিশাল সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

এই সমস্ত ঘটনা এই রাজ্যের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছে। গত দু-বছরে এ রাজ্যে প্রায় কুড়িটি নতুন ফিল্ম সোসাইটি কাজ শুরু করেছে। একটি বা দুটি ছাড়া এই নতুন সোসাইটিগুলির সব কটিই মফঃস্বলে—বিভিন্ন জেলাশহর বা মহকুমা শহরে।

১৯৭১-৭২ সাল থেকে ১৯৭৭—এই পাঁচ-ছ বছরে মফঃস্বলের বেশ কিছু ফিল্ম সোসাইটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছবি পাবার এবং সাংগঠনিক সমস্যা ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা এবং রাজনৈতিক নামাবলী জড়ানো গুণ্ডাদের হামলাবাজী ও আক্রমণেও কিছু কিছু ফিল্ম সোসাইটি এই সময়ে কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। গত দু-বছরে সেই সব অঞ্চলেও সেই সব সোসাইটি আবার নতুন করে কাজকর্ম শুরু করেছে।

কাজেই এই গোটা ব্যাপারটা ক্রমশঃই একটা আশাপ্রদ চেহারা নিচ্ছে। দেশের অন্যান্য অংশের ফিল্ম সোসাইটির সাধারণ সমস্যাগুলো অবশ্য এ প্রদেশেও প্রবলভাবে বিদ্যমান। মূল্য সমস্যা ছবির। বিদেশী দূতাবাস-গুলির দাক্ষিণ্য ছাড়া ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন বা ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ ইত্যাদির মাধ্যমে ছবি পাবার কোনো বিকল্প সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি।

সাধারণ এইসব সমস্যা ছাড়াও যেটা আরো বেশী প্রকট আরো বেশী বাস্তব, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে তা হল ফিল্ম সোসাইটি কার্যক্রম কোনোভাবেই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শরিক হিসেবে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, জীবনবিরোধী পচা-গলা চলচ্চিত্রের সাংস্কৃতিক শোষণের প্রতিবাদে এবং জীবনধর্মী চলচ্চিত্রের সপক্ষে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছেনা। ব্যাপক গণ-উদ্যোগময় সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে এযাবত-কাল ফিল্ম সোসাইটি কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বযুক্তিই বৃহত্তর জনমানসে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের শারীরিক অনুপস্থিতির মূল কারণ। শুধুমাত্র বিদেশী ছবি দেখানো বা তাই নিয়ে আলাপ-আলোচনা মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি মনস্কতাকে শাণ দিতে পারে কিন্তু তা কখনোই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে আমাদের মত দেশে অবাধ সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় দাঁড় করাতে পারে না।

একমাত্র সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটাই কেন্দ্রীয় সংগঠনের সমস্ত ব্লকেড, সমস্ত হুকুমনামা চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সংগঠন, ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাপক শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে ভালো সুস্থ জীবনধর্মী ছবির ব্যাপক প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছেন সেই ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে মোটামুটি নিরবচ্ছিন্নভাবে—সমস্ত প্রতিকূলতাকে মাড়িয়ে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে। গজদন্ত মিনারের অধিবাসী ফিল্ম সোসাইটিওয়ালা সৌখীন বাবুর দল সেদিন গেল-গেল বলে প্রচণ্ড রব তুলেছিলেন। এই কার্যক্রমে ছবি সেন্সর করে নিতে হয় বলে এইসব বাবুরা ফিল্ম সোসাইটির জাত গেল বলে আওয়াজ তুলেছিলেন—বহু রথী-মহারথীর কাছে দৌড়ো-দৌড়ি করেছিলেন যাতে এজাতীয় কার্যক্রম বন্ধ করা যায়। বহু দরবার

বহু তন্বির বহু তদারকি এবং হুমকি আমরা কিছু দিন আগেও লক্ষ্য করেছি। আনন্দের কথা সেইসব গজদন্ত মিনারের অধিবাসীরাও এখন জনগণের জন্য চলচ্চিত্র, জনগণের জন্য ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন ইত্যাদির কথা বলছেন। তাঁদের চৈতন্যোদয় হয়ে থাকলে আমরা সাধুবাদ জানাবো।

আমরা এটাও অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দেখছি যা আমাদের গভীর আস্থা এবং প্রত্যয় জোগাচ্ছে তাহল পশ্চিমবাংলার ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন আগের কূপমণ্ডুকতা কাটিয়ে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সামিল হতে চাইছে। অন্তত এব্যাপারে বিক্ষিপ্ত বা ইতস্তত প্রচেষ্টা ক্রমশঃই লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে। এই প্রচেষ্টাগুলিকে সংগঠিত ও সংহত করে আগামী দিনে এক যৌথ কার্যক্রম উদ্ভাবন করা প্রয়োজন এবং এই কর্মসূচীকে গতিশীল করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে ফেডারেশনকে আর্থিক অনুদান দেয়া নয়—বিশেষ করে কলকাতার বাইরের মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে সরাসরি আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। এটা ফেডারেশনের মাধ্যমে করতে গেলে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি হবে। কেননা এরাজ্যের বেশীরভাগ ফিল্ম সোসাইটিই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত নয়। দু-তিন বছর ধরে কাজ করে চললেও বহু ফিল্ম সোসাইটি এখনো ফেডারেশনের অনুমোদন পাইনি। এই অনুদান দিতে হবে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে—সেমিনার অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পাঠাগার ইত্যাদির জন্য। এছাড়া রবীন্দ্র ভবন এবং আঞ্চলিক সরকারী প্রেক্ষাগৃহগুলিকে ছবি দেখানোর উপযোগী করে তুলতে হবে প্রোজেক্টর ইত্যাদি দিয়ে। এবং এইসব হলে ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে নামমাত্র ভাড়ায় ছবি দেখানোর সুযোগ করে দিতে হবে। এ ছাড়া এইসব হলে নিয়মিতভাবে কিভাবে সপ্তাহে দু-দিন বা তিনদিন ছবি দেখানো যায় সেই বিষয়ে স্থানীয় ফিল্ম সোসাইটি, জেলা পরিষদ বা অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং গণসংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করে সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এগোতে পারেন। এভাবে ব্যবসায়িক চিত্রগৃহ ছাড়াও একটা রিলিজ চেন তৈরী যায় যার মধ্য দিয়ে ভালো ছবির দর্শক তৈরী করার কাজ শুরু করা যেতে পারে।

এ ছাড়া রাজ্য সরকার পরীক্ষামূলকভাবে কিছু ভালো বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ছবি, শিশু চলচ্চিত্র ইত্যাদির নন কমার্শিয়াল রাইট নিয়ে একটি করে প্রিন্ট ক্রয় করতে পারেন। এই ছবিগুলি এবং সরকারী উদ্যোগে যেসব তথ্যচিত্র, শিশুচিত্র বা কাহিনীচিত্র তৈরী হচ্ছে সেগুলি নিয়ে একটি রাজ্য ফিল্ম লাইব্রেরী তৈরী করা যেতে পারে। সেই লাইব্রেরী থেকে ঐসব আঞ্চলিক প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত ছবির যোগান দেয়া সম্ভব। সরকার মোবাইল ফিল্ম ইউনিট গঠন করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে এই ছবিগুলির প্রদর্শনীর নিয়মিত আয়োজন করতে পারেন। পঞ্চায়েত বা স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণ সংগঠন এবং অন্যান্য গণসংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে স্থানীয় ফিল্ম সোসাইটিগুলিও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে।

পশ্চিমবাংলার প্রায় চল্লিশটি ফিল্ম সোসাইটির ওপর এক বিশাল দায়িত্ব এসে পড়েছে। বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একাত্ম হয়ে দেশীয় সুস্থ জীবনধর্মী শিল্প সংস্কৃতির পক্ষে কাজ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে রাজ্য সরকারকেও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে।

সংলাপের যে শব্দ ঃ বাংলা চলচ্চিত্রে

বিভাবসু দত্ত

চলচ্চিত্র জন্মের শুরুতে লুমিয়েরের স্টেশনমুখী ট্রেনের ছবি কিম্বা পোর্টারের 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি' চলচ্চিত্রের ভিতর শিল্পের যে বীজ উপ্ত ছিল, ডি. ডাব্লু গ্রীফিত, চার্লি চ্যাপলিন, আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন প্রমুখের শুশ্রূষায় সেই চলচ্চিত্র শাণিত-লাবণ্য লাভ করল। গ্রীফিতের ১৯১৫ ও ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে তোলা ছবি 'বার্থ অফ এ নেশন' ও 'ইনটলারেন্স' ছবি দুটির মধ্যেই পাওয়া গেল চলচ্চিত্র শিল্পের মূল সূত্র এবং এখান থেকেই শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু। এরই পাশাপাশি আমরা পেলাম চার্লি চ্যাপলিনের মতো একজন রসিক পরিচালক, যার হাতে পূর্ণাঙ্গভাবে জন্ম নিল কমেডি চলচ্চিত্রের একটা ধারা—যাকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন পরিচালকই অতিক্রম করতে পারেন নি। আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন্ জন্ম দিলেন 'সোভিয়েত রিয়্যালিজ্ম' নামে এক বাস্তব সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস চেতনামূলক একধারা। আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন' কিম্বা পুদোভকিনের 'মাদার' সেই চেতনারই ফসল এবং এই সব চলচ্চিত্রে সম্পাদনা এবং মন্তাজের মতো বিভিন্ন কৌশলগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্যণীয়। এদের সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাবনা চিন্তা নির্বাক চলচ্চিত্রকে ঘিরে গড়ে উঠলেও চলচ্চিত্রে শব্দের প্রয়োজনের তাগিদ এরা ভিতরে ভিতরে অনুভব করেছিলেন. তাই আইজেনস্টাইনকে জার্মান সুরকার মাইজেলকে দিয়ে 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন'-এর জন্য আবহসঙ্গীত নির্মাণ করাতে হয়েছিল এবং শব্দের ভিতর যে অমোঘ শক্তি লুকিয়ে আছে তা জার্মানীতে প্রদর্শনকালেই বোঝা গিয়েছিল। নির্বাক চলচ্চিত্রের দীর্ঘপথ পরিক্রমার শেষে আমেরিকান চলচ্চিত্র পরিচালক কোরসল্যাণ্ডের হাতেই নির্বাক চলচ্চিত্রের মুক্তি ঘটল, জন্ম নিল প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'দি জ্যাজ সিঙ্গার' (১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে)। চলচ্চিত্রের কুশীলবেরা হঠাৎ জাদুস্পর্শে কথা বলে উঠল, আবেগে গান গেয়ে উঠল। সবাক চলচ্চিত্রের জন্ম কিন্তু নির্বাক চলচ্চিত্রের আধুনিক সংস্করণ নয়, এই উত্তরণ এক ভিন্ন শিল্পমাধ্যম সূচিত করল; অবশ্য সবাক চলচ্চিত্র এক ভিন্ন মাধ্যম হলেও আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে নির্বাক চলচ্চিত্রের কাছ থেকে অনেক কিছুই পেয়েছি। সত্যজিৎ রায় তাঁর এক প্রবন্ধে এই ভিন্নতার কথা আমাদের জানিয়েছিলেন. "আমার বিশ্বাস নির্বাক ও সবাক চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ পৃথক দুই শিল্প মাধ্যম।"(১) ঋত্বিক ঘটকের, 'নিঃশব্দ ছবি' হচ্ছে একেবারে আলাদা শিল্প মাধ্যম। (২) এই বক্তব্যে সত্যজিত রায়ের সঙ্গে আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। শুধু সত্যজিত ঋত্বিক নয় পৃথিবীর যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই একথা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। রেনে ক্লেয়ার, আলফ্রেড হিচকক, ফ্রাঙ্ক কাপরা, অরসন ওয়েলস, ডেভিড লীন, ক্যারল রিড, রোসেলিনি, ডি-সিকা, ভিসকন্তি, ফেলেনি, মঙ্ক, গদার, শ্যাবরল প্রমুখের মতো প্রতিভাবান পরিচালকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মিত হয়েছে পঞ্চাশ বছরের সবাক চলচ্চিত্রের এই আধুনিক শরীর। সাতাশে বিদেশের মাটিতে সবাক চলচ্চিত্র ভূমিষ্ঠ হলেও আমাদের দেশে তার বার্তা এসে পৌঁছতে কেটে গেল আরো কয়েক বছর. বাংলা ছবির আঙিনায় প্রথম ধ্বনির পদসঞ্চারণ শুনতে পাওয়া গেল অমর চৌধুরীর 'জামাই ষষ্ঠী' চলচ্চিত্রে (১৯৩১ খৃস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল ক্রাউন সিনেমায় এই চলচ্চিত্র মুক্তি পায়)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 'জামাই ষষ্ঠী' প্রথম সবাক কাহিনী চিত্র হলেও শব্দ ভাবনা এর কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল যার ফলশ্রুতি প্রসিদ্ধ গায়িকা মৃন্ময়ী বাঈয়ের ছবির সঙ্গে তাঁর গান, কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গান, 'আলমগীর' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর অংশ বিশেষের চলচ্চিত্রায়ণ। বাংলা সবাক চলচ্চিত্র, যার প্রবর্তনা প্রথমেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর হাতে, দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর অতিক্রম করে বর্তমানে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন কিম্বা তারও পরবর্তী পার্থপ্রতিম চৌধুরী, পূর্ণেন্দু পত্রী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বিমল ভৌমিক, সৈকত ভট্টাচার্যে দাঁড়িয়ে বাংলা ছবি এক নিজস্ব শিল্প-প্রতিমা লাভ করলেও সবাক চলচ্চিত্রের আঙিনায় মাত্র দু'পা এগোতে পেরেছে।

॥ ২ ॥

বয়সের তুলনায় বাংলা চলচ্চিত্র এখনো সাবালকত্ব অর্জন করতে পারেনি, বিদেশের মাটিতে যে প্রতিনিয়ত ভাবনা-চিন্তা চলেছে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে সে রকম লক্ষ্য করা যায় নি, দু'একজন পরিচালক একক ভাবে শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন এবং এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমগ্র বাংলা চলচ্চিত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বাংলা চলচ্চিত্রে শব্দ সম্পর্কে এই ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে কিছুদিন আগে জনপ্রিয় এক সাপ্তাহিকে এক নবীন সমালোচক দর্শক এবং চলচ্চিত্র সমালোচকদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন, যেহেতু বিষয়টি বাংলা চলচ্চিত্রের শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

যুক্ত যেহেতু অভিযোগটিকে যথার্থ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে অভিযোগ জানিয়েছেন কেন দর্শকরা চলচ্চিত্রের 'আঙ্গিক-প্রাসঙ্গিক ভাবনার সব দায়িত্ব এড়িয়ে যান।' বিষয়টি যত অনায়াসে উচ্চারিত, প্রকৃত সত্যতা তত সরল নয়, অনেক গভীরে এর শিকড় নিহিত। পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ৩৮০টি (এর মধ্যে শহর কলকাতায় ৮৫টি এবং অবশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ ২৯৫টি), কিন্তু সারা কলকাতায় বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় মাত্র ১৫টি হলে এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে প্রদর্শিত চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ২০৯টি, এদের বেশীর ভাগ হলে বাংলা ছবির কোনঠাসা অবস্থা। ফলে বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ খুবই সীমিত। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে গত চার বছর তিয়াত্তর থেকে ছিয়াত্তর বাংলা চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে যথাক্রমে ৩২, ৩০, ২৫ এবং ২৮টি, সাতাত্তর এবং আটাত্তরের অবস্থা তথৈবচ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের ভিতর ভাল ছবির সংখ্যা নগণ্য—বছরে পাঁচটাও ভালো ছবি পাওয়া যায় না। 'ভালো ছবি' বলতে আমি কেবলমাত্র 'আর্ট ফিল্ম'কেই বোঝাচ্ছিনা, সেই অর্থবোধকে আরো একটু প্রসারিত করে বলা চলে—সুস্থভাবে এবং স্বস্তির সংগে যে ছবি আড়াই ঘন্টা ধরে দেখা যায়। 'ভালো ছবি'র জন্য যে দর্শক পাওয়া যায় তার এক শ্রেণী বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর মোটা দাগের বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শকদের অধিকাংশই আড়াই ঘন্টা সময় কাটাতে যান, মফঃস্বল ও গ্রাম অঞ্চলে এদের বেশীর ভাগই গৃহস্থ মহিলা, অবশিষ্টাংশ দায়বদ্ধ সমালোচক এবং গবেষক। এই সব মনোরঞ্জনপিয়াসী দর্শকদের কাছে চলচ্চিত্র সচেতনতা দাবী করা অর্থহীন. সমালোচক প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ এনেছেন। আর ভালো ছবির ক্ষেত্রে যেখানে দর্শকদের মান উঁচু সেখানে ছবির এ্যানাটমি বিচার হয়, প্রসঙ্গতঃ অলোক রঞ্জন দাসগুপ্তের 'জন-অরণ্য' প্রসঙ্গে লেখার কথা মনে পড়ছে। তাঁর লেখায় আমরা লক্ষ্য করেছি অসাধারণ শব্দ সচেতনতা, ছোট একটি দৃশ্যের শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করে তিনি যে আলোচনা করেছিলেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি শব্দ-সচেতনতা প্রমাণ করে।"………আরো আপাত চটুল মুহূর্ত মূর্ত হয়ে উঠেছে ধনদুলালী ছদ্মজননীর বৈঠকখানায়ঃ হঠাৎ টুনকো সিগারেটের কৌটো খুলতে গেলেই তার ভিতর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঠোভেনের চিৎকারের সেই সুর যাকে ভিস্‌কন্তি 'ভেনিসের মৃত্যু' (টোমাস মান) ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন।"৩ আমাদের সমালোচক শব্দ নিয়ে আলোচনা করে চলচ্চিত্র সমালোচকদের দায়ী করেছেন, প্রকৃত পক্ষে শব্দ চিন্তা প্রসঙ্গে সমালোচকদের সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বছরে যে কটা বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হয় তার নিরানব্বই শতাংশ ছবিতেই গতানুগতিক 'ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিক' ছাড়া আর কিছুই থাকে না, ফলে ঐ বিষয় অনালোচিত থাকলেও আক্ষেপের খুব বেশী কারণ দেখা যায় না, তবে ব্যতিক্রম চিত্র সমালোচকদের নিশ্চিতভাবেই বেশ কিছুটা ভাবায় এবং মননের নিকট আবেদন রাখে। সংলাপ এবং আবহসঙ্গীত ছাড়া আর কোন শব্দ চলচ্চিত্রে না থাকায় যদি সমালোচকেরা প্রতিনিয়ত 'সাউণ্ডট্রাক নীরব' বলে ধ্বনি তোলেন, তবে পরিচালকেরা বিশেষ বিচলিত হবেন বলে বোধ হয় না। সমালোচকদের কথায় পরিচালকরা যদি বিশেষ ভাবিত হতেন, তবে তীব্র সমালোচনার পরও দিনের পর দিন মোটা দাগের বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হত না। চলচ্চিত্রে শব্দ প্রয়োগে সমালোচকদের দায়িত্ব সম্পর্কে যখন কথা উঠল, তখন প্রাসঙ্গিক একটা ঘটনা যা সামান্য হলেও আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করবে তার উল্লেখ করা যেতে পারে, চিদানন্দ দাসগুপ্ত একদা তাঁর লেখায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'টকী অব্‌ টকীজ' ছবিতে গরুর গলায় ঘন্টা না বাজায় আক্ষেপ করেছিলেন এরপর বেশ কিছু বছর অতিক্রান্ত কিন্তু এখনো পরিচালকেরা চলচ্চিত্রে শব্দ সচেতনতা দেখাননি। এখন অবশ্য ছবিতে গলায় ঘন্টা বাঁধা গরু কদাচিৎ চোখে পড়ে, তার পরিবর্তে ছবিতে গাড়ী কিম্বা জুতো পরা মানুষকেও হাঁটতে দেখা যায়, কিন্তু কদাচিৎ তাদের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। ব্যতিক্রম ছবি নিয়ে আলোচনা করতে সমালোচকেরা প্রস্তুত এরকম প্রমাণ তারা দিয়েছেন। আমার বক্তব্য, অভিযোগ দর্শক এবং সমালোচকদের বিরুদ্ধে না করে সরাসরি পরিচালকদের বিরুদ্ধেই করা উচিত, কারণ একমাত্র পরিচালকরাই সচেতন দর্শক তৈরী করতে পারেন। বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার এই স্বীকারোক্তি করেছেন ঃ "ভালো ছবিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে একমাত্র ভাল দর্শক, আবার সেই ভাল দর্শক তৈরী করার ভারও আমাদেরই অর্থাৎ পরিচালকদের।"৪ ফলে চিত্র পরিচালকদের শব্দ সম্পর্কে সচেতনতার প্রথমেই প্রয়োজন এবং এই সচেতনতা আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে আধুনিকতার দ্বারে।

॥ ৩ ॥

সবাক চলচ্চিত্রের শব্দের ফিতেটাকে বিশ্লিষ্ট করলে আমরা যে উপাদানগুলি পেয়ে যাই সেগুলি যথাক্রমে ঃ সংলাপ, সঙ্গীত, দৃশ্যের পরিপূরক শব্দ এবং দ্যোতনাময় শব্দ; এরই পাশাপাশি ঋত্বিক ঘটক নৈঃশব্দকে শব্দের অন্যতম উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।৫ চলচ্চিত্রে নৈঃশব্দের যথাযথ প্রয়োগ ঘটলে তা হাজার শব্দের থেকেও বেশী বাঙ্ময় হয়ে ওঠে এরকম উদাহরণ পৃথিবীর নানা চলচ্চিত্রে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।

চলচ্চিত্রে শব্দের যে উপাদানগুলো আমরা পাই, 'সংলাপ' তারই প্রথম এবং প্রধানতম উপাদান ; একটু এগিয়ে বলা যায় সংলাপ চলচ্চিত্রের আদিমতম উপাদান। নির্বাক চলচ্চিত্রে যখন সংলাপ উচ্চারিত হত না, তখন পরিচালককে সাব-টাইটেলের আশ্রয় নিতে হত ; সবাক চলচ্চিত্রে তা লেখার গণ্ডী থেকে লোকের মুখের ভাষায় মুক্তি পেল। সংলাপ চলচ্চিত্রের দুর্বলতম মাধ্যম(৬) হলেও প্রত্যেক চলচ্চিত্রেই তার নিজস্ব একটা কাহিনী আছে, সে কাহিনী যতই 'পথের পাঁচালী'-র মতো নিটোল অথবা 'লা দলচে ভিতা'-র মতো ভাঙাচোরা হোক তা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো সংলাপ। বৃটিশ চলচ্চিত্র পরিচালক ক্যারল রীড তাঁর 'থার্ড ম্যান' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, একজন পরিচালকের কাজ হল সরল ভাবে গল্প কথন এবং তাঁর অন্যতম হাতিয়ার মাইক্রোফোন।৭ দর্শকের সঙ্গে যেহেতু প্রতিটি পরিচালক সাযুজ্যে (Communication) দায়বদ্ধ, সেহেতু সংলাপের আশ্রয় তাকে নিতেই হয়। চলচ্চিত্রে সংলাপের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনাকালে কাহিনী এবং পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ব্যক্ত করা— এই দু'রকম কাজের কথা সত্যজিৎ রায় উল্লেখ করেছেন।৮

আজকে আমরা চলচ্চিত্র বলতে যা বোঝাচ্ছি তার জন্ম নাটক থেকেই, অন্ততঃ আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র ভাবনা থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। ফলে চলচ্চিত্রের সংলাপ বিষয়ক আলোচনাকালে নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গ স্বভাবতই এসে পড়ে। আমাদের দেশের সংস্কৃত নাট্যধারা লক্ষ্য করলে দেখবো খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতকে (সময় কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিস্তর তর্কবিতর্ক আছে) শুদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে প্রথম আমরা দেখলাম সমাজের সাধারণ এবং অসামাজিক ব্যক্তি নাটকের অঙ্গনে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। অভিজাত বারবণিতা বসন্তসেনার সঙ্গে সৎব্রাহ্মণ চারু দত্তের প্রণয় কাহিনী সংস্কৃত নাটকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করল, এরই ভিতর লক্ষ্য করলাম গণঅভ্যুত্থান। সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই নাটক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, বিশেষতঃ অশিক্ষিত শ-কারের অমার্জিত মুখের ভাষা। বিদেশী নাটকের সংলাপের ভিতর যে বাস্তবতার বীজ সুপ্ত ছিল ইবসেনে এসে তার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করলাম। বাংলা নাটকের প্রাঙ্গনে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' -এর নাম যে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত, তার একমাত্র কারণ নিচু-শ্রেণীর লোকেদের বাস্তবমুখী সংলাপ যদিও কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এই সংলাপের ভ্রান্তি নির্দেশ করেছেন।৯ রবীন্দ্রনাটকে আমরা এর বিপরীত সুর শুনলাম, তাঁর প্রতিটি নাটকের সংলাপই নির্মাণ সাপেক্ষ—চরিত্রগুলির মধ্যে ভাষারীতিতে কোন প্রভেদ নেই। নাটকের চরিত্রগুলিকে আমরা কখনোই সংলাপের সাহায্যে সনাক্ত করতে পারি না ; 'রক্ত করবী' নাটকে খোদাইকারের স্ত্রী চন্দ্রাও বলে ওঠে : "বিশু বেয়াই দেখো দেখো, ওই কারা ধুম করে চলেছে। সারে সারে ময়ূরপঙ্খি, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছ? ঝলমল করছে। কী চমৎকার ঘোড়সওয়ার। বর্শার ডগায় যেন একটুকরো সূর্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেছে।" নব-নাট্য আন্দোলন আমাদের নাটকে প্রচলিত রীতিকে ভেঙে দিয়ে নতুন সুর শোনাল, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' সেই আন্দোলনেরই শ্রেষ্ঠ ফসল।

নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের এক মৌল পার্থক্য আছে ; সংলাপ নাটকের একমাত্র হাতিয়ার কিন্তু চলচ্চিত্রে সংলাপ এবং ছবি দুই মিলে এক দ্যোতনার সৃষ্টি করে, যেহেতু চলচ্চিত্রে ছবির সাহায্যে অনেক কিছু বলা সম্ভব সেহেতু সংলাপের ক্ষেত্রে পরিমিতি বোধ লক্ষ্যণীয়। কেবলমাত্র যখন ছবি দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে না, তখনই ব্যবহার করতে হয় সংলাপের। নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের এই ভেদরেখা টানতে গিয়ে প্রখ্যাত জার্মান চলচ্চিত্রতাত্ত্বিক বেলা বালাজ বলেছিলেন : "নাটক শুধু সংলাপের সমষ্টি, আর বিশেষ কিছু নয়।....কিন্তু চলচ্চিত্রে দৃশ্য ও শ্রুত সব কিছু একই স্তরে দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয়, আর পর্দায় প্রতিফলিত নর-নারীর সঙ্গে অন্যান্য বস্তু ও চিত্রের একটা সংহত মূর্তিতে ধরা দেয়।"১০ নাটক এবং চলচ্চিত্রের ভিতর একটা ভেদচিহ্ন থাকলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিচালকই ভুলে যান এই দুই শিল্পের গঠনশৈলী ভিন্ন আকৃতির, তাদের কাছে চলচ্চিত্র হলো চিত্রায়িত নাটক। ফলে নিউ থিয়েটার্সের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই নাটকীয় সংলাপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, এই সব সংলাপ গিরিশচন্দ্রের নাটকের মতো মোটা দাগের এবং সমতল ; তীক্ষ্ণতার কোন চিহ্ন এই সব চলচ্চিত্রের সংলাপে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে সত্যজিৎ রায় মন্তব্য করেছিলেন : 'বাংলা ছবিতে চটকদারি সংলাপের একটা রেওয়াজ অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। এধরণের সংলাপ ছবির চেয়ে নাটকে মানায় বেশী। নাটকে কথাই সব, ছবিতে তা নয়.... আমাদের দেশের চিত্রনাট্যকার অনেক সময়ই এই পার্থক্যটি মনে রাখেন না। বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকার মুখে যে সব কথা প্রয়োগ করা হয়, তাতে বাক্-চাতুর্য তাদের সকলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।"১১ ফলে বাস্তব থেকে বহু যোজন দূরে এই সমস্ত সংলাপের বিচরণ ভূমি। পঞ্চাশের দশকে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের মতো কয়েকজন তরুণ পরিচালকের হাতে বাংলা চলচ্চিত্র যে অন্যতর রূপ পেল, তাদের হাতেই দেখি সংলাপের বাস্তবতার রূপ, যদিও ঋত্বিকের অতি-নাটকের দিকে ঝোঁক চিরকালের। সত্যজিৎ-এর 'পথের পাঁচালি' থেকে শুরু করে 'জন অরণ্য' পর্যন্ত

যে দীর্ঘ বাইশ বছরের চলচ্চিত্র পরিক্রমা, তার কেন্দ্রবিন্দুই হলো বাস্তবতা ; সংলাপ এবং ডিটেলের দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। তাঁর প্রতিটি সংলাপই চলচ্চিত্র নামে যে স্বতন্ত্র শিল্প তার জন্য নিমিত এবং এদের চরিত্রানুযায়ী, কোন রকম অতি-নাটকীয়তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সংলাপের প্রয়োগ করেছেন। ফলে সংলাপগুলো হয়ে উঠেছে জীবন্ত, আমাদের চোখে দেখা রক্ত-মাংসের মানুষ। প্রাসঙ্গিকভাবে দু'একটা চলচ্চিত্রের সংলাপের উদাহরণ মনে করা যেতে পারে। যে গ্রাম সত্যজিৎ-এর চলচ্চিত্রের প্রিয় বিষয়, সেই গ্রামের সরল ব্রাহ্মণ এবং তার স্ত্রীর কথোপকথন এখানে উদ্ধৃত করছি ('অশনি সংকেত' চলচ্চিত্র থেকে), যার ভিতর স্ত্রীর সরল বিশ্বাস এবং স্ত্রীর কাছে স্বামীর নিজেকে জ্ঞানী প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা, এদের প্রতিটি সংলাপের ভিতর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক এবং আশ্চর্য স্নিগ্ধতা বিচরণ করছে :

"রাত। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে গঙ্গাচরণ বেশ তৃপ্তি সহকারে ভাত খাচ্ছে, অনঙ্গ পাখা হাতে তার সামনে বসে।

গঙ্গা ॥ একদিন তুমি যখন রাঁধবে না ?—আমি বসে বসে দেখব।

অনঙ্গ ॥ রান্না শেখার সখ হয়েছে বুঝি ?

গঙ্গা ॥ তোমার রান্নায় এত সোয়াদ হয় কি করে সেটা দেখব। এই পেঁপের ডালনা রেঁধেছে—এতে কী কী দিলে, কেমন করে দিলে, সেটা একটু বল দিকি।

অনঙ্গ ॥ কেন বলব ? তুমি তো অনেক কিছুই জান বাপু, এটা না হয় নাই জানলে।

গঙ্গা ॥ আর জেনেই বা কী হবে বল। চালের দাম যদি সত্যি বাড়ে তা'হলে ত এসব ভালো ভালো রান্নার কথা ভুলেই যেতে হবে।

অনঙ্গ ॥ সত্যিই বাড়বে ? তুমি যে বলছিলে বুড়ো বানিয়ে বলেছে ?

গঙ্গা ॥ যুদ্ধ যে হচ্ছে সেটা ঠিক। আর যুদ্ধ হলে তখন কী হয় সে কেউ বলতে পারে ?

অনঙ্গ ॥ কার সঙ্গে কার যুদ্ধ হচ্ছে গো!

গঙ্গা ॥ আমাদের রাজার সঙ্গে জার্মানী আর জাপানীর। মাথার উপর দিয়ে এরোপেলেন যায় দেখনি ?

অনঙ্গ ॥ হ্যাঁ! কী সুন্দর লাগে দেখতে।

গঙ্গা ॥ এই সব এরোপেলেন যায় যুদ্ধ করতে।

অনঙ্গ ॥ আচ্ছা কি করে ওড়ে বলত ?

গঙ্গা ॥ এরোপেলেন ?

অনঙ্গ ॥ হ্যাঁ—

গঙ্গা ॥ ওসব কলকব্জার ব্যাপার। (কথাটা বলে বুঝল যথেষ্ট বলা হয়নি)।

গঙ্গা ॥ আকাশে খুব হাওয়া ত, যত উপুরের দিকে যাবে তত বেশী হাওয়া। ঘুড়ি ওড়ে দেখনি ? অনঙ্গ বুঝেছে, সে মাথা নেড়ে বলে : ও!"

এরই পাশাপাশি উল্লেখ করা যেতে পারে 'সীমাবদ্ধ'—চলচ্চিত্রে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন। এদের সম্পর্ক গঙ্গাচরণ অনঙ্গের মতো মধুর হলেও কথাবার্তায় একেবারেই ভিন্ন মেরুর, নগর জীবনে উচ্চবিত্ত পরিবারে যেমন দেখা যায়। পরিচালক এর ভিতর দিয়ে তাদের সামাজিক আভিজাত্যকে মূর্ত করে তোলেন দর্শকদের সামনে :

"ড্রেসিং টেবিলে একটা চিঠি পড়ে আছে, শ্যামলেন্দু তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে, তার ছেলে রাজার চিঠি। পড়া শেষ করে সে চিঠিটা ভাঁজ করে আবার রেখে দেয়।

দোলন ॥ (off screen) চিঠিটা পড়েছো ?

শ্যামলেন্দু ॥ রাজার—

দোলন ॥ রাজার কেন ? তোমার শালীর। তোমার শালী আসছে।

শ্যামলেন্দু ॥ (o. s) কে টুটুল !

দোলন ॥ হ্যাঁ, সেই জন্যই ত আমি গেস্টরুম গুছোচ্ছিলাম—

শ্যামলেন্দু ॥ কবে আসছে ?

দোলন ॥ কাল সকালে—দিল্লী Express-এ, আটটা সাড়ে আটটার সময় আসবে।

শ্যামলেন্দু ॥ কাল সকালে!

দোলন ॥ বেচারা! ওর কোন দোষ নেই জানো। দেখনা। 1st চিঠি পোস্ট করেছে আজ 5th এসে পৌঁছুলো—কাল তো আবার শনিবার। তোমার অফিস যেতে হবে না তো।

শ্যামলেন্দু ॥ হ্যাঁ—একবার ঢুঁ মারতে হবে।

দোলন ॥ কি যে ভালো লাগছে—সেই কবে এসেছিল ও। সেই '63-তে আমাদের এই flat-টা তো দেখেইনি।"

সত্যজিৎ-এর চলচ্চিত্রকীর্তি পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যাবে নানাশ্রেণীর অসংখ্য চরিত্রের বাস এই অঙ্গনে এবং এখানেই তাঁর কৃতিত্ব প্রতিটি চরিত্রকেই সংলাপ এবং আচরণের সাহায্যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সূত্রে একটা ছোট চরিত্রের উদাহরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'নায়ক' চলচ্চিত্রে আমরা এক রিটায়ার্ড রক্ষণশীল মনোভাবের বৃদ্ধ ভদ্রলোকের

(অঘোর চাটুজ্যে) সাক্ষাৎ পাই যিনি সিনেমা দেখার ঘোর বিরোধী এবং সমাজের অন্যায় দেখে 'স্টেটস্‌ম্যান'-পত্রিকায় চিঠি লেখেন চলচ্চিত্রের নায়ক অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঐ চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে :

"উপেন (কনডাকটর গার্ড) আজ্ঞে ইনিই হচ্ছেন মিস্টার মুখার্জী।

অঘোর ॥ অ। আপনি বায়স্কোপে অভিনয় করেন ?

অরিন্দম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

অঘোর ॥ অ। আমি বায়স্কোপ দেখিনা On principle. একবার এক কলীগের পাল্লায় পড়ে গেছিলাম—In 1942—How Green was My valley.

অরিন্দম ॥ সে ত ভাল ছবি।

অঘোর ॥ But as a rule films are bad.

অরিন্দম ॥ কিন্তু ফিল্ম এ্যাক্টর কী দোষ করল দাদু ?

অঘোর ॥ আপনি মদ্যপান করেন ?

অরিন্দম ॥ তা একটু করি—

অঘোর ॥ All flim actors drink as a rule. It shousalack of restraint, and a lack of discipline. আপনি কি জানির মধ্যে মদ্যপান করবেন।

অরিন্দম ॥ সেকেণ্ড নেচার দাদু, বোঝেনই তো।

অঘোর ॥ তাহলে আপনাকে আমার জানানো কর্তব্য—অ্যালকহলের গন্ধে আমার nausea হয় and I am seventy one. As such I expect some consideration from my fellow passenger."

বাংলা চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের সংলাপ লক্ষ্যনীয়। তাঁর চলচ্চিত্রের বারো আনা অংশ জুড়ে আছে পূর্ববাংলা (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত জনগণ এবং এদের ব্যবহৃত সংলাপের মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ বিদ্যমান, প্রতিটি চরিত্রই স্বাভাবিক সংলাপ উচ্চারণ করেন। 'মেঘে ঢাকা তারা'-র প্রথম দৃশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

"ভোর বেলা। কলোনীর মুদির দোকান। মুদি হঠাৎ যেন কাকে দেখে ডেকে বলে : দিদি ঠাইরেণ, ও দিদি ঠাইরেণ।

মেয়েটি (নীতা) মুদির দোকানের দিকে এগিয়ে আসে।

মুদি ॥ আর তো সয়না। তোমার বাপরে গিয়া কইও এই মাসকাবারে তিন মাস হইলো।

নীতা ॥ কমুওনে।"

আবার যিনি শিক্ষিত বাঙাল, পেশায় শিক্ষক—তার সংলাপ নিশ্চয় মুদির সংলাপের সঙ্গে সমান্তরাল হওয়া সম্ভবপর নয়, ঋত্বিক সংলাপের এই ভেদ চিহ্নটা স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করে তোলেন দর্শকদের সামনে :

"স্বামী ॥ কলো মাইয়া, What does it mean? বর্ণের pigment টা একটু dark এই তো………

স্ত্রী ॥ আর প্যাচাল পাইড়ো না। স্কুলে যাও।

স্বামী ॥ আমার Point হইল গিয়া ফট কইরা যদি সে আইসা পড়ে টিউশান সাইরা তো কর্ণে শুনলে ব্যথা পাইব। কী রকম responsible এম এ ক্লাস কইরা দুই দুইটা tution সাইরা মাসন্তে সে forty rupees earn করে উপরন্তু—

স্ত্রী ॥ তবু বক্‌বক্‌ করে—

স্বামী ॥ না—মানে খবর তো রাখনা—কাল কমিটি মিটিং-এ শুনলাম আবার নাকি উচ্ছেদের হিড়িক বেড়েছে। ইস্কুলের grant তো বন্ধ হবার মতলব। দেখ কাণ্ড........।"

তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'-তে আমরা বঙ্গবাজার মতো বাংলাদেশ থেকে সদ্য আগত চরিত্র পাই, যার সংলাপে চরিত্রের অনেক গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করা সম্ভব, এখানেই পরিচালকের বাস্তবতা বোধ। চার্লি চ্যাপলিন তাঁর 'লাইম লাইট' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সনাক্ত করে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র সংলাপের সাহায্যে এবং এটাই মহৎ পরিচালকের লক্ষণ, কিন্তু আমাদের দেশের পরিচালকদের ছবিতে কদাচিৎ এই সমাজ সচেতনতা চোখে পড়ে।

'সাবজেকটিভ এক্সপ্রেশন' চলচ্চিত্রের এক প্রধান অসুবিধা,১২ এবং চলচ্চিত্রে তা প্রকাশ করতে পরিচালকরা ঈষৎ অস্বস্তিবোধ করেন, তখন তাদের সাহায্য নিতে হয় আত্মকথন কিম্বা 'সাব টাইটেলে'র। যে আত্মকথনের সাহায্য তাঁরা নেন, তার ভাষা কাব্যিক হতে বাধ্য। আমাদের চলচ্চিত্রে এই আত্মকথন প্রায়ই শোনা যায়, তাদের বেশীর ভাগই অতি-নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত হাস্যকর ; কিন্তু দু'একটা বাংলা চলচ্চিত্র পাওয়া যাবে যেখানে আত্মকথন দর্শকদের চোখের সামনে একটা ছবি মূর্ত করে তোলে ঋত্বিক ঘটক থেকেই আমরা খুঁজে নেব সমর্থনের উপাদান :

'উমার ঘর। রাত্রি বেলা। রামু ॥ কি ভাবছিলে ?

উমা ॥ (মৃদু হেসে) ভাবনার কি অন্ত আছে ?

রামু ॥ হুঁ (বাইরের দিকে চোখ করে) আমিও ভাবছিলাম।

উমা ॥ কি ?

রামু ॥ ভাবছিলাম ধূধূ একটা মাঠ সামনে অশ্বত্থ গাছের ঠাণ্ডা ছায়া....পায়ে চলার পথটা উধাও হয়ে গিয়েছে। মাঠের শেষে লাল টালির বাড়ী।

আমার ক্যালেণ্ডারের মতন........" ('নাগরিক' চলচ্চিত্র)

সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষায় যুব সমাজ নিয়ে ছবি করার রেওয়াজ চালু হয়েছে, 'আপনজন', 'রাজা', 'আঠাত্তর দিন পরে', 'এপার ওপার' প্রভৃতির মতো চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে যুবকদের সমস্যা এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, এদের চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এরা প্রত্যেকেই সমাজের অন্ধকার দিকের বাসিন্দা, চলতি বাংলায় যাকে 'মস্তান' বলা হয়। এ'প্রবন্ধ যেহেতু সমাজ বিজ্ঞান ও বিষয়বস্তুর বাস্তবতার মূল্যায়ণ নয়, তাই আমরা শুধুমাত্র সংলাপের দিকে দৃষ্টি দেব—অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে যেটুকু সমাজ বিজ্ঞান এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাকে স্বীকার করে নিয়ে। যুবসমাজ নিয়ে যে সমস্ত ছবি আমরা পেয়েছি, একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের মুখের সংলাপগুলো মামুলি ধরণের কৃত্রিম। 'শালা'—ইত্যাদির মতো দু'একটা প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার করে যুবক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সংলাপকে বাস্তবসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হলে শিকড় আরো গভীরে চালিয়ে দিতে হবে। এই সব যুবকদের নিজস্ব কিছু ভাষা আছে যাকে 'কোড টার্ম' বলা হয়, এই সমস্ত শব্দ তাদের সংলাপে ব্যবহার করার প্রয়োজন। সমাজে আর এক শ্রেণীর যুবক আছে যাদের বাস অন্ধকার জগতে নয়, তাদের সংলাপ বিষয়েও ভাবার প্রয়োজন। এই সমস্ত যুবকদের সংলাপ সামাজিক এবং পারিবারিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, ফলে সংলাপের ক্ষেত্রে একজনের থেকে অন্যজনের পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। সত্যজিৎ রায় তার 'জন অরণ্য' ছবিতে সোমনাথ ও সুকুমার চরিত্রের ভিতর এই পার্থক্য তুলে ধরেছেন। আমরা যদি মনোযোগ দিয়ে এই দুই চরিত্রের সংলাপ লক্ষ্য করি তবে দেখব সুকুমার কিছুটা অমার্জিত এবং কর্কশ, তুলনায় সোমনাথ ভদ্র এবং মিষ্টভাষী। এর পিছনে কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব মানসিক গঠন ছাড়াও পারিবারিক প্রভাব বিস্তার করে। সোমনাথের বাবা যেখানে মার্জিত, মিষ্টভাষী সুকুমারের বাবা সেখানে কর্কশ এবং অমার্জিত,১৩ তাই সুকুমার বোনকে : "কিরে ক্যাবারে দেখানো হচ্ছে ?-র মতো কর্কশ সংলাপ অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে। ফলে সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে এ'বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চলচ্চিত্রে সংলাপ রচনার পূর্বে পরিচালককে খুব ভাল করে চরিত্রগুলিকে দেখে নেওয়ার প্রয়োজন যে তারা কোন্ শ্রেণীর এবং কোন্ অঞ্চলের। শ্রেণী ভেদে যেমন ভাষায় পরিবর্তন ঘটে, তেমনই অঞ্চল ভেদেও ভাষার পরিবর্তন ঘটে। পশ্চিম বঙ্গে (হুগলী অঞ্চলে) যেখানে চাকর, বাড়ী, চাক, ধান—বলি সেখানে পূর্ববঙ্গের লোকেরা (বরিশাল) উচ্চারণ করে চাহর, বারী, ডাক, দা'ন। ১৪ আবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষারীতি ও উচ্চারণরীতি বিভিন্ন রকমের। আমরা যেখানে (কলকাতার লোকেরা) খোন, বোন, জোম, উচ্চারণ করি মেদিনীপুরের লোকেরা সেখানে খন, বন, মন, জন উচ্চারণ করে। তাদের উচ্চারণরীতিতে দেখি নোটিশের জায়গায় লোটিস, লুটিশ; বিয়ে কিম্বা বে-র স্থানে উচ্চারিত হয় বিয়া কিম্বা ব্যা; 'সেয়ানা' মেদনীপুরে সিয়ানা, সিয়ান উচ্চারিত হয়। ১৫ উচ্চারণ রীতি বিষয়ক আলোচনা কালে আমাদের উচ্চারণের টানের উপর দৃষ্টি দেওয়া একান্তভাবেই প্রয়োজন, যেমন মেদনীপুর অঞ্চলে 'বটে' কিম্বা বীরভূম অঞ্চলে 'ক্যানে'র ব্যবহার লক্ষ্য করি। আবার লুম, লেম ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। সত্যজিৎ রায় তার 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গ্রামের মেয়ের কথার ভিতর 'লুম' অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন, বিনি (গ্রামের মেয়ে) সর্বজয়াকে এক ঝুড়ি সবজী এনে বলেছে : "মা এগুলো পাঠিয়ে দিলেন। এই খেনে রাখলুম।" এটা কি পরিচালকের অসঙ্গতি নয়? কলকাতারও এক নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ঠ্য আছে যা বর্তমানে লুপ্ত হলেও চলচ্চিত্রের চরিত্রের প্রয়োজনে এই ভাষারীতি প্রয়োগ করা দরকার, যেমন উচ্চারণের শব্দের মধ্যে বা শেষে অবস্থিত মহাপ্রাণবর্ণগুলি অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারণ করার প্রবণতাঃ মুখ-মুক্, দেখতে-দেক্‌তে, রথযাত্রা-রতযাত্রা, মাথা-মাতা ইত্যাদি ; আবার 'পরিষ্কার' কে উচ্চারণ করা হয় পাস্কের, পোশ্‌কের, খরিদ্দারকে খদ্দের। প্রমথ চৌধুরী যাকে বলেছেন উচ্চারণের ঠোঁটকাটা ভাব'—সে রকম উচ্চারণও এই ভাষায় দেখা যায় : আঁব, বে ক্যাণ্ডালী ইত্যাদি। ১৬ 'বাবু মশাই'-এর মতো পুরোন কলকাতাকে নিয়েও ছবি বাংলা ভাষায় নির্মিত হয় কিন্তু ভাষারীতির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখবো সেখানে প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন নেই—চরিত্রগুলির আচার ব্যবহারের সঙ্গে ভাষাও আধুনিক। এরই পাশাপাশি আছে মিশ্র ভাষা, যেমন বর্তমান কলকাতায় হিন্দি, উর্দু ও বাংলা সব মিলে এক জগাখিচুড়ি হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। ১৭ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় বসবাসের ফলে যে মিশ্রভাষা সৃষ্টি হয় সত্যজিৎ রায় তার 'জন অরণ্য' ছবিতে বিশুদার মুখে তার যথার্থ ব্যবহার দেখিয়েছেন। উচ্চারণরীতির সঙ্গে সঙ্গে আবার অঞ্চলভেদে শব্দরীতিতেও পার্থক্য দেখা যায়, যদি কলকাতার কোন বৃদ্ধা তার পুত্র বধূকে বলেন : "বৌমা, ঘোমটা দাও," বীরভূমের কোন বৃদ্ধা সেই কথাকেই বলবেন : "বৌমা, শান কাড়া।" এরকম পার্থক্যের দিকে পরিচালককে সদাসতর্ক থেকে সংলাপ রচনা করতে হবে।

চলচ্চিত্রের নিজস্ব শিল্প সর্ত অনুসরণের পাশাপাশি সংলাপ

রচনার ক্ষেত্রে পরিচালকদের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠলে ভবিষ্যতে বাংলা চলচ্চিত্রের সংলাপ মর্যাদার আসন অধিকার করে নেবে।

১। চলচ্চিত্র চিন্তা ঃ সত্যজিৎ রায়।
২। ছবিতে শব্দ ঃ ঋত্বিক কুমার ঘটক।
৩। স্বরিত অঙ্গীকার ঃ অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত।
৪। ভবিষ্যতের সেই দিনগুলির জন্য ঃ তরুণ মজুমদার।
৫। ছবিতে শব্দ ঃ ঋত্বিক কুমার ঘটক।
৬। সত্যজিৎ রায় তাঁর রঙীন ছবি শীর্ষক প্রবন্ধে এরকম কথাই বলেছিলেন ঃ "চিত্রপরিচালকদের হাতে তথা পরিবেশনের যত রকম উপায় আছে, তার মধ্যে দুর্বলতম হল কথা (বিষয় চলচ্চিত্র/পৃ ঃ ৭৫)।

"A Film director's job is quite simply to tell a story. For this he must use actors, and places, and cameras and microphones. But first and foremost he is story teller, like a novelist or a dramatist" 'The third Man: Carot Reed talks to Roger Menvell. গ্রন্থ: The cinema 1952, Edited by Roger Menvell.

৮। চলচ্চিত্রে সংলাপের প্রধানত দুটি কাজ। এক, কাহিনীকে ব্যক্ত করা, দুই পাত্র-পাত্রীর চরিত্র প্রকাশ করা। সাহিত্যের কাহিনীতে কথা যে কাজ করে, চলচ্চিত্রে ছবি ও কথা মিলিয়ে সে কাজ হয়।" চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে (বিষয় চলচ্চিত্র/পৃঃ ৩০)।
৯। প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 'নীলদর্পন' গ্রন্থের 'সংলাপে ব্যবহৃত ভাষার ত্রুটী ২ শীর্ষক রচনায়-এ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে/পৃঃ ১৪৯—১৫১।
১০। Bela Belars: 'theory of Film' গ্রন্থের 'The seript' পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য।
১১। চলচ্চিত্রে সংলাপ প্রসঙ্গে। গ্রন্থ ঃ বিষয় চলচ্চিত্র/পৃঃ ৩০।
১২। চিদানন্দ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন ঃ "সাবজেকটিভ এক্সপ্রেশন' চলচ্চিত্রের সব চেয়ে বড় সমস্যা।" চলচ্চিত্রের শিল্প প্রকৃতি।
১৩। সোমানাথ ঃ একী আপনার কাপড়—
সুকুমার ঃ আবার পড়লে নাকি!
সুকুমারের বাবা ঃ ঃ রাস্তা খুঁড়ে রেখেছে বাঞ্চৎরা আজ একমাস ধরে—"সুকুমারের বাবার এই সংলাপ লক্ষ্যনীয়। তাই আমরা দেখি সুকুমারেরও বাবা সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধা নেই ঃ চ, বাইরে চ', ফিরে এসেই আবার sympathy টানার চেষ্টা করবে।
১৪। ভাষার ইতিবৃত্ত ॥ সুকুমার সেন। পৃঃ ৪—৫।
১৫। বাগর্থ ॥ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য। পৃঃ ৮৯—৯০।
১৬। কলকাতার ভাষা ॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
১৭। তদেব।

মনটাজের স্রষ্টা লিয়েভ্ কুলেশভ্

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৬২ সালে পারীতে UNESCO-র আমন্ত্রণে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন Lev Kuleshov। তখন তিনি এক বয়স্ক শিক্ষক। রুশিয়ার State Institute of Cinematographyতে শিক্ষকতা করেন, ছবি আর করেন না। চলচ্চিত্রের জগতে, এখনকার মতোই, তখনই তাঁর আকাশ জোড়া নাম।

প্রশ্ন করলেন সমবেত সাংবাদিকরা—সত্যি সত্যি Montageটা কার সৃষ্টি?—Larry Griffith-এর না আপনার? মৃদু হাসলেন Kuleshov। বললেন, "historically, 'Birth of Nation' ও 'Intolerance'-এই প্রথম montage এর শুরু। কিন্তু, ওই ছবিগুলোতে সেই প্রয়োগ করেছেন Larry নিতান্তই অজান্তে। অর্থাৎ, ভেবেচিন্তে বা পরিকল্পনা কিংবা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোন কিছুর প্রয়োগ তিনি করেননি। নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা হিসেবেই ইতিহাসে ওঁর স্থান রয়েছে। কিন্তু montage এর প্রথম theoryর প্রবর্তন করি আমিই—১৯১৭ সালে, Tsar এর আমলে প্রায় তৈরী 'The Project of Engineer Prite' ছবিটিতে।" Kuleshov, montageএর অসাধারণ cinematic ভাষা ও শক্তি প্রত্যক্ষ করেন ছবিটির নানা অঙ্গের Shooting এর সময়। এক জায়গায় নায়কের দৃষ্টির Shooting করে, অন্য এক পৃথক স্থানে তার objectটি চিত্রায়ণ করেন। Cinematic action, time ও place এক নতুন ভাবে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। একে নাম দেন Kuleshov, Cinematic reality! এটাই পরে Kuleshov Effect নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

১৭ বছর বয়সেই চলচ্চিত্রের অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহী হয়ে, গা ঢেলে তাঁর অসাধারণ গবেষণা চালিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন ছবি তৈরী করতে পারেন নি, তখনই ছিল তাঁর সুবর্ণ সুযোগ। কাটতে বসতেন পুরানো ছবিগুলোকে আবার নতুন করে—নতুন রূপে। অভিনেতা Mosjoukin কে কখনও বসাতেন dining table এর ধারে, কখনও grave yardএ আবার কখনও বা drawing roomএর hearth এর পাশে রাখা আরাম কেদারায়। Montageএর বিচিত্র সৌন্দর্য্য, তাঁর কাছে আরও নানারূপে প্রতিভাত হতে লাগল।

Kuleshov এর আর একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি সেই Cinema Woman, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া বহু মূল্যবান সামগ্রীর সঙ্গেই, বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর Cinema Woman এর সত্যিকারের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। একজন মহিলার মুখ, হাত, পা, অন্য আর একজনের চুল, আঙুল, মোজা, চুলবাঁধা ও কাপড় পরার সঙ্গে এমন অনুপম ছন্দে ও শৃঙ্খলায় তিনি সম্পাদনা করে montage সৃষ্টি করেছিলেন যে, বোঝারই উপায় ছিল না, সেটা বিভিন্ন মহিলার বিভিন্ন অঙ্গের ছবির সমষ্টি—একজনের নয়। ছবিতে পুরো ছবিটা, একটি মহিলার চিত্রায়ণ রূপেই প্রকাশিত হয়েছিল। এখানেই তাঁর montage এর চমৎকারিত্ব!

সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ হলেও, Kuleshov মানুষ হিসাবে কত বড় ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর montage সম্বন্ধে তিনটি মন্তব্যের প্রথমটি থেকেই। তিনি বলেছেন, "আমার montage theory রচনার পেছনে অনুপ্রেরণার কাজ করেছে David Wark Griffith-এর ছবি। তাঁর Close up ও parallel action এর dimension ও juxtaposition পর্য্যবেক্ষণ করেই, আমার montage সৃষ্টি অনেকাংশে সফল হয়েছে।" এরপর আর যাঁরা দু'জন তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, তাঁরা দু'জনেই হলেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক। একজন লিও টলস্টয় আর অন্যজন হলেন কবি পুশকিন্। টলস্টয়, চলচ্চিত্রে montage সৃষ্টির বহু আগেই, সাহিত্যে montage-এর প্রয়োগ করে, এর কথা বলে গেছেন। আর পুশকিনের কবিতায় montage-এর প্রয়োগ কি অসাধারণ রূপে প্রকাশ পেয়েছে, তা যে কোন চলচ্চিত্রে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

এই বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র গবেষকের সম্বন্ধে, যাঁর হাতে নয়া রাশিয়ার অন্ততঃ পঞ্চাশ শতাংশ পরিচালক শিক্ষিত হয়েছেন, তাঁরই অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র Pudovkin বলেন, যখন তাঁকে France এর Sorborne Universityর এক সভায় Chairman—montage-এর জনকরূপে পরিচয় করিয়ে দেন, "না, আমি নই—montage-এর প্রকৃত জনক আমার ও Sergei Eisenstein-এর গুরু শ্রদ্ধেয় Lev Kuleshov।"

প্রায় ১৩টি ছবি ও বহু মননশীল চলচ্চিত্র গবেষণার জনক Lev Kuleshovকে, আজ চলচ্চিত্রের এই বেসাতির যুগে, বড় বেশী করে মনে পড়ে।

চলচ্চিত্র দর্শক এবং সমালোচক

অরুণকুমার রায়

চলচ্চিত্রের বয়স যত বাড়ছে, চলচ্চিত্র যত জনপ্রিয় হচ্ছে, তেমন পরিমাণে কি চলচ্চিত্র-বোদ্ধা দর্শকের সংখ্যা বাড়ছে এ প্রশ্ন অনেকেরই। চলচ্চিত্র আর দর্শক, মাঝখানে রয়েছে সমালোচক। পরিচালক নিজের আনন্দে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে থালাস। কিন্তু তা কি ভাবে কত পরিমাণে শিল্পসম্মত, তার রসাস্বাদন কিভাবে করা যাবে, তার কলাকৌশল সমালোচক দর্শকদের জানিয়ে দেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী দর্শকদের মধ্যে কি ঐক্যের সেতু বাঁধা সম্ভব নয়? পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার মতই চলচ্চিত্রও কি তার নিজস্ব সীমাবদ্ধ গণ্ডী মেনে নেবে ইত্যাদি প্রশ্ন অনেক-দিনই চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে সদুত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। চলচ্চিত্রের শিল্পমাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশকে স্বীকার করে নিলে প্রশ্ন এসে যায় দর্শকরা কি এখন চলচ্চিত্র দেখার সময়ে শিল্পমাধ্যমের সত্তাকে গুরুত্ব দেন না অন্য কিছু?—এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের অনেকগুলি স্তরের মানুষ এবং তাঁদের চিন্তা ও কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এঁরা হলেন সমালোচক, দর্শক, চলচ্চিত্র পরিচালক ইত্যাদি।

প্রথমে আসা যাক সমালোচকের কথায়। সমালোচক এসেছেন চলচ্চিত্রের জন্মের পরে। সমালোচককে বলা যেতে পারে বোদ্ধা দর্শক। দর্শকের নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগাকে প্রকাশ করার চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমালোচনা নামক ইচ্ছা। ভালো লাগা বা মন্দ লাগাকে খেয়াল খুশি মত প্রকাশ করলেই হলো না। অথচ আমরা তাই করে থাকি। দর্শকের অধিকাংশই কয়েকটি বাঁধাধরা কথার মধ্য দিয়ে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করেন। যেমন—বোর ছবি, সো-সো, খুব ভাল নয়, গতানুগতিক ইত্যাদি। মত প্রকাশেরও কতকগুলি রীতিনীতি আছে যার সঙ্গে চলচ্চিত্রের এস্থেটিক্সের প্রশ্ন জড়িত। সমালোচকের দায়িত্ব সম্বন্ধে সুন্দর কথা বলেছেন সত্যজিৎ রায়—"সমালোচক কাজের মত কাজ করেন তখনই যখন তিনি পরিচালক ও দর্শকের মাঝখানে একটি সেতু স্থাপন করতে সক্ষম হন।" এই সেতু বাঁধতে গেলে প্রথমেই সমালোচককে কতগুলি গুণের অধিকারী হতে হয়। চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে আগাগোড়া বোঝার ব্যাপার আছে। চলচ্চিত্রের টেকনোলজির খুঁটিনাটি দিকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব (Aesthatic) তাঁর আয়ত্তে থাকা প্রয়োজন। চলচ্চিত্র শিল্প যৌথভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের সংযুক্তির দ্বারা আর এক নতুন রস পরিবেশন করে। সেই জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণের মতই ধাপে ধাপে চলচ্চিত্রের বিচার পদ্ধতি হওয়া উচিত। চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, সম্পাদনা, অভিনয় প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে চলচ্চিত্র সমালোচনা সহজসাধ্য হয় না। যদিও আজকালকার অনেক সমালোচকই সমস্ত দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন না। চিত্রনাট্য পরিচালকের বক্তব্য যথার্থভাবে প্রকাশ করছে কিনা তার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার এবং কোনো অংশে চিত্রনাট্য বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা কিংবা কোন চরিত্র চিত্রনাট্যে সমান মনোযোগ পায়নি ইত্যাদিও দেখা প্রয়োজন। যেহেতু চলচ্চিত্রের সকল চরিত্র চলচ্চিত্রের মধ্যেই জন্মায় এবং মরে তাই সমস্ত চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বা পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন এবং চরিত্রের পরিণতি, স্থান, কাল, ঘটনাকালের বিস্তার ইত্যাদি দেখাও সমালোচকের কর্তব্য। সঙ্গীত সম্বন্ধে পারদর্শী হওয়া সমালোচকের বিশেষ গুণ। নির্বাক যুগে আবহসঙ্গীত অনেক সাহায্য করেছে। সবাক যুগে কথা এসে সঙ্গীতের দায়িত্ব কিছুটা লাঘব করেছে, তবু সঙ্গীত পরিবেশ, আবহাওয়া, সময় (Period), মানসিক অবস্থা যেমনভাবে প্রকাশ করে তা কি অন্য মাধ্যমের দ্বারা ভাবা যায়? আমাদের সকলের দেখা দুর্গার মৃত্যুর খবর যেভাবে হৃদয়ে ঝংকার তোলে তা সঙ্গীতের যথাযোগ্য ব্যবহারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চিত্রনাট্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের নিবিড় অনুধাবন সমালোচকের কর্তব্য। চলচ্চিত্র চিত্রনাট্যের সঙ্গে প্রায় সম্পৃক্ত আর একটি দিক হলো সম্পাদনা। সম্পাদনার ফলে চিত্রনাট্যের দাবি যথার্থ মিটেছে কিনা কিংবা সম্পাদনা কোথায় যথার্থ হয়নি যার ফলে কোন ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘায়িত মনে হয়েছে কিংবা কোন ঘটনার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি ফেরানোর দায়িত্ব সমালোচকের। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, পরিচালক চিত্রনাট্যের চাহিদা অনুযায়ী, চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা, অভিনেত্রী ঠিক করেন। তাঁদের নির্বাচন চলচ্চিত্রের পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে কিনা কিংবা তাঁরা পরিচালকের দাবি ঠিকভাবে মেটাতে পেরেছেন কিনা দেখা সমালোচকের কর্তব্য। এছাড়া চলচ্চিত্র অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অভিনয়ের ধরন, বাচনভঙ্গী, প্রকাশ কৌশল, রূপসজ্জা, মেক-আপ, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা সমালোচকের দায়িত্ব।

সমালোচকের উচিত কখনই গল্পটি পুরোপুরি না বলা। চিন্তাশীল এবং সত্যকার শিল্প সমালোচক শিল্পকর্মটি ভেঙে ভেঙে অতীত এবং বর্তমানের পটভূমিকায় এর বিচার ও মূল্যায়ন করেন। মতামত প্রকাশের বেলায় ব্যক্তিগত মতামত না পরিবেশন করাই ভালো। সমালোচক শুধুমাত্র ইঙ্গিত দিয়ে, পরিচালকের স্টাইল কৌশল এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দর্শকদের সচেতন করবেন। অর্থাৎ সমালোচকের কাঁধে দর্শকদের খোঁজ খবর দেওয়ার দায়িত্ব চাপছে।

বিভিন্ন সমালোচকের মধ্যে পার্থক্য হয় স্টাইলে। অর্থাৎ কেমনভাবে প্রকাশ করছেন তার উপর। ভাষা, কৌতুকপ্রিয়তা, প্রকাশের স্বচ্ছতা, যুক্তি নির্ভরতা—এইগুলি মিলেই সমালোচকের লেখার স্টাইল গড়ে ওঠে। অন্যান্য সমালোচনার মত চলচ্চিত্র সমালোচনায়ও "কি ভাবে বক্তব্য বলা হচ্ছে" তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ "কি বলা হচ্ছে।" অন্যান্য মাধ্যম যেমন মুদ্রিত বই বার বার পড়া যায়, ছবি বার বার দেখা যায় কিন্তু চলচ্চিত্র গতির উপর নির্ভরশীল একটা দেখতে না দেখতে আর একটা এসে পড়ে সেইজন্য কোন চলচ্চিত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতে গেলে বেশ কয়েকবার সেই চলচ্চিত্র দেখার প্রয়োজন আছে।

প্রত্যেক চলচ্চিত্রের নিজস্ব বক্তব্য আছে। ছবির প্রতিটি ফ্রেমের জন্য পরিচালককে চিন্তা করতে হয়, কোথায় ক্যামেরা থাকবে, কিভাবে থাকবে, অভিনেতারা কিভাবে তাঁদের অভিনয় ফুটিয়ে তুলবেন ইত্যাদিও পরিচালকের নির্দেশের মধ্যেই থাকে। সেইজন্য ছবির প্রতিটি দৃশ্যের জন্য পরিচালকের যে চিন্তা তার সঠিকত্বের উপরই নির্ভর করে তার চলচ্চিত্র গুণ। ক্যামেরার অবস্থান, অভিনেতাদের চলাফেরা প্রভৃতিও চলচ্চিত্রের বক্তব্য প্রকাশে সাহায্য করে তাই অনভ্যস্ত হাতে ছবির চলচ্চিত্রসম্মত অর্থ পাল্টে যায়।

প্রত্যেক দেশের চলচ্চিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য বা ঢঙ সেই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। পৃথিবীর সর্বত্র সাড়া জাগানো চলচ্চিত্রগুলিকে অবশ্য এই ধরনের তকমা দিয়ে আলাদা করা যায় না তবু এটুকু বলা যায় এইগুলির গায়েও তাদের দেশের মাটির গন্ধ আছে। বৈশিষ্ট্য বা ঢঙ বোঝাতে আমি ঐ দেশের অধিকাংশ চলচ্চিত্রকার যে স্টাইলে ছবি করেন তাই বোঝাতে চাইছি। এই বৈশিষ্ট্যে আধুনিক ফরাসী ছবি, আধুনিক সুইডিশ ছবি, আধুনিক জার্মান ছবি, যে যার নিজের বৈশিষ্ট্যের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা।

প্রত্যেক দেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে দেখা যায় বিভিন্ন পর্যায় বা পিরিয়ড। প্রত্যেকটি পর্যায়ের পিছনেই কিছু কিছু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ আছে। এইগুলি নির্ণয় করে দেয় কি ধরনের চলচ্চিত্র সেই দেশে বেশি করে তৈরী হবে। উদাহরণ হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষাশেষি থেকে কিছুদিন ভাল চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে. যা পৃথিবীকে জানিয়েছে চলচ্চিত্র মাধ্যমের ক্ষমতা কতদূর, শিখিয়েছে চলচ্চিত্রকে সত্যকার গণমাধ্যম হিসেবে ভাবতে। কিন্তু আজ সপ্তম দশকে নির্মিত সোভিয়েত চলচ্চিত্র থেকে কি তেমন কোন শিক্ষা পাই? দ্বিতীয় দশকে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলির উপজীব্য কাহিনী ছিল সদ্য সমাপ্ত বিপ্লব বা বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার অবস্থা। কিন্তু সপ্তম দশকের চলচ্চিত্রের কাহিনী হল আধুনিক রাশিয়া। এই দুই দশকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তনের উপর দুই সময়ের চলচ্চিত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে গেছে। অবশ্যই এই পরিবর্তন বক্তব্যের দিক থেকে। বর্তমানে অনেক দেশেই আধুনিক চলচ্চিত্র টেকনোলজির দিক থেকে অনেক উন্নত। এই পরিবর্তন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সম্ভব হয়েছে সেইজন্যে আজ ত্রি-মাত্রিক চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা ভাবা হচ্ছে এবং পরীক্ষা চলেছে।

চলচ্চিত্র সম্মিলিত (Composite) সৃষ্টি বলে দর্শকের দায়িত্ব নেই তা নয়। ভাল দর্শকই ভাল চলচ্চিত্রের জন্মদাতা। কার জন্য সৃষ্টি, শুধু কি গুটিকয়েক সমালোচকের জন্য? নিশ্চয়ই নয়। বৃহৎ দর্শকমণ্ডলী বোদ্ধা না হয়ে উঠলে যথার্থ ভাল চলচ্চিত্র সৃষ্টি হবে না। দর্শকমণ্ডলীর একটা বৃহৎ অংশ চলচ্চিত্র দেখতে যান কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য। ভাল চলচ্চিত্রের মনোরঞ্জনের ক্ষমতা যেমন আছে তেমনি সঙ্গে আছে শিল্পসম্মত গুণ। মনোরঞ্জনের ক্ষমতা দিয়ে অনেক দর্শককে আকৃষ্ট করা যায়। যায় না শিল্পগুণ দিয়ে। চলচ্চিত্র শিল্পসম্মত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য দর্শককে শিক্ষিত হতে হয়। এই শিক্ষা চলচ্চিত্র ভাষা শিক্ষা। অর্থাৎ চলচ্চিত্র বোঝার জন্য দর্শককেও কিছুটা চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষিত হতে হয়।

দর্শককে শিক্ষিত করার জন্য চলচ্চিত্র দেখানোর সাথে সেই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। কোন চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে চলচ্চিত্রের মধ্যে কিভাবে পর পর ফ্রেমগুলি এসেছে, চরিত্রগুলি কে কোন অবস্থান থেকে কি বলছে, কখন বলছে, সঙ্গে কি সঙ্গীত আছে, ক্যামেরার অবস্থান ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারটাই মাথায় রেখে আলোচনা করতে হয়।

আমাদের বাংলা দেশের দর্শকদের শ্রেণী বিভাগ করলে দেখা যাবে, একদল দর্শক কেবলমাত্র হিন্দি চলচ্চিত্রের দর্শক। কোন ছবিই প্রায় বাদ পড়ে না। এই দলে অবাঙালীর সংখ্যাধিক্য। অবশ্য সদ্যসমাপ্ত স্কুলের ছাত্র কিংবা সদ্য প্রবেশলব্ধ কলেজের ছাত্ররাও অনেক পরিমাণে এই দলে আছেন। অবশ্য আর একদল শুধুমাত্র ইংরাজী ছবি দেখেন। অবশ্য ভাল হিন্দি বা বাংলা ছবিও দেখেন। বাংলা ছবি দেখে এমন দর্শকের সংখ্যা আজকাল অনেক কমে গেছে।

দর্শকদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা যথেষ্ট থাকলেও তাঁরা চলচ্চিত্র দেখতে যান প্রধানতঃ মনোরঞ্জনের জন্য। ফিল্ম ক্লাবের কিছু সভ্যা ছাড়া সাধারণ ভাবে আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রকৃত সচেতনতা নেই। ছুটির দিন কিংবা কাজের ফাঁকে কিছুটা সময় আনন্দে কাটাবার

ইচ্ছায় তাঁরা প্রেক্ষাগৃহে ঢোকেন। তাই সকল ধরণের চলচ্চিত্রই অধিকাংশের কাছে ভাল লাগে। অবাস্তবতা, বাড়াবাড়ি, অতি-অভিনয়ও সাদরে প্রশ্রয় পায়।

* * * *

দর্শকের সাথে পরিচালকের পরিচয় ঘটান সমালোচক। এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কারণ চলচ্চিত্র অন্যান্য শিল্পমাধ্যম চিত্রকলা, মুদ্রিত পুস্তক বা থিয়েটার নয় বলে এর সমালোচনা একবারই হবে এবং তারই উপর নির্ভর করছে পরিচালক বাঁচবেন না মরবেন। অন্যান্য মাধ্যমের মত পুনরায় বিচার করার উপায় নেই বলেই ভুল সমালোচনা পরিচালকের জীবন শেষ করে দিতে পারে। এক একজন পরিচালকের এক একটি চলচ্চিত্রের এক একটি দৃশ্যের জন্য কত বছরের চিন্তা ভাবনা থাকে সমালোচক এক কলমের খোঁচায় হয়ত তা ধুলায় মিশিয়ে দেন। এইজন্য সমালোচককে সহানুভূতিশীল হতে হয়।

প্রত্যেক বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সম্বন্ধে দর্শকদের ওয়াকিবহাল রাখা সমালোচকের কাজ। আমাদের মত দেশ বলেই একথা বলছি। আমাদের দেশে দর্শকরা ছবি দেখার আগে বিচার করেন কোন পরিচালকের ছবি তাই দিয়ে নয়, কোন দেশের ছবি তাই দেখে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলা যায়। কিছুদিন আগে হাওড়ার একটি প্রেক্ষাগৃহে লিণ্ডসে এ্যান্ডারসনের 'ইফ্' চলছিল। সন্ধ্যার শো শুরু হবার সময়েই প্রায় পৌঁছে টিকিট কেটে হলে ঢুকে দেখি সামনে একদম ফাঁকা, মানে অল্প কিছু, আর পিছনে আরো কিছু মানুষ। বোধহয় সবশুদ্ধ জনা পঞ্চাশ হবে। এই বলে কি মনে করতে হবে হাওড়ায় উৎসাহ লোক নেই, তা নয় আসলে সাধারণ লোকের কাছে ভাল ভাল ছবি এবং তাদের নির্মাতাদের সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করে রাখতে হবে। এই দায়িত্ব প্রত্যেক সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচকের।

এই প্রসঙ্গে মনে হয় পরিচালকদের নিজেদের দায়িত্ব আছে। যদিও মাঝে মাঝে তাঁরা ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য রাখেন তবু বলা যায় এ ধরনের আলোচনা থেকে পরিচালকের চিন্তা সবসময়ে বিশদ-ভাবে লাভ করা যায় না। পরিচালক যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁর সৃষ্ট কর্মে যে চিন্তা ফুটে উঠে অনেক সময় সমালোচক নিজের চিন্তা দিয়ে হয়ত তার নতুন ব্যাখ্যা করেন যা পরিচালকের চিন্তায় ছিল না। এই ক্ষেত্রে মনে হয় সমালোচকই যথার্থ, কারণ তিনি যদি যুক্তি এবং ব্যাখ্যার দ্বারা সমগ্র শিল্পকর্মকেই একটি ব্যাখ্যায় দাঁড় করাতে পারেন তাহলেই তিনি সমালোচক হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারবেন। অনেকসময় এমনও হয় পরিচালকের চিন্তায় যা ছিল না, সমালোচক তাঁর ছবি থেকে তা উদ্ধার করে নতুন ব্যাখ্যা দেন। পরিচালকেরা যদি তাঁদের নিজেদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে লেখেন তাহলে সমালোচক এবং দর্শক উভয়েরই সুবিধা হয়। বিদেশে অনেক পরিচালকই চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে সাথে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কিছু কিছু লিখেছেন। আমাদের দেশে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তবে এর বিস্তার ও ব্যাপকতা দেশের চাহিদার তুলনায় এত কম যে সমালোচনা ব্যাপারটা গড়ে ওঠার পিছনে পরিচালকের সক্রিয় সহযোগিতা তেমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিচ্ছে না।

চলচ্চিত্র আর দর্শকের মাঝে সমালোচক রয়েছেন। সমালোচকের বক্তব্য দর্শক জানতে পারেন চলচ্চিত্র সংক্রান্ত লেখা পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে সমালোচনা লেখা ব্যাপারটা খুবই অবহেলিত। খবরের কাগজগুলি সপ্তাহে একদিন করে চলচ্চিত্রসংক্রান্ত ব্যাপারে কাগজের একটি করে পাতা বরাদ্দ করেন বটে কিন্তু দেখা যায় পাতার অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, বাংলা খবরের কাগজগুলির সমালোচনার ধরণ একঘেয়ে এবং বাঁধাবুলির মত সব কিছু একটু একটু করে ছুঁয়ে চলে। ব্যতিক্রম দেখা যায় ভাল পরিচালকের ছবির সমালোচনায়। তখন এঁদেরই হঠাৎ নতুন চেহারা! বেল্ট কষে, টুপী ঠিক করে বন্দুক বাগিয়ে বসেন। তুলনামূলক ভাবে ইংরাজী কাগজ-গুলিতে সমালোচনায় নতুনত্ব আছে এবং সমালোচনাগুলি তুলনামূলকভাবে অর্থপূর্ণ হয়। কিন্তু এদের ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ সমালোচনার পরিসর অত্যন্ত অল্প।

কতকগুলি শুধুমাত্র সিনেমারই সাপ্তাহিক কাগজ আছে। বাংলা ও ইংরাজী দুই ভাষায়। এর মধ্যে ইংরাজী কাগজগুলিতে মাঝে মাঝে ভাল সমালোচনা বেরোয় অন্য সময় গতানুগতিক। সুটিং-এর খবর, চলচ্চিত্রের ছবি, নানারকম কেচ্ছাকাহিনী, মনগড়া গল্পে ভর্তি থাকে। কতকগুলি ইংরাজী ও হিন্দি পাক্ষিক এবং মাসিক পত্রিকা রয়েছে যেগুলি বেশির ভাগ খবরের কাগজের গ্রুপের পত্রিকা তাই ব্যবসাই এদের প্রধান উদ্দেশ্য। এগুলির মধ্যে নানারকম কাণাঘুষা, কে কি করছে, কাকে কোথায় দেখা গেছে, কার পা বাঁকা, কার কোথায় তিল আছে ইত্যাদি খবরে পূর্ণ থাকে। বাংলা 'আনন্দলোক' এর ব্যতিক্রম নয়।

খবরের কাগজ ছাড়া রয়েছে ফিল্ম ক্লাবগুলির মুখপত্র। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক ক্লাবেরই একটি বা দুটি করে মুখপত্র রয়েছে। এইগুলি হলো সিনে ক্লাব অফ্ ক্যালকাটার বাংলা মুখপত্র 'চিত্রকল্প' (ত্রৈমাসিক) এবং ইংরাজী 'কিনো'। সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মাসিক বাংলা মুখপত্র 'চিত্রবীক্ষণ'। নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির বাংলা মুখপত্র 'চিত্রভাষ', ফিল্ম সোসাইটির 'চিত্রপট', সিনে ইনস্টিটিউটের মাসিক 'চলচ্চিন্তা' এবং ত্রৈমাসিক 'মুক্তি মনতাজ'। নৈহাটি সিনে ক্লাবের 'দৃশ্য' এবং ফেডারেশন অফ্ ফিল্ম সোসাইটিজের ইংরাজী মুখপত্র 'ইন্ডিয়ান ফিল্ম কালচার'। ফিল্ম ক্লাবগুলির মুখপত্রগুলির প্রধান অসুবিধা হলো এর প্রকাশ অনিয়মিত।

প্রত্যেক মাসে একটি করে নিয়মিত প্রকাশিত পত্রিকা নেই। তাই যখন কোনো চলচ্চিত্রের ওপর আলোচনা প্রকাশিত হয় তখন দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই চলচ্চিত্র দেখানোর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। উপরে উল্লিখিত পত্রিকাগুলিতে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা থাকে। সমকালীন চলচ্চিত্রের আলোচনায় ক্ষেত্রে মোটামুটি খবরের কাগজের মতোই ভাল পরিচালকের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিস্তৃত ভাবে লেখা হয়। ফিল্ম ক্লাবগুলির মুখপত্রে যে ভাবে বিশ্লেষণ আশা করা যায়, সমালোচনা-গুলি তেমনভাবে লিখিত হয় না। বেশীর ভাগ লেখার মধ্যেই সাহিত্য-গুণ চলচ্চিত্র কৌশলগত আলোচনার দিককে আচ্ছন্ন করে রাখে। তবে এ'কথা স্বীকার করতেই হবে চলচ্চিত্রের যথোপযুক্ত আলোচনা যা হওয়া উচিত তা যতটুকু প্রকাশিত হয় তা কেবলমাত্র এই পত্রিকাগুলির পাতাতেই পাওয়া যায়। প্রত্যেক ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যই যে মুখপত্রগুলি কেনেন তা নয়, তার ফলে এই সকল পত্রিকাগুলির সার্কুলেশন খুব বেশী বাড়েনি এবং অন্যান্য পত্রিকার মত আর্থিক সংকটও রয়েছে। প্রত্যেক ক্লাবের উচিত কেন তাদের মুখপত্রগুলির প্রচার এবং বিক্রি বাড়ছেনা তার কারণ অনুসন্ধান করে সেইমত ব্যবস্থা নেওয়া এবং মাসিক মুখপত্র হিসেবে বের করা। তা না হলে প্রত্যেক ক্লাবের মধ্যে আলোচনা করে এক একমাসে যাতে কেবলমাত্র এক একটি ক্লাবের মুখপত্র বেরোয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। এই ভাবে ভালো চলচ্চিত্র দেখানোর সাথে সাথে সুস্থ আলো-চনাও শুরু হোক। সমস্ত ক্লাবগুলি যৌথভাবে উদ্যোগী হলে নিশ্চয়ই পত্রিকার দামও কম থাকবে। আসল উদ্দেশ্য বৃহত্তর দর্শকমণ্ডলীকে শিক্ষিত করে তোলা, সেইজন্য চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকার মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখা প্রয়োজন।

চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য শুধুমাত্র বছরে কয়েকটি ছবি করমুক্ত করে দিলেই সব শেষ হয়ে যায় না। ভাল ছবির প্রদর্শনের কোনো প্রেক্ষাগৃহ নেই। সরকার যদি একটা বা দুটো প্রেক্ষাগৃহ অধিগ্রহণ করে সেই প্রেক্ষাগৃহে শুধুমাত্র ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন প্রযোজিত ছবিগুলি যা ব্যবসায়িকভাবে মুক্তি লাভ করেনি, বা বিদেশী ভাল ছবি কিংবা ফিল্ম আর্কাইভসের অন্তর্গত নির্বাক যুগের সেরা ফসলগুলির ধারাবাহিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ চলচ্চিত্রগুলির উপর আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেন তবে দর্শকের রুচির পরিবর্তনের কথা ভাবা যেতে পারে। বর্তমানে আমরা দর্শকদের ভাল রুচির অভাবের জন্য দায়ী করি কিন্তু সাধারণ দর্শকের সামনে সারা বছর ধরে ভাল রুচির ছবি কটি থাকে? হাত গুনে বলা যায় চার থেকে পাঁচ। এতো গেল রুচির দিক।

দর্শককে চলচ্চিত্রে অনুরাগী করে তোলার জন্য চলচ্চিত্র সম্বন্ধে পড়াশুনা এবং যাঁরা চলচ্চিত্র নিয়ে কাজকর্ম করতে ইচ্ছুক তাঁদের জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলা দরকার। সরকারী তত্ত্বাবধানে ভাল ভাল চলচ্চিত্র সাংবা-দিক, পরিচালক, কলাকুশলী দ্বারা পরিচালিত এই সংস্থা গড়ে উঠুক। স্টুডিও পাড়ায় এই সংস্থা হলে সব থেকে সুবিধা। বর্তমানে পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রসার এবং খ্যাতি দুইই বেড়েছে কিন্তু এই সংস্থায় অধ্যয়নের মতো আর্থিক সংস্থান অধিকাংশ লোকেরই নেই তাই যদি কোনো সংস্থা গড়ে ওঠে তাতে যেন প্রবেশ করার ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিও সাধারণ মানুষের থাকে।

আর একটি ব্যবস্থা করা যায় যার দ্বারা দর্শকের চলচ্চিত্র ভাষা বোঝার সাহায্য হয় সেটি হ'লো কোনো চলচ্চিত্রের প্রদর্শন শেষ হলে সেই চলচ্চিত্রের পরিচালককে স্টেজে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। সদ্য দেখা চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতা সকলের চিন্তায় থাকবে তাই এই ধরণের প্রচেষ্টায় অধিক সংখ্যক দর্শক অংশ গ্রহণ করবে। কিন্তু এই ধরণের প্রচেষ্টা সরকার পরিচালিত প্রেক্ষাগৃহেই সম্ভব। আশা করবো জনপ্রিয় সরকার এই দিকে দৃষ্টি দেবেন।

এ ছাড়া দর্শককে শিক্ষিত করার জন্য ভাল চলচ্চিত্র পত্রিকা প্রকাশের দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে। প্রথমেই যদি সরকারী তরফে চলচ্চিত্র বিষয়ক কোনো নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশে অসুবিধা থাকে তো সরকারী তরফে ফিল্মক্লাব গুলির মুখপত্রকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। এই মুখপত্রগুলির নিয়মিত প্রকাশ হলে চলচ্চিত্র বিষয়ক সুস্থ আলোচনার ক্ষেত্র গড়ে উঠবে।

জনপ্রিয় সরকারের কাছে আর একটি প্রস্তাব রাখা যেতে পারে। বিদেশের মত যদি চলচ্চিত্রকে পড়াশুনার অঙ্গ করে নেওয়া যায় অর্থাৎ চলচ্চিত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। তাহলে নিশ্চয়ই সবদিক দিয়েই চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যম হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, এর সম্বন্ধে সকলকেই আগ্রহী করে তুলবে।

শিল্প জীবন : ঋত্বিক ঘটক : একটি অন্বেষণ

সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঋত্বিক ঘটকই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন এই উক্তি যে, 'জন্মই জীবন, শিল্প জীবন'। অবশ্য এই সংজ্ঞা অত্যন্ত সহজ বলেই আবার তা জটিল। কেননা জন্ম কাকে বলে, জীবনই বা কী, শিল্প জীবন কেমন ভাবে সম্ভব, এই সব গূঢ়তর চিন্তা যতক্ষণ না একজন মানুষ কিংবা শিল্পী, পাঠক বা সমালোচকের ধারণায় স্পষ্ট এক সূর্যময় ধারণায় পৌঁছবে, ততক্ষণ এই উক্তির শিল্পের দুয়ারের রহস্য বিন্দুমাত্র উন্মোচিত হয় না। বস্তুত মনেই হয় না যে, এই অপৃথক যত্নজাত এক গভীর ছন্দময় শব্দের স্বতন্ত্র বিচার ভাবনা কোনো ক্রমেই সম্ভব। প্রাত্যহিকের সঙ্গে নিযুক্ত এই জীবন এই শব্দ কি রেখে যায় কোনো ভিন্নতা? তবে কি ভিন্নতা থেকে যায় জীবনের সেই সংলগ্নতায়। সঞ্চার করে দেয় কি সেই "যত ক্লেদাক্ত বিষাক্ত অভিশাপের ভিতর দিয়ে আমাদের বেরুতে হবে, শিল্প আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে।" এই অন্তর্লীন রহস্যে ভরা ভিতর অস্তিত্বের হিসাব নিকাশ।

জনজীবনের নামাগুয়ে বাংলা চলচ্চিত্র কিংবা একটু এগিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মুক্তি কামনা ক্রমপ্রসূত হয়ে চলে যায় একটা ঝলমলে নিকানো নিটোল সাজানো গোছানো বাস্তবতার সুখীসুখী পরিবেশে, ঠিক তখনই হঠাৎ অযান্ত্রিক নিয়ে এই চলচ্চিত্রকার প্রত্যাবর্তন করেন, ব্যাখ্যা করেন দুঃসহ জলন্ত বাস্তবতায় যান্ত্রিক বস্তু সভ্যতায় মানুষের নিষ্ঠুরতা, তার ক্লেদাক্ত অসহায় পরাজয়, চঞ্চল জীবন প্রবাহে আনন্দময় জীবনকেই। ঠিক এই একটি মাত্র ছবিই, সমস্ত সভ্যতার অবয়বের সঙ্গে জড়িত রূপে, ছন্দে, ভাষায় অবিচ্ছেদ্য জীবন অংশ হয়ে ওঠে। এই ভাবেই কি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক আধুনিক কাল ভূমিকায় এক জটিল অন্তঃময় সংঘাতের নিজের মধ্যে অসতর্ক শিথিলতা আত্মসাৎ করে নেন। এই ভাবেই কি জীবনের সমভূমি থেকে উত্তোলিত করে নেয় আত্মিক ভূমাহীন এক ভূমিতে।

স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায়, হয়তো শিল্পী জীবনের চেতনায় তাঁর দাবী ছিল, সেই নিষ্ঠুর বাস্তবকে কোনো রাঙ্গানো নয়, সভ্যতার আগুনে ঝলসে দেওয়াতেই, তাঁর সুবর্ণরেখা, কোমল গান্ধার, মেঘে ঢাকা তারা, তিতাস, যুক্তি তক্কো, এই সব রূপের রূপপ্রকৃতির মধ্যে কি সেই দাবীমূলের সর্বাধিক গুরুত্বময় আদর্শ বোধের জগতে পৌঁছে দেয়নি! কিন্তু সভ্যতাকে কেবলি অন্তর্লীন অন্ধকারে ঘরে নিয়ে যায় অথ জীবনের গানকেই। বস্তুত মুক্তিপ্রাপ্ত সবকটি ছবিতেই সুবর্ণরেখার ধারে নতুন বাড়ীতে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন শিল্পী, যেখানে জীবন ফুলের মতোই ফুটে উঠবে, থাকবেনা অবক্ষয়ের ক্লেদাক্ততা, মানুষ মানুষকেই ভালোবেসে বিশ্বাসে ত্বরান্বিত করে তুলবে নতুন সুন্দর এক প্রজন্মে।

এই সব চিন্তা জীবনগত শিল্প চেতনায় যখনই গৃহস্থালি ভূমিকা নেয় তখনই আপোষের প্রসঙ্গে আর তিনি ধরে রাখতে পারেন না। তাঁর আক্রমণ তাই ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিন হয়, কিন্তু এই কঠিনতার কথা রূঢ়তার বা ক্ষোভের কথা বলতে বসে মনে রাখতে হবে শিল্পী স্বয়ং নিজস্ব এই আক্রমণের সুযোগ যেমন খুলে দিয়েছেন, তেমনিই সাবধানতা নিয়ে তাঁর কোনই ছিলনা ভাবনা, ভাবনা ছিল চলচ্চিত্র শিল্পের ফর্মকে কিংবা তার আঙ্গিক সর্বস্বতাকেই ভেঙ্গে দিলেই পাবেন সেই মুক্তির জগতে পৌঁছতে। তাই অবশ্যই প্রত্যেকটি নিজস্ব জগত নিয়েই এসে যায় এই শিল্পকর্মগুলি, যাতে ভাবনা জগতের অন্তর্বর্তী দেশকে রূপায়িত করে দেয়, আবার ভিন্ন ভাবে এই চলচ্চিত্র শিল্প যে ক্রমশঃই পৌঁছে দিতে চায় এবং পৌঁছতে চায় একটি কাব্যিক ছন্দময় রচনার দিকেই, তাকেই খুলে দিতে চেয়েছেন। একথা কিন্তু সর্বত্র সত্য নয়, যে জীবন অনুষঙ্গ যখনই বেঁচে থাকার নানান তলকে কেবলি মুখোমুখি এনে দিতে চেয়েছে একই সঙ্গে, তখনই কি সেই সত্যের পথ চলনে স্পর্শ করাতে চায় সেই গভীর যন্ত্রণায় উপলব্ধির তীব্র কবিতাকে।

আমরা তো চেয়েইছি, দৃশ্যমান শিল্প তার আলোছায়ায়, শব্দ, নিঃশব্দে, চলায়, থামায়, তার সামগ্রিক সঞ্চরমান জীবনের সঙ্গেই জড়িত কেবলি খুলে খুলে দিক সেই মহৎ সৌন্দর্যের খনিকে। এইভাবেই তো আমরা আমাদেরই অজ্ঞাতে ঢুকে পড়ি সেই সৌন্দর্যের সত্যতায়, যা আমাদের সমস্ত দুর্বলতম ক্লীব ইচ্ছাগুলোকে মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়ে দেবে প্রাচীন ঐতিহ্যময় এবং সঞ্চরমান নিজস্ব অনুভবের উপলব্ধির জগতে।

চলচ্চিত্রের নিজস্ব আড়ালকে খুলে দিতে চেয়েছেন বারবার ঋত্বিক, তাই তাঁকে চলচ্চিত্রের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে দর্শকদের কাছে সেই শব্দ সেই ভাষাকে নিয়ত একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে হয়েছে। তিনি বুঝেছেন "ভাষা", এইটিই চলচ্চিত্রের নিজস্বতা, উপন্যাসের ভাষা চলচ্চিত্রের ভাষা নয়। আবার এই "ভাষা থাকলেই তার একটা ব্যাকরণ থেকে যায়, একটা সংঘবদ্ধ রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে তাকে পার হতে হয়। যেমন বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণেই একটি ভাষা তার রূপ পরিগ্রহ করে।" সঙ্গে নিয়ে আসে তার নিজস্ব মুক্তিকেও। ভাষা এবং শব্দ। ভাষার পরেই এসে যায় শব্দ। ভাষার বিকাশের জন্য এলো শব্দ। সঙ্গীত

সংলাপ, বিচ্ছিন্ন শব্দ, নিঃশব্দতা এইসব এবং আরো সব উপাদানগুলি মিলে মিশে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই স্পষ্টতার দিকেই। ভাষা আর শব্দ এক নয়। ভাষার মধ্যেই আছে শব্দ। আবার এই দুজনের বিবাহিত শয্যায় শব্দ-ব্যক্তিত্ব জন্ম নিচ্ছে। আবার এই শব্দকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে ছন্দের অক্লান্ত অন্বেষণে চলেছে এই আগ্রহ। কিন্তু সেই ছন্দ কোন্ ছন্দ? সেই ছন্দই, সমস্ত সামগ্রিকতায় পরস্পর গ্রন্থন এবং বিন্যাসের এক অমোঘ লীলায় সেই অশ্রুত এক ঝঙ্কার ধ্বনি বেজে ওঠে, প্রবেশ করায় সেই অন্তর্লীন রহস্যে স্তব্ধ মানুষকেই বোঝবার বোঝাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সংবদ্ধ অথচ বৈচিত্র্যের ছন্দের তরঙ্গের মধ্যে এক মুক্তির সন্ধানে হাতছানি দেয়। জীবনকে ধরিয়ে দেবার আগ্রহ হয়ে ওঠে প্রবল। ক্রমেই দর্শকমনের জীবন অনুসন্ধানকেই যেন ছুঁতে পারা যায়। ছন্দ যেমন কোনো ক্ষেত্রে কবিতার হয়ে ওঠে এক দুর্বোধ্য আড়াল, বিপরীতে এই ছন্দই আবার দৃশ্যমান শিল্পে প্রাণে দেয় জীবন প্রসঙ্গে আলোচনায়।

কিন্তু ভাবলে মনে হবে, হয়তো নিতান্তই এইটা একটা মাত্রার সংযোজন। কেননা, এই সবের সৌষ্ঠবেই কি শেষ পর্যন্ত বাঁধা পড়বে আমাদের চলন। এইটাকে বলি গভীর শিল্প, ওইটাকে শিল্পহীনতা, এইসব হয়তো নমনীয়ভাবেও কি মনে আসবে, এই সব ভ্রান্তিমূলক আকর্ষণ। কিন্তু তা নয়। এই গভীর জীবনের ভাষায় পৌঁছতেই চায় শিল্পমনস্কতা। কারণ এতেই আছে বর্তমান প্রজন্মের মুক্তির পথের ইশারা। তাই এই ছন্দ, ভাষার চরিত্রকে বিসর্জন দিয়ে, ভিতর দিকে আরো ভিতর দিকে পেনিট্রেট করে দেয়, ইনার রিয়্যালিটির গভীরতাকেই ছুঁয়ে দিতে চায় এই প্রবহমান ছন্দের মাত্রা। সারফেসকে ছেড়ে এই দৃশ্যমান চিত্রময়তা কেবলি ঘুরে ফেরে সেই গভীর গভীরতর সুড়ঙ্গের পথ ধরে। বিশৃঙ্খলার সুযোগ কখনই যেন না এসে সমস্যা তৈরী করে রাখে। তাই একটি স্থির নির্দেশের অবয়বের দ্বারা, বর্হিবিচারে যা মুক্ত অন্তর থেকে সুশৃঙ্খল করে নেওয়া যায়, তাতেই জীবনকে ধরতে চেয়েছেন চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক।

এই ভাষা, এই শব্দ, এই ছন্দ, যতখানি উপকারী হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের শিল্প দৃশ্যমানতায়, তেমনিই আবার প্রবল বাধাও হয়ে দাঁড়ায়, যাতে বহিঃঅবয়বে থমকেও দাঁড়াতে পারে। তাই এই ভয় থাকার জন্যই বারবার কবিতাকেও তিনি ভেঙ্গে দিয়ে এগিয়েছেন। যেমন 'সুবর্ণরেখা'য় পরিত্যক্ত এরোড্রোমে সীতা আর অভিরামের দৃশ্যটি। দুই নিষ্পাপ শিশুমন খেলে বেড়ায় একদা যুদ্ধের জন্যই ব্যবহৃত আজকের এই পরিত্যক্ত এরোড্রোমে। অথচ তারা সেই শিশুমনের চঞ্চল সজীবতায় জানেই না, এই জান্তব-পাশব-পাষাণ এরোড্রোমটি কত মানুষের মৃত্যুর ঘোষণার জন্যই ব্যবহৃত। সেই পরিত্যক্ত ভাঙ্গা ক্লাব ঘর, যেখানে সীতা-অভিরাম খেলেছে, এইটিই ব্যবহার হতো সেই জন্যই। যেখানে ঘরে বসেই সেই সব মহাযোদ্ধারা, মানুষ হত্যাকারীরা হত্যার পর হৈ হল্লা করত মানুষ মারার তীব্র উল্লাসে, বা মানুষকে মৃত্যু দেবার ক্লান্তি থেকে জেগে ওঠার জন্য। ঋত্বিক এই দৃশ্যে সমগ্র ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ দিয়ে রচনা করেন সেই সর্বনেশে কবিতায়, তার মধ্যে ঢুকিয়েও, তছনছ করে, জনজীবনের জীবনঘনিষ্ঠ উত্তরও তিনি রেখে যান, পটভূমিকায় বিলীয়মান স্মৃতিকে সজীব রেখে চিরন্তন মানবিক সমস্যার লক্ষ্যেও ফিরিয়ে দিতে ভয়ানক তীব্র চীৎকারে।

এই ভাষা এই শব্দের, এই সঞ্চরমান ছন্দ আমাদের আরো গভীর সেই লুকোনো সত্তা রহস্যের দিকে পৌঁছে দেবার জন্যেই এসে যায় প্রতীক। প্রতীকের নিজস্ব শক্তিই হচ্ছে দূরে আরো দূরের গভীরে সে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। একটা নিবিড় নিটোল অর্থের মধ্যে দিয়ে একটি তীব্র আকাঙ্খাকে জন্ম দেয়। এই আপাত নিরর্থক বোবা অথচ ইঙ্গিতময় অর্থের দিকেই তার নিরন্তর যাত্রা। এই প্রতীকের গভীরতর তাৎপর্যময় ব্যঞ্জনা সূর্যের মতোই বিকীর্ণ হতে থাকে। এই বিকীর্ণতা শতধারায়। কারণ, প্রতীক এক বিশেষ অর্থের মাত্র প্রতিনিধিত্বই করে না। ঋত্বিক এই প্রতীকতা নিয়ে কেবলই ভাবনায় চিন্তায় আরো গভীরভাবে সেই আবেগের কাছে হাত রাখতে চেয়েছেন। সেই আবেগের কাছে অসংখ্য প্রতিধ্বনির জন্ম দিতে চেয়েছেন সচেতন প্রয়াসে। তাঁর প্রতীক কিছুমাত্র এক অর্থে বলে না, আবার বহু অর্থে বলতে চায়। কোনো বক্তব্যকে সে টেনে আনতে চায় না। অথচ ভিন্নভাবে সেই বিষয়েই তার বলার কিছু আগ্রহ রেখে যায় তার নিজস্ব ভাষাতে। সে যেন ছলনাময় আলৌকিক রহস্যময়তায় হারিয়ে গিয়েও আবার প্রতিবাদের বাস্তব ভাষা। সে নিজেকে অতিক্রম করেও আবার নিজেকে ধরে নিতে চায় সে কেবলই নিজের সৃষ্টিকে ব্যাখ্যামূলক-দর্শন মূলক চিন্তনে সর্বক্ষণ নিযুক্ত। অক্লান্ত সৈনিক। তাই বারবার ফিরে ফিরে চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক লোক জীবনের ফল সম্পর্কের যোজিত এক প্রতীকতায় টেনে নিতে চেয়েছেন। মহাকাশ যেন এই নবীনকেই প্রকাশ করে দেয়। প্রত্যেক মুহূর্ত কেবল বর্তমান নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতের দিকেই যেন তার নিরন্তর যাত্রা। সব কিছুতেই জীবিত চঞ্চল প্রবাহের সঞ্চরমান ছন্দকেই বুঝে নিয়েছেন ঋত্বিক। তাই কেবল বৈচিত্র্য আনার ইচ্ছাই নয়, পুরাণপন্থা বা ধ্রুপদি অনুবর্তনের শিকড় সন্ধানে ব্যস্ততাতেই কাটে তার শিল্পমন।

তাই তাঁর সমগ্র শিল্পকর্মেই তিনি কেমন করে বর্জন করে চলছিলেন চলতি চরিত্রের ভাবনা। অথচ এই চলতি চরিত্রের নিবিড় ঐক্যের শিকড় সন্ধান করছিলেন সেই পুরোনো চরিত্রের মধ্যেই। সুবর্ণরেখায় যখন দেখি তিনি সব থেকে বিদ্রোহী, এবং মার্কসীয় চিন্তায় ভাবনায় নিষ্ঠুর এক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সত্যের অনুসন্ধানী, তখনও তিনি পুরোনো ঘটনা নিবেশেও নিয়োজিত থাকেন। ছবিটিতে রাম সীতার উপাখ্যান, অভিরামের রাম এই প্রাচীন চিন্তার ধরন ও প্রস্তাবনা তাঁর বৃহৎ ব্যবহারে আসে। তিনি নিজেই আমাদের শুধরে দেন এই বলে, "পুরাণের অলৌকিকতাও প্রতীক প্রধাকে খাদ্য যোগায়।...প্রতিপাদ্য বক্তব্যকে ধারালো করে তুলবার কাজে তাদের দান অপরিমেয়। তাছাড়া প্রথা নিকট ভবিষ্যত সম্পর্কে

আমাদের মনকে সুস্থির রাখে—কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার লোভে মনকে অস্থির করে না। শিল্পভাষার অতিব্যবহৃত কৌশলের স্থান এতে নেই।" স্মরণযোগ্য, এই ছবিতেও এই দৃশ্যেও তিনি কবিতাকে ভেঙ্গে দেন ভেতরে রহস্যের দ্বার উন্মোচনের জন্য। শিশু সীতা যুদ্ধের এক প্রলয়ক্ষেত্রে পরমানন্দে হাততালি দিয়ে গান গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ এক ভয়ংকর কালীমূর্তি তার সামনে এসে পড়ে। মাস্টার মশায়ের কথায় প্রকাশ পায় "বহুরূপী"। ঋত্বিক এই একটি দৃশ্যের ব্যঞ্জনাময় প্রতীক উপস্থাপনার মধ্যে মানব সভ্যতার জীবন মরণের কথা বলে দেন। "সুদূর অতীত থেকে যে archetypal image আমাদের haunt করছে সে আজকে দৃঢ় পায়ে সারা জগতে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে তার নাম Hydrogen bomb, তার নাম Strategic Air command, তার নাম হয়তো বা De Gaulle হয়তো বা Adeneur হয়তো বা উল্লেখ করা চলে না এমন কোন নাম। পরম বিধ্বংসী এই যে সংহার শক্তি, আমরা ঐ ছোট্ট সীতার মতন হয়তো তার সামনেই পড়ে গেছি।...এক মহাপ্রলয় পর্বের মূক সাক্ষীর ওপর দাঁড়িয়ে এত আনন্দ ভালো না। এত সরলতা ভালো না। ধাক্কা দরকার।" এইখানে স্মরণ হয়, তিতাসের সেই দৃশ্যটির ব্যঞ্জনা। যেখানে পাগলকে দোলের দিন নদীর ধারে নিয়ে আসে। পাগলও তাকে রঙ মাখায়, অনন্তর মাকেই কি একদিন পাগল এই ভাবে এই দিনে টেনে নিয়ে ছিল নিজের কাছে। এই কথা হয়তো তাকে মনে করায়। অনন্তর মাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু এই দৃশ্য গ্রামের লোক ভালো মনে করে না। তারা এসে পাগলকে প্রহার করতে শুরু করে। দ্রুত কাট্ শটে দেখা যায় পাগল নদীর চড়ায় পড়ে, একই ফ্রেমে নদীর ঘাটে একটি নৌকা উপুড় হয়ে উল্টে মূক হয়ে পড়ে আছে। একই দৃশ্যের একই ফ্রেমের দৃশ্য গ্রহণের ব্যঞ্জনা, ঋজু ভঙ্গীতে তিনি স্থাপন করেন ক্যামেরা জীবনটাই এদের চলেছে উল্টো মুখে, কেবলি মার খেয়ে মার খেয়ে। শোষণের নিরত বন্ধনে। নদীর চরে মালোরা সমগ্র সত্তাকেই এই ভাবেই ছেড়ে ফেলে দেবে।

সময়খণ্ড যেন বায়ুশূন্য না হয়, তা যেন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই তাঁর হাত কেবলই দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে, লোকপুরাণের দিকে ফিরে যেতে চাইছিল। দেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্যময়তার দার্শনিক ব্যাপ্তিকে তিনি ফিরে পেতে চেয়েছেন। দেশকালের লোকপুরাণের স্মৃতি আমাদের সেই গভীর পথে দাঁড় করায়। বিষ্ণুপ্রিয়া, শকুন্তলা বা উমার প্রতাকে এসে দাঁড়ায় তাঁর নারী চরিত্র। দেশ কালের স্মৃতি এই সব চরিত্রের মধ্যে পুরানো মহিমার সঙ্গে আমাদের বিলীন করে দেয় সত্য এক জগতের মধ্যে। কোমলগান্ধারে অসম্ভব শক্ত অথচ দেশীয় প্রতীকতা, অসম্ভব এক জগতের মধ্যে দাঁড় করায়। পৌঁছে দেয় নিবিড় কোনো এক আত্মিক গভীর চেতনায়। সব কিছুতেই চলচ্চিত্রকার শিল্পমনস্কতায় চাতুর্যহীন ভাবে মুখোশহীন মানুষের মধ্যে যেতে চেয়েছেন। ঋত্বিক তাই বিষয়বস্তু নির্বাচনে, তাঁর শিল্পের শক্তির ইতিহাসে আমাদের দেখিয়ে দেন, কেমন করে নির্বাসিত বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিলেন চলতি ধরনের ভাবনাকে। তাঁর ধারণা, প্লট গঠনের গভীরতা, কেমন করে স্থান কালের বিন্যাসকে ক্রমে ক্রমেই নিটোল নিবিড় ঐক্যের মধ্যে ধরে এনে আবার তা ভেঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবিরন্ত করে প্রতিবাদে মুখর হয়ে থাকে। সেই প্রতিবাদ মুখরতা, এই প্রতীক সর্বস্বতায়ও এক অনায়াস যোগ খুঁজে নিয়েছে।

তাই স্যাটারিলিজমের, সুররিয়ালিজমের, রিয়ালিজমের, নিউ-ওয়েভের দৌরাত্ম্য থেকে সরিয়ে নেবার ঘনিষ্ঠ ইচ্ছায় সরে থাকে। কিন্তু একমাত্র ঋত্বিক ছাড়া, আমাদের দেশের চলচ্চিত্র চর্চাতে এদেশে বসে কমই দেখতে পারছি, বুঝতে পারছি, তেমন কোনো সর্বাতিশায়ী চিন্তা, যা স্পর্শ করবে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নানান সমতল অসমতল সত্তার মুখোমুখি চলন। আমরা কেবলি বিলাসী নগরমনস্কতায় শেষ পর্যন্ত কেবলি ঢুকে যেতে চাইছি,—ঋত্বিক এইখানে প্রতিবাদ করেন। প্রাণহীন বিপজ্জনক মধ্যবিত্ত দেউটি আমাদের পথ, নিতান্ত সহজ পথকে পিচ্ছিল করে দেয়, আমাদের পরাজিত করে দেয় বারবার—চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক এই পরাজিত মুহূর্তে আমাদের তীব্র সাহস এনে দেয়। এই তীব্র সাহসটাকে ঋত্বিক দেখেছেন কবিতার মতো, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের যন্ত্রণার ছন্দে সংগ্রামী সৌন্দর্যে। "মেঘে ঢাকা তারা", লৌকিক পুরাণের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকের মধ্যে ধরে নেয় আজকের সমকালীন বাস্তবতার চরম ছিন্নমূল যন্ত্রণাকে। নীতা, একটি সাধারণ নারী। সে এই ভেঙ্গে পড়া উদ্বাস্তু ছিন্নমূল মধ্যবিত্ত পরিবারটিকে সংগ্রামের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখে, নিজের আত্মসুখ আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে, চেষ্টা করছে বাঁচিয়ে রাখার। নীতা বাঙালী ঘরের গৌরীদান দেওয়া মেয়ে। ঋত্বিক আমাদের জানান great mother archetype এর আদলে এইটি গঠিত। তাই নীতার জন্ম হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন। সেই মৃত্যুর চরম ক্ষণেও তাই শোনা যায়, মেনকার বিজয়ার বিলাপ, 'আয় গো মা উমা কোলে লই।' এই বিস্ময়কর লৌকিকতা বারবার আমাদের জন্ম চৈতন্যে এসে ঘা দেয়। নীতার যক্ষার রোগের আবিষ্কারের সময়তেই এই বিলাপোক্তি আমাদের ক্রমশঃ আধুনিক জীবনের বহু পাপের প্রতীক দেখায়, এই পথ দেখানো বজ্রমুঠি তুলে আক্রমণের আহ্বান জানায়, যখন নীতা পাহাড়ের কোলে, মহাকালের কোলে দাঁড়িয়ে বলে "আমি বাঁচতে চাই দাদা"। ঋত্বিক অসম্ভব শক্ত ক্যামেরার প্যানিং এর দক্ষতার ছন্দে কবিতার শব্দে এই চরম তীব্র যন্ত্রণাময় হৃদয় উদ্বেলিত অথচ সংগ্রামী মনস্ক চিন্তা আমাদের সামনে হাজির করেন।

প্রতীক, অতীত, কাব্যছন্দ ভাষা শিল্পের জীবন, শিল্পই জীবন। এবং একটি পারমাণবিক প্রচণ্ড শক্তি। যাকে অনন্তভাবে জীবনকে এগিয়ে দেবার প্রতিবাদে মুখর করে তোলার অনন্ত সম্ভাবনায় নিযুক্ত করা যায়।

ঋত্বিক বুঝেছিলেন, অতীত কখনই শেষ হয়ে যায় না। আমরা বুঝি, এই মুহূর্তের কোনো ঘটনাই একটু পরে পুরাঘটিত। তাই বর্তমান এবং অতীত অবিচ্ছেদ্য ছন্দ্যতায় জন্ম নিয়ে এগিয়ে চলে। এবং তাতেই গভীর ভাবে নতুনতর ব্যঞ্জনা ও উপকরণ, বর্তমানকে সম্প্রসারিত করে তোলাই সেই পুরাণের অন্তর কথা। তাতেই সভ্যতার সাধনা পূর্ণতার পথ পায়। বিন্দুর মধ্যে সে দেখায় বিরাটত্বকেই, য়ীথ রিচুয়াল আর্কেটাইপে, আমাদের এবং নিজেও সচেতনভাবে গভীরভাবে সেই প্রতীকতায় অসম্ভব দ্বিধাহীন ভাবে তিনি আধুনিক সাম্প্রতিক এক যুগের রিচুয়ালকেই ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। স্পষ্টতই আজ আমাদের এইসব প্রতীকতা জীবনাঙ্গ হয়ে ওঠে এবং অতীত বর্তমান হয়ে আসে, জীর্ণতার রূপে নয়, জীবিত প্রবাহে চঞ্চল হয়েই, ভবিষ্যতের দিকে শক্তি নিয়ে চলতে শেখা অনুভব। তাই বেদ উপনিষদের শ্লোক, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে সেই দৃশ্য, শকুন্তলার আদলে নায়িকার চরিত্র, আগমনী গান, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী এই সবই ব্যবহারের তীব্র কৌশলের, এবং জাতীয় জীবনের মৌলিক দিক চিন্তায়, শিল্পকর্মে জীবনানুগ প্রয়োগ ও বিশ্লেষণে তাঁর ব্যবহারে আসে। তাঁর বক্তব্য "আমাদের জাতীয় culture complex যে ভাবে constellate করেছে, তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হবার চেষ্টা আমার সব ছবিতেই করেছি।" যেহেতু আমাদের শিল্পের প্রেক্ষাপট প্রয়োজনের বাতাস নেবে জীবন নির্ভর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে, তাই জনজীবনকে আমাদের দেশেরই জনজীবনের আনুপূর্বিক ইতিহাস সচেতনতায় ধরে রাখার প্রচণ্ড প্রয়োজন।

স্মৃতির স্পর্শে বারবার যেন আমরা দেখতে পাই জীবনই শিল্প হয়ে ওঠে। তাতেই প্রয়োজন হয়, এই মুক্তিকে ধরবার জন্যে তথাকথিত অর্থের নিত্য বাস্তবিকতায় রূঢ় দেয়ালটাকে সরিয়ে সেই ভিতে দেশকালকে চিনিয়ে দেবার আয়োজনের মুখরতা। তাই সাম্প্রতিক যুক্তি তক্কো ও গপ্পোতে সেই দৃশ্যটি, যেখানে শালবনে সশস্ত্র যুবকের সঙ্গে তত্ত্ব রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যস্ত ঋত্বিক, এবং সেই মুহূর্তে গুলি লাগে তার শাসকের হাত থেকে ছিটকে এসে, যে যুবকরা এই প্রচলিত ঘৃণ্য সমাজ ব্যবস্থাকে উল্টে দিতে চেয়েছিলেন, তাদের সেই ভয়ানক দুর্দমনীয়তার মাঝখানে তিনি বুঝে নিতে চেয়েছিলেন আন্তরিক অনুষঙ্গ বিশ্বাসেই। এই ঋত্বিকের মৃত্যুতেও কিন্তু শিল্পী ঋত্বিক নবীন জীবনের জয়যাত্রাকে উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিতে শুনে নিয়েছেন। ভালোবাসা এক অমোঘ জীবনকে ত্বরান্বিত করছে জন্ম দিতে। যুদ্ধের ভয়াল-করাল আগুনের তপ্ত তেজের পাশে জন্ম নিচ্ছে সেই ভালোবাসা। পাশাপাশি তিনটিকেই রাখেন ঋত্বিক। যুদ্ধ এবং ভালোবাসা ও জন্ম। মৃত্যুকে এখানেই পরাস্ত হয়ে ফিরে যেতে হয় জীবনের সংগ্রামী সৌন্দর্যের কাছে। সেই জন্ম নিয়েছে এক নবীন জীবন। শব্দে ভরে থেকেছে রাইফেলের অগ্নিস্রাবী অগ্নিময় গুলিবর্ষণ। মৃত্যুর মধ্যেও জীবনকেই দেখে গেছেন ঋত্বিক। তাই তার অনন্ত শবযাত্রার মাঝে আমরা শুনেছি মাঙ্গলিক উলুধ্বনির প্রতীকতা। ভাবনায়, ব্যঞ্জনায় ঋত্বিক বারবার প্রমাণিত করে যান তার জীবনের প্রতি, দেশজ ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির প্রতি, অমোঘ ভালোবাসার কথা। তিনি জেনেছিলেন, রুদ্রের দক্ষিণ হস্তেই বরাভয়। তাঁর এক মুখে পালন, এক মুখে ধ্বংস। এই বোধের গভীরতা, এই অমোঘ চিন্তা তিনি নির্মম নাটকীয়তায়, চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনার গভীরত্বে, নিষ্ঠুর ক্লেদাক্ত বীভৎসতায়, চিত্রশিল্পের নিজস্ব ফ্রেমিংয়ে, কিংবা নিপুণ সাঙ্গীতিকতায় একটি সম্পদশালী তাঁর কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

এই সম্পদশালী ভারতীয় চলচ্চিত্রকে এগিয়ে দিয়েছে জীবনবোধেই, জন্মই জীবন, শিল্প জীবন। বস্তুতঃ সমস্ত মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলি, এবং লেখায় রচনায় অবক্ষয়ী সমাজ ব্যবস্থাকে উল্টে দেবার সংগ্রামী মনস্কতায় ভরে থেকেছে। আত্মভূমি বস্তুভূমি একই ভাবে দুই প্রান্ত থেকে টান দিয়ে মধ্যবর্তী যোগ পথের পথটুকুকেই নিকিয়ে দিয়ে গেছেন শিল্পী ঋত্বিক। এই অংশের মহিমার অন্তর্বিষয় ও বহির্গঠনে ব্যাপকভাবে আমরা বুঝে নিই, সেই লোক স্মৃতির মধ্যেই আছে জন্মই জীবন, শিল্প জীবন, এই সুঠাম ব্যবহার। তিতাস অন্তঃপ্রবাহিত হয়েই চলমান। কালের সঙ্গে, এই আত্মসত্তা বয়ে নিয়ে আসে। আমাদের চোখে স্বপ্ন দেখি অত্যন্ত কষ্টকর জীবন যাপনেও সেই সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে যা ভালোবাসার গৃহে পৌঁছে দেবে। তাই শেষ দৃশ্যে একটি শিশু ভেঁপু বাজাতে বাজাতে সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে চলে, শব্দ আসে তার ঘুনসির সেই ঘণ্টাটা থেকে, টুং টুং টুং। এই শব্দ এই ছন্দ, এই কবিতায় আমাদের শিল্প জীবন, জন্মই জীবন। কারণ, শিল্প অথবা জীবন নিশ্চিত ভালোবাসা নয় এক সুন্দর ভালোবাসার গৃহেই পৌঁছতে চায়।

ঋত্বিক ঘটক আমাদের এই বোধের জবাবটুকুকে এগিয়ে দেন। তাঁর মন্তব্য: "মানুষের জন্যে ছবি করি। মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই। সব শিল্পের শেষ কথা হচ্ছে মানুষ। আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সেই মানুষকে ধরবার চেষ্টা করি। সব শিল্পে যেমন, তেমনি ফিল্মেও কতগুলো গভীরতম ঘটনা খুঁজে বের করতে হয়। আমি মনে করি ছবি একটা শিল্প। এবং যখন শিল্প তাকে দায়ী হতে হবেই। দায়িত্ব মানবের প্রতি। একথাটা ভুললে চলবে না।"

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভুপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(গত সংখ্যার পর)

দৃশ্য—১০১

স্থান—বাঁশ ঝাড়ের কাছে গাঁয়ের রাস্তা।

সময়—দিন।

দুর্গা : অমনি জুতোর পাটিটা গিয়ে ছিটকে পর একেবারে আমাদের পাড়ায়—নয় ?

ছিরু : অঁ !!

দুর্গা : "অঁ" কি গো ? যদি ওটা আনার জন্য দিই—

ছিরু : দুগ্‌গা—

দুর্গা : না না না ছুবো না ছুবো না ছুবো না—যদি তুমি সব পোড়া ঘরের মাল-মশলা এক্ষুণি আবার পাঠিয়ে দাও—তবে আমিও ও জুতো ছুঁড়ে ফেলে দিব—মৌরাক্ষির জলে—

দুর্গার চোখে অমঙ্গলের ছায়া। হঠাৎ সে ছিরু পালের দাড়ি ধরে আদরের ভঙ্গি করে।

দুর্গা : চাঁদ বদন !

আতঙ্কগ্রস্ত ছিরু পালকে পেছনে ফেলে দুর্গা চলে যায় এগিয়ে।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার



অনিরুদ্ধ ও দুর্গা (শমিত ভঞ্জ ও সন্ধ্যা রায়)
ছবি : ধীরেন দেব



উচ্চিংড়ে (কাঞ্চন দে বিশ্বাস)
ছবি : ধীরেন দেব

দৃশ্য—১০৩
স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্সারি।
সময়—দিন।
লং শটে দেখা যায় একদল বাউড়ি সাহায্য-সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে। নারান নামে এক বাউড়ি ছুটে চলে আসে ডিসপেন্সারির কাছে।
নারান : ছিদেম—! ন্যাকা—! নরহরি রে—!
কাট টু।
দৃশ্য—১০৪
স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্সারি।
সময়—দিন।
নারান ছুটতে ছুটতে এসে জগন ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে ঢুকে পড়ে। ঘরের মধ্যে তখন সবাই।
নারান : নরহরি রে—!
নরহরি : কি রে?
নারান : (হাঁপাতে হাঁপাতে) শিগ্‌গির চল্‌...পাল মশাই মাল দিচ্ছে—
নরহরি : এঁ্যা!
নারান : হ্যাঁ। ঘর উঠাবার মাল। কোনো কিছুর দাম নিবে নাই। ভাখ্‌ কেনে—
দুজনেই দরজা দিয়ে বাইরে তাকায়।
কাট টু।
দৃশ্য—১০৫
স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্সারি।
সময়—দিন।
দরজার বাইরে দূরে দেখা যায় একদল বাউড়ি ত্রাণ-সামগ্রী নিয়ে চলেছে।
কাট টু।
দৃশ্য—১০৬
স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্সারি।
সময়—দিন।
রাখহরি : আরে!
নরহরি : তাই তো!
নারান : কি বুললাম · চল্‌
সবাই : চল্‌রে!!
সকলে হুড়মুড় করে চলে যায়।
জগন : (দরখাস্তটা হাতে নিয়ে) এই শোন্‌—শুনে যা—
দৃশ্য—১০৭
স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্সারি।
সময়—দিন।

নারান, রাখহরি, নরহরিরা সবাই-ই ছুটে বেরিয়ে যায় ডিসপেন্সারি থেকে। ন্যাকা শুধু চীৎকার করে বলে—
ন্যাকা : আস্‌চি ডাক্তারবাবু! আপনি লিখেন কেনে—
জগন হাতের কাগজটা নিয়ে এগিয়ে আসে। প্রচণ্ড রেগে ওঠে সে।
জগন : বেইমানের দল!...যত্ত...যত্ত...শালারা—
দরখাস্তটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।
দেবু : (off voice) আরে, আরে, ও কি?
জগন সেদিকে তাকায়।

দেবু পণ্ডিত বাঁশ ঝোপের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে।
দেবু : এই যাঃ!...ছিঁড়ে ফেল্লে!
কাট টু।
জগন ডাক্তার কটমট্‌ চোখে দেবু পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে যায়।
কাট টু।
দেবু পণ্ডিত কিছু মনে করে না। সেও দরজার দিকে এগিয়ে আসে।
কাট টু।

দৃশ্য—১০৮
স্থান—জগন ডাক্তারের বারান্দা ও ডিসপেন্সারি।
সময়—দিন।
জগন ডাক্তার চেয়ারে গিয়ে বসে। টেবিল থেকে একটা পত্রিকা তুলে পড়ার ভান করে।
কাট টু।
দেবু পণ্ডিত দরজার কাছে।
কাট টু।
দেবুর ভিউ পয়েন্ট থেকে জগন ডাক্তার।
কাট টু।
দেবু : আমি কিন্তু তোমার কাছেই এলাম!
কাট টু।

দৃশ্য—১০৯
স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।
সময়—দিন।
ক্লোজ শট্‌। অনিরুদ্ধ বসে গায়ে সরষের তেল মাখছে। সে উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলে—
অনিরুদ্ধ : কেনে?
কাট টু।

দুর্গা উঠোনে বসে আছে।

দুর্গা : এই এ্যা—তো বড় একখানা দা গড়িয়ে দাও দিদি! একেবারে শেলেদা বাঘের ঘাড় অব্দি নেমে যায়! (ঝুপ্ করে বসে পড়ে) কতো পড়বে বলো!

পদ্ম : (ময়লা শাড়ি নিয়ে খিড়কি পুকুরের দিকে যেতে যেতে) ওমা,—অতো বড় দায়ে তুই কি করবি?

দুর্গা : ছি ছি,···রাত বিরেতে একা একা পথে পথে ঘুরি, যদি কখনো কামড়াতে আসে?

পদ্ম : কি?

দুর্গা : ক্যাপা কুকুর!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১০

স্থান—ছিরু পালের গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ছিরু পাল হুঁকো টানতে টানতে রাগে গজরাচ্ছে আর ক্যাপা কুকুরের মত এধার ওধার পায়চারি করছে। উঠোনে এখন অনেক বাউড়ি মেয়ে পুরুষের ভিড়। গরাইকে নিজের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে গর্জে ওঠে—

ছিরু : আর কতো? আর কতো?—এ তো দেখছি ফাঁক করে দেবে!

গরাই : এদিকে আবার বাঁশ কম। কালীকে ফের আনতে পাঠালাম।

ছিরু : (চটে গিয়ে) হ্যাঁ!··আরো বেশী করে বাঁশ আনাও!···আনাও, আর আমাকে—

কথা শেষ হবার আগেই দেখা যায় ভ্যাকা তার বৌ সুন্দরীকে নিয়ে এগিয়ে আসে।

ভ্যাকা : আয় আয় গড় কর্··গড় কর্

দুজনেই ছিরু পালের পায়ে পড়ে যায়।

ছিরু : (বিরক্ত হয়ে) একি! একি!—

ভ্যাকা : (অশ্রুসজল চোখে) আপুনি দেবতা····আপুনি গরীবের মা-বাপ—

ছিরু : এ্যাঁ?

ভ্যাকা : আপুনি মানুষ নন গো,—আপনার ছি-চরণে

আরেক দল লোক এসে ছিরু পালের পায়ে প্রণাম করে।

নরহরি : জয়····জয় হোক্ আপনার

ভ্যাকা : জয়

ছিরু : আরে আরে, ছাড়্ ছাড়্, পায়ে জখম আছে যে!

নরহরি : তা বল্লে শুনব না আজ্ঞা!····জয় জয় হোক আপনার।

নারান : ধনেপুতে লক্ষীলাভ হোক্ গো—

ভ্যাকা : জয় জয় এই চরণের ধুলো হয়ে থাকব গো আমরা।

সকলে : বলো পাল মশাইয়ের জয়।

আরও সবাই ছিরু পালের পায়ে পড়ে।

সকলে : বলো আমাদের পাল মশায়ের জয়।

কাট্ টু।

ছিরু পাল যেন আনন্দ মেশানো অস্বস্তিতে পড়ে।

কাট্ টু।

আরও কিছু বাউড়ি এসে পড়ে তার পায়।

কাট্ টু।

ক্যামেরা ট্রাক ফরোয়ার্ড করে এগিয়ে যায় ছিরু পালের দিকে। মৃদু হাসি তার মুখে। বোকা বোকা শিশুসুলভ ভঙ্গি ছিরু পালের ঠোঁটে। হঠাৎ পাওয়া তার এই পদোন্নতি, সামাজিক সম্মান তাকে বিস্মিত করে তোলে।

ছিরু : মিতে!

গরাই : উঁ?

ছিরু : পেন্নাম করছে!

গরাই : হুঁ···

ছিরু : 'মোড়ল মশাই' বলছে

গরাই : হুঁ

ছিরু : বলছে বলছে ··'জয়'·

গরাই অবাক চোখে মাথা নাড়ে।

ছিরু : (এক মুহূর্ত থেমে) শালাদের····মাথা পিছু পাঁচ সের করে চাল দিয়ে দাও!

গরাই : এ্যাঁ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১১

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্সারি।

সময়—দিন।

জগন : মীরজাফর!····মীরজাফরের ঝাড় সব! বছর বছর বিনিপয়সায় চিকিচ্ছের বেলা জগন ঘোষ! তবু ওটা লিখে রেখেছি····ওষুধের দামও কেউ ঠ্যাকায় না! আর এঁটো পাত চাটবার বেলা ছিরে পাল! হুঃ!···এবারে এলে মারবো লাথি!

দেবু : পারবে?

জগন : দেখে নিও!…এ রাগ বড় সাংঘাতিক…এখন থেকে কোন ব্যাটার উব্‌গারের মধ্যে নেই!

দেবু : যদি বলি অন্ততঃ একটা ব্যাপারে থাকতে হবে!

জগন : মানে?

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—১১২

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

দুর্গা : কি গো, বুঝে না কতো দাম পড়’বে? আগাম দিয়ে এবার উঠি।

দুর্গা উঠে দাঁড়িয়ে ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পয়সা বার করে।

কাট্‌ টু।

অনিরুদ্ধর দৃষ্টি পড়ে দুর্গার দিকে।

কাট্‌ টু।

ক্লোজ শট্‌—দুর্গা।

কাট্‌ টু।

ক্লোজ শট্‌—অনিরুদ্ধ।

কাট্‌ টু।

দুর্গা শেষ পর্যন্ত ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা সিকি বার করে আনে। অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে যায় আর মুচকি হেসে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করে।

দুর্গা : কি দেখচ?…উ?

অনিরুদ্ধ : (সম্বিত ফিরে পেয়ে) কাজ হোক্‌…পরে দিস!

দুর্গা : (নীচু স্বরে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) তখন আবার বেশী নিবে না তো? সুযোগ বুঝে?

অনিরুদ্ধ : যা ভাগ্‌!

দুর্গা খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে। এই সময় দেখা যায় পদ্ম খিড়কি পুকুর থেকে শাড়ি কেচে ঢুকছে বাড়ীতে।

দুর্গা : চল্‌লাম হে কামার বৌ! ফের আসব আবার—

দুর্গা ঝুড়ি তুলে নিয়ে চলে যায়।

ক্যামেরা ট্রাক ফরোয়ার্ড করে অনিরুদ্ধকে ধরে। অনিরুদ্ধ অপস্রিয়মান দুর্গার পথের দিকে তাকিয়ে।

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—১১৩

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে গাঁয়ের রাস্তা।

সময়—দিন।

অসমাপ্ত একটি অন্নপূর্ণার মাটির মূর্তির ওপর থেকে ক্যামেরা পিছিয়ে এলে দেখা যায় একদল লোক মূর্তিটাকে ‘হঁাই—হঁাই—হঁাই—হঁাই’ শব্দ করতে করতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দুর্গা সেই ঝুড়ি হাতে ফ্রেমের মধ্যে ঢোকে।

দুর্গা : ও মা উ কি গো?

বাহক : পাল মশায়ের বাড়ী!…নবান্নের পুজো হবে যে!

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—১১৪

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

ক্যামেরা প্যান্‌ করে দেবু আর জগন ডাক্তারকে ফ্রেমে ধরে।

জগন : কে বল্লে?

দেবু : এইমাত্র শুনে এলাম।

জগন : ছিরু আলাদা পুজো করছে!

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—১১৫

স্থান—ছিরু পালের গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

সেই অসমাপ্ত অন্নপূর্ণার মূর্তিটা বারান্দায় এনে রাখা হয়। ভবেশ এগিয়ে আসে ছিরু পালের দিকে।

ভবেশ : তেল, বুঝলে, বড় তেল বেড়েছিল ঐ পণ্ডিতের!…নৈলে মজলিশে অমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা!

ছিরু : এখন থেকে সব পুজো আলাদা করব।

হরিশ : তবে! তুমি হলে গে গাঁয়ের মাথা…

ছিরু : হ্যাঁ…সকলে পেন্নাম করে—

হরিশ : ওসব পাঁচভূতের ভিড়ে যাবে কেন তুমি?

ছিরু : ঠিক! যাবো কেন?

ভবেশ : (হেসে) তুমি সরে এলে—উদিকের পুজোয় লালবাতি!

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—১১৬

স্থান—জগন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারি।

সময়—দিন।

দেবু : ছিরু নেই বলে…এ্যাদ্দিনের পুজো বন্ধ হয়ে যাবে?…কাল রাতে যখন তুমি আগুন নেবাচ্ছিলে,—মনে হ’ল—গাঁয়ে তো এখনো মানুষ আছে! তাই ছিরুর কাছে ভিক্ষে করতে না গিয়ে আমি তোমার কাছে এলাম।

কাট্‌ টু।

জগন ডাক্তার ভ্রুকুটি করে দেবু পণ্ডিতের দিকে তাকায়।

কাট্‌ টু।

ক্লোজ-আপ—দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

হঠাৎ জগন ডাক্তার উঠে দাঁড়ায় এবং দেবু পণ্ডিতের চেয়ারের কাছে গিয়ে বলে—

জগন : ওঠো।

দেবু জগনের কাঠখোট্টা শুকনো গলায় কথা শুনে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

জগন : ওঠো ওঠো ওঠো!....বাড়ী যাও।

দেবু : (উঠে দাঁড়িয়ে) উঁ?

জগন : পূজো বন্ধ!....ছিরু নেই, অমনি পূজো বন্ধ! কেন? কোথাকার পীর!

দেবু : ডাক্তার!

জগন : বাড়ী গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও গে!.. আমরা সবাই মরে গেছি!.. কঙ্কাল!..আমি এক্ষুণি বেরুচ্ছি সবার কাছে...দেখি তো কার ঘাড়ে কটা মাথা,—পূজো রোখে!...এ্যাঁ—! ছিরু নেই তো পূজো বন্ধ!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১৭

স্থান—ছিরু পালের গোলাঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

গরাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত বাউড়িদের উদ্দেশ্য করে বলে—

গরাই : শোন্.. শোন্ তোরা—পূজোর দিন সবাই সকাল সকাল আসবি। দুবেলা এখানেই পেসাদ পাবি, বুঝলি?

বাউড়িরা : আজ্ঞে আচ্ছা।

গরাই : ও পূজোতে কেউ যাবিনে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১১৮ (গ্রহণ করা হয়নি)

দৃশ্য—১১৯

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

জুম লেন্স নিয়ে ক্যামেরা বাঁ থেকে ডাইনে ট্রলি করলে দেখা যায় উলু ও শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের মেঝেতে বিরাট আলপনা দেওয়া হচ্ছে। নবান্ন উৎসব চলছে।

আম পাতার দড়ি দিয়ে মন্দির সাজানো।

পূজোর যোগাড় তৈরী, কিন্তু পুরুতঠাকুর তখনও আসেননি।

একদল মহিলা ফলমূল নৈবেদ্যর ডালা নিয়ে লাইন করে দাঁড়িয়ে।

দেবু পণ্ডিত ও জগন ডাক্তার সবাইকে নানা কাজের আদেশ দিচ্ছে।

জগন : গণ্ডারের বাড়ীতে ডঙ্কা বাজছে।

হঠাৎ দূরে ঢাকের শব্দ শোনা যায়। সকলে সেদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে ঢাক বাজছে ছিরু পালের বাড়ীতে।

ক্যামেরা ট্রাক ফরোয়ার্ড করে মুখগুলোর ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২০

স্থান—ছিরুর গোলাঘর ও বারান্দায় পূজামণ্ডপ।

সময়—দিন।

ক্যামেরা একদল ঢাকির ওপর থেকে প্যান্ করে দেখায় অন্নপূর্ণার মূর্তি বারান্দার একটা উঁচু বেদীর ওপর রাখা হয়েছে। পূজো হবে।

সিল্কের ধুতি আর চাদর জড়িয়ে আজ ছিরু পালকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। হাত জোড় করে আধবোজা চোখে বলে—

ছিরু : মা—!....মা—!

সঙ্গে সঙ্গে ভবেশ, হরিশ, গরাইরাও বলে ওঠে—

সবাই : মা—!....মা—!

ছিরু পালের মা ঢোকেন ফ্রেমে।

ছিরুর মা : হ্যাঁ রে, মরার চক্কোত্তি পুরুত আর কখন আসবে?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২১

স্থান—ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

একটা রুগ্ন ল্যাংড়া ঘোড়ায় চড়ে চক্কোত্তি পুরুতকে আসতে দেখা যায়। গাঁয়ের একদল ছেলে পেছন পেছন ছড়া কাটতে কাটতে আসছে।

"বাঁ ঠ্যাংটা লটর পটর
ডান ঠ্যাংটা খোঁড়া
বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া—"

পুরুত : এ্যা-ই!...এ্যা-ই ছোঁড়ারা!....ভারী বদ তো!.... যা!....যা ভাগ্....

ওরা সবাই সামনের মাঠটা পেরিয়ে যেতেই পেছনের একটা ঝোপ থেকে পাতু বেরিয়ে আসে। হাতে একটা ভাঙা কঞ্চি।

ছিক পালের বাড়ীতে ঢাকের শব্দ শুনে সে থমকে দাঁড়ায় বিধ্বস্ত চেহারা, অসহায়, ভাবলেশহীন পাতু বায়েন। বাজনার শব্দ শুনে যেন কষ্ট হয় তার, চোখেমুখে কষ্টের ছায়া পড়ে।

হাতের ভাঙা কঞ্চিটা দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে ঝোপঝাড়ে আঘাত করতে করতে সে আবার একই পথে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২২ ও ১২৩ (চিত্রগ্রহণ হয়নি)

দৃশ্য—১২৪

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

লাইনে দাঁড়ানো গ্রামের স্ত্রীলোকরা একে একে তাদের হাতের থালা পুরুতঠাকুরের হাতে তুলে দিচ্ছে।

পুরুত : দাও!...
আর কে?....
এসো এসো, এগিয়ে এসো....

রাঙাদিদি : (থালাটা হাতে দিয়ে) আর এগিয়ে! কেমন পুরুত জানিনে বাপু!

পুরুত : কেনে?

রাঙাদিদি : খুব তো ঘোড়ায় চেপে আসো! উদিকে ঘোড়া যে তোমার আস্তাকুঁড়ে ঢুকে....ঐ দ্যাকো!

রাঙাদিদি আঙুল তুলে দূরের ডোবা দেখায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২৫

স্থান—গ্রামের পুকুর ধার।

সময়—দিন।

ক্যামেরা জুম্ চার্জ করে দেখায় দূরে এক ডোবার পাড়ে পুরুত-ঠাকুরের ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২৬

স্থান—পুরানো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

রাঙাদিদি : মা গো মা!....গাঁয়ের যত নোংরা সব ক্যাৎ ক্যাৎ করে যাচ্ছে গো!

পুরুত : (ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে) ওতে কিছু হয় না!

রাঙাদিদি : এ্যাঁ!

পুরুত : ওতে কিছু হয় না! ও ঘোড়া রোজ সন্ধ্যেবেলা এক ঘটি করে গঙ্গাজল খায়!

রাঙাদিদি : হুঁ! গায়ত্রী জপে না?

রাঙাদিদি সরে এগিয়ে গিয়ে পেছনের মহিলাকে জায়গা করে দেয়। ছকোক্তি পুরুত যেমনি তাঁর হাতের থালাটি নিতে যাবে, off voice-এ শোনা যায়—

দেবু : (off) দাঁড়ান।

পুরুত ঠাকুর সেদিকে তাকান।

কাট্ টু।

দেবু : ওর পুজো নেবেন না!

কাট্ টু।

ক্যামেরা ঘোমটা দেওয়া মহিলা ও পুরুতঠাকুরের ওপর চার্জ করে। পুরুত বিস্মিত। ঘোমটা ঢাকা মহিলা পদ্মবৌ এর দিকে সে তাকায়।

কাট্ টু।

দেবু : (পদ্মকে) তুমি অনিরুদ্ধকে গিয়ে ব'লো, গাঁয়ের লোক পুজো ফিরিয়ে দিলে। এখানে পুজো দিতে হলে আগে চণ্ডীমণ্ডপে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে হবে।

কাট্ টু।

মর্মাহত পদ্মবৌ এর ক্লোজ-আপ।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত দৃঢ়ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। জগন ডাক্তার তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ও বলে—

জগন : তারা, গিরীশ—ওদেরও।

কাট্ টু।

পদ্ম কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অবস্থাটা সামলে নেয়। তারপর, হঠাৎ হাতের থালাটা মাটিতে রেখে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

পুরুত : আরে! ঠাঁইটা....ঠাঁইটা পড়ে রইল যে!

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত পদ্মবৌ-এর যাবার দিকে দৃঢ়ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে লাইনে।

কাট্ টু।

বিলু, ঘোমটা দিয়ে হাতে থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিতের ক্লোজ-আপ।

কাট্ টু।

বিলু চোখ নামিয়ে নেয়। পরিষ্কার বোঝা যায় এই ঘটনায় সে আহত, অসন্তুষ্ট।

কাট্ টু।

ছিক পালকে বিপরীত দিক থেকে আসতে দেখা যায়।

ছিরু : কৈ হে চক্কোত্তি? আর কদ্দুর?

কাট্ টু।

পুরুত : (একটু ঘাবড়ে গিয়ে) এই যে বাবা! এই ক'টা একটু ঝট্‌পট্ সেরেই—

জগন : কেন? অত ঝট্‌পট্ কিসের?....এখনো অনেক আসবার বাকি!.. দেরী হবে।

কাট্ টু।

ছিরু পাল জগন ডাক্তারের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ছিরু পাল অনেক কষ্টে রাগ সামলে নেয়। জগনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ছিরু : বেশ,...তাহলে সময় হলেই যেন আসা হয়—

ছিরু পাল চলে যেতে উদ্যত, এমনি সময় দূর থেকে অনিরুদ্ধর চীৎকার শুনে সে থেমে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে।

অনিরুদ্ধ : কে? কে?....কার ঘাড়ে দশটা মাথা? কোন্ নবাব-বাদশা আমার পুজো বন্ধ করেছে শুনি?

হঠাৎ সে থেমে যায়।

কাট্ টু।

জগন ডাক্তার দেবু পণ্ডিত ও ছিরু পালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

অনিরুদ্ধ : বাঃ!....বাঃ! ভোল-পাল্টানো ধন্বন্তরী মশাই!... খুব খেল্ দেখালে যা হোক! তাই তো বলি, ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে এসে না মিললে যাবে কুথা?

হঠাৎ সে পদ্মর ফেলে যাওয়া পুজোর থালাটা তুলে নেয়। ছুটে যায় মন্দিরের দরজায় এবং থালার চাল-কলা-ফল ছুঁড়ে দিতে থাকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২৭

স্থান—ভাঙা কালীমন্দিরের ভেতর।

সময়—দিন।

ভাঙা কালীর মূর্তির মুখে অনিরুদ্ধর আউট ফ্রেম থেকে ছুঁড়ে দেওয়া চাল-কলা-ফলগুলো এসে লাগছে আর মাটিতে পড়ে যাচ্ছে।

অনিরুদ্ধ : (off) থা....থা...

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২৮

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

অনিরুদ্ধ : থা!....থা!....থা! আর বিচের কর্! যা দেখছিস তার বিচের কর্! ভগবান হইছে!

চাতাল থেকে লাফিয়ে নেমে এসে ছিরু পাল, দেবু পণ্ডিত, জগন ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করতে করতে পিছিয়ে যেতে থাকে অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ : পয়সাওয়ালার মাথায় আমি ঝাড়ু মারি—

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : বিদ্বেনের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি—

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : লাট-বেলাট দেখানেওয়ালাদের মুখে আমি ঝাড়ু মারি—ঝাড়ু।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—জগন ডাক্তার।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : কাউকে গেরাহ্যি করি না আমি! কোনো শালাকে গেরাহ্যি করি না!! দেখি কোন্ শালা আমার কি কত্তে পারে—! ভগবান! ভগবানের ইজারা নিয়েছে সব—

সবাইকে হতবাক করে দিয়ে অনিরুদ্ধ চলে যায় ক্যামেরার বাইরে। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলে না, নড়ে না চড়ে না।

দেবু পণ্ডিত যেন নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। চাপা রাগে, অভিমানে সে ফেটে পড়তে চায়, পারে না। ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে বসে পড়ে দেবু পণ্ডিত। শক্ত করা মুঠো হাতে সে সজোরে আঘাত করে মেঝেতে। ক্যামেরা টিল্ট্ ডাউন করে দেখায় মেঝেতে লেখা রয়েছে—

"যাবচ্চন্দ্রার্ক মেদিনী"

কাট্ টু।

দৃশ্য—১২৯

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর ভেতর ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

জলন্ত কুপির ওপর থেকে ক্যামেরা সরে গিয়ে দেখায় অনিরুদ্ধ খাচ্ছে। পদ্ম তার পাশে বসে যেন চিন্তায় মগ্ন।

পড়শীদের বাড়ীতে কোনো বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। মা তাকে ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে শোনায়।

পদ্ম (হঠাৎ) হ্যাঁ গো!

অনিরুদ্ধ উঁ?

পদ্ম কাল আমায় একটু নিয়ে যাবে?

অনিরুদ্ধ কোথা?

পদ্ম গয়েশপুরের শিবনাথ তলায়।

পদ্ম ফিক্ করে হেসে ওঠে। অনিরুদ্ধ লক্ষ্য করে তাকে।

অনিরুদ্ধ : কেনে? ফের ঢেলা বাঁধবি?

খাওয়া সেরে অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়ায়। বারান্দার ধারে গিয়ে মুখ ধুতে শুরু করে।

অনিরুদ্ধ : আর কতো ঢ্যালা বাঁধবি? তোর ঢ্যালায় ভারে শেষ-অব্দি না বাবা শিবনাথ শুদ্ধু উল্টে পড়ে!

পদ্মর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নীরবে সে এঁটো বাসন তুলতে শুরু করে।

মিক্স ইন্টু।

দৃশ্য—১৩০

স্থান—ছোট শহর।

সময়—দিন, অগ্রহায়ণের তৃতীয় সপ্তাহ।

চালকলের চোঙা থেকে ক্যামেরা পিছিয়ে এসে দেখায় নদীর পারের ছোট্ট শহর।

(চলবে)

Published by Asoke Chatterjee from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANEE, 131B, B. B. Ganguli Street, Calcutta-12. Cover : De-Luxe Printers.

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

দ্বাদশ বর্ষ
দশম সংখ্যা
জুলাই, '৭



চিত্রবীক্ষণ

বিষয়সূচী

সম্পাদক : অনিল সেন

প্রচ্ছদচিত্র : 'কোমলগান্ধার' (ঋত্বিক ঘটক)
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল
অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

কলকাতায় আর্ট থিয়েটার

কলকাতায় আর্ট থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছিল। এই শহরে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ক্রমবিস্তার এই ধরণের এক আর্ট থিয়েটারের সম্ভাবনাকে ক্রমশঃই বাস্তব করে তুলছিল।

সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা এব্যাপারে কার্য্যকরী উদ্যোগ নিয়েছিলেন বেশ কয়েকবছর আগেই, নানা কারণে সেই কার্যক্রম ১৯৭৭ সালের আগে বিশেষ অগ্রসর হয়নি। ১৯৭৭ সালের শেষদিক থেকে সংস্থার পক্ষ থেকে মেট্রো সিনেমায় নিয়মিতভাবে এবং মাঝেমাঝে গ্লোব, ম্যাজেস্টিক ও যমুনা প্রেক্ষাগৃহে রবিবার সকালে চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য আর্ট থিয়েটারের জন্য সংগ্রহ। আনন্দসংবাদ এই যে এইভাবে সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা প্রস্তাবিত আর্ট থিয়েটারের জন্য ১ লক্ষ টাকারও বেশী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। উল্লেখযোগ্য হল রাজ্য সরকার ও কলকাতা পৌরসভা এই অনুষ্ঠানসূচীকে সমস্ত রকম প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

কোনো একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষে এজাতীয় কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করা যথেষ্ট কঠিন সন্দেহ নেই, এবং নিঃসন্দেহে এই পরিকল্পনাটি দীর্ঘমেয়াদী হতে বাধ্য কেননা এই আর্ট থিয়েটার সংগঠনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড যথেষ্ট ব্যয়বহুল।

এতদ্‌সত্ত্বেও সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা-র আর্ট থিয়েটার গঠনের প্রচেষ্টায় অর্থসংগ্রহ-কর্মসূচীর প্রাথমিক অগ্রগতি এক বিপুল সম্ভাবনাকে বাস্তবসম্মত করে তুলছে।

সংস্থা ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে একখণ্ড জমির জন্য আবেদন রেখেছেন। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে আশা রাখি যে সরকার এবিষয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দেবেন। কেননা উপযুক্ত জমি ছাড়া এই পরিকল্পনা সার্থক বা যথাযথ হতে পারে না।

এছাড়াও রাজ্যের চলচ্চিত্র উৎসাহী মানুষ আরো ব্যাপকভাবে এই আর্ট থিয়েটার সংগঠনে প্রত্যক্ষ সাহায্যে এগিয়ে আসবেন এ আশা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবেনা। বিশেষ করে ফিল্ম সোসাইটি-সদস্যদের এই কর্মসূচীকে সার্থক করে তোলার কাজে এগিয়ে আসতে হবে সক্রিয় ভাবে। এভাবে কলকাতা শহরে ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে স্থাপিত আর্ট থিয়েটার হওয়া সম্ভব।

এই প্রস্তাবিত আর্ট থিয়েটার ভালো' ছবির আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলবে, এমন এক দর্শকগোষ্ঠী গড়ে তুলবে যার মধ্য দিয়ে জীবনধর্মী সুস্থ চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী সম্ভব হবে। চলচ্চিত্র নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেও এই আর্ট থিয়েটার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সার্থকভাবে।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারও একটি আর্ট থিয়েটার তৈরী করছেন। প্রাথমিক কাজকর্ম প্রায় শেষ। কলকাতার মত বিরাট শহরে দুটি আর্ট থিয়েটার প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। কাজেই আমরা চাইবো দুটি আর্ট থিয়েটারই হোক এবং তাড়াতাড়ি।

সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার
আর্ট থিয়েটার তহবিলে
মুক্তহস্তে সাহায্য করুন।

চেক পাঠান এই নামে—
Cine Central, Calcutta, A/c, Art Theatre Fund
ও এই ঠিকানায়—
Cine Central, Calcutta
2, Chowringee Road, Calcutta-700013

চিত্রবীক্ষণে

লেখা পাঠান।

চিত্রবীক্ষণ

চলচ্চিত্র বিষয়ক যে কোন

ভালো লেখা

প্রকাশ করতে চায়।

এই বছরে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের চিত্রবীক্ষণে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল সংখ্যায় ভুল করে Vol. 13 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol 12. অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের বদলে দ্বাদশ বর্ষ।

এছাড়া October '77 থেকে September '78 অবধি গোটা বছরের সংখ্যায় ভুল করে Vol. 12 ছাপা হয়েছে এটা হবে Vol. 11 অর্থাৎ দ্বাদশ বর্ষের বদলে একাদশ বর্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বছরে মাত্র তিনটি সংখ্যা বেরিয়েছে অক্টোবর থেকে মার্চ একটি সংখ্যা, এপ্রিল একটি সংখ্যা এবং মে থেকে সেপ্টেম্বর আর একটি সংখ্যা।

* চিত্রবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ টাকা। লেখকের মতামত নিজস্ব, সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে।
* লেখা, টাকা ও চিঠিপত্রাদি চিত্রবীক্ষণ, ২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭৯১১) এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার প্রতি কলম লাইন—৩·০০ টাকা। সর্বনিম্ন তিন লাইন আট টাকা। বাৎসরিক চুক্তিতে বিশেষ সুবিধাজনক হার। বক্স নম্বরের জন্য অতিরিক্ত ২·০০ টাকা দেয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গ্রাহক

* চাঁদার হার বার্ষিক পনেরো টাকা (সডাক), রেজিস্টার্ড ডাকে তিরিশ টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।
* বৎসরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।
* চেকে টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখার ওপর চেক পাঠাতে হবে।
* টাকা পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, কতদিনের জন্য চাঁদা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালে কুপনে ওই তথ্যগুলি অবশ্যই দেয়।

লেখক :

* লেখক নয় লেখাই আমাদের বিবেচ্য। পাণ্ডুলিপি রেখে কাগজের একদিকে লিখে নিজের নাম ও ঠিকানাসহ পাঠানো প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

সমগ্র কলকাতার একমাত্র এজেন্ট

জগদীশ সিং,

নিউজ পেপার এজেন্ট, ১, চৌরঙ্গী রোড,

কলকাতা-১৩

ঋত্বিক ঘটক ঃ

শেষ সাক্ষাৎকার

১৯৭৪ সালের ১৩ই মে বাংলাদেশ ফিল্ম সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মুহম্মদ খসরু ঋত্বিক ঘটকের এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে এই সাক্ষাৎকারটি 'ধ্রুপদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত ঋত্বিক ঘটকের এটিই শেষ সাক্ষাৎকার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'চিত্রবীক্ষণ' এর আগে ঋত্বিক ঘটকের দুটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে।

মুহম্মদ খসরু ঃ মারী সীটন তাঁর এক লেখায় বলেছিলেন আপনি হলেন বাংলা চলচ্চিত্রের 'বিদ্রোহী শিশু'। তাঁর ধারণায় আপনার অতিরিক্ত মননশীলতা আপনার নিজের কিংবা আপনার চলচ্চিত্রের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামত কি?

ঋত্বিক ঘটক ঃ এ সম্বন্ধে আমার কোন মতামতই নেই। কারণ বিদ্রোহী শিশুটা তো বাংলা করা হয়েছে। ওটা আসলে 'infant terrible'। এর কোন বাংলা প্রতিশব্দই নেই। আর ওটা লিখেছিল 'অযান্ত্রিকের' সময়। 'অযান্ত্রিক' হচ্ছে ১৯৫৭-৫৮ সালের ছবি। আজকে চুয়াত্তরে তার উত্তর দেয়ার তো কোন মানে হয় না। আমার কোন কিছু বলার নেই। একজন সমালোচক আমার সম্বন্ধে কি বলেছে তা দিয়ে আমি কি করবো।

মু. খ. শিল্পাঙ্গনের কতকগুলি মাধ্যম পেরিয়ে আপনি চলচ্চিত্রে এসেছেন। যেমন প্রথম জীবনে কবি ও গল্পকার, তারপর নাট্যকার-নাট্যপরিচালক ইত্যাদি এবং অবশেষে চলচ্চিত্রকার। শিল্পমাধ্যমের প্রতি অগাধ মমত্ববোধই সাধারণতঃ শিল্পীকে তাঁর ভাললাগা মাধ্যমের প্রতি টেনে আনে। আপনি 'চিত্রবীক্ষণে'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন "………যদি কাল চলচ্চিত্রের চেয়ে better medium বেরোয় তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব। আমি সিনেমার প্রেমে পড়িনি……… I don't love film………"। এই সব কথার মাধ্যমটির প্রতি আপনার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়না কি?

ঋ. ঘ. একেবারেই পায়না। মাধ্যমটা কোন প্রশ্নই না। আমার কাছে মাধ্যমের কোন মূল্য নেই। আমার কাছে বক্তব্যের মূল্য আছে। আমি কেন এ সমস্ত মাধ্যম change করেছি, বদলেছি? কারণ বক্তব্যটা মানব দরদী। বক্তব্য বলার চেষ্টা বা পৃথিবী সম্বন্ধে জানা বা মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি মমত্ববোধের প্রশ্নটাই প্রথম কথা, সিনেমার প্রতি মমত্ববোধটা কোন কাজেরই কথা না। ও সমস্ত যারা Aesthets তারা করুন গিয়ে। 'Art for Arts sake যারা করেন তারা করুন গিয়ে। All art expressions should be geared towards the betterment of man—for man. আমি গল্প লিখছিলাম, তখন দেখলাম গল্পেতে কাজ হচ্ছেনা। ক'টা লোক পড়ছে? নাটকে immediate hit—আরো বেশী লোককে convert করা যায়। I am out to convert. তারপর দেখলাম নাটকের থেকেও ভাল কাজ হচ্ছে সিনেমায়। অনেক বেশী লোককে approach করা এবং convert করা যায় এতে। So Cinema is important. Cinema as such এমন কোন value নেই। I don't think it has any value. এবং যারা এ সমস্ত কথা বলে তারা সিনেমাকে ভালবাসেনা, নিজেকে ভালবাসে। এ জন্যই কাল যদি একটা better medium পাই তাহলে আমি সিনেমা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। এখন পর্যন্ত আর medium কোথায়! আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত জনতার কাছে পৌছতে পারে এমন medium হচ্ছে Cinema. কালকে TV হতে পারে। এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে সিনেমাই সবচেয়ে বেশী লোককে at the same time reach করতে পারে। কাজেই আমার বক্তব্যের হাতিয়ার হিসাবে একেই বেছে নিয়েছি।

মু. খ. আপনাদের চলচ্চিত্রে আগমন—অর্থাৎ আপনি, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার এরা সাধারণতঃ ইতালীয় 'নিওরিয়ালিজম' দ্বারা অনুপ্রাণিত। যুদ্ধ পরবর্তী ইতালীতে চলচ্চিত্রে যে বিপুল শৈল্পিক উৎকর্ষতা ঘটেছিল তদ্বারা আমার মনে হয় কমবেশী সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পঞ্চাশের শেষভাগে এবং ষাটের দশকে ফরাসী দেশে যে 'নবতরঙ্গ' চলচ্চিত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সে আন্দোলনের ধারা কি আপনাকে আলোড়িত করেছিল? ফরাসী 'নবতরঙ্গ' এবং নবতরঙ্গ গোষ্ঠীর অন্যতম চলচ্চিত্রকার জাঁ লুক গদার সম্পর্কে আপনি কিছু মন্তব্য করুন।

ঋ. ঘ. প্রথম কথা হচ্ছে যে মৃণাল বাবু একদিক দিয়ে এসেছেন, সত্যজিৎ বাবু একদিক দিয়ে এসেছেন আর আমি আর এক দিক দিয়ে এসেছি। এটা কোন একটা আন্দোলন—সংঘবদ্ধ আন্দোলন থেকে আসেনি। যেমন সত্যজিৎ বাবু ছবি সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। রেনোয়া সাহেব যখন এলেন ছবি করতে তখন তার সঙ্গে থেকে তিনি highly influenced হলেন। রেনোয়াই তার গুরু। তিনি নিজেও এটা স্বীকার করেন। নিও-রিয়ালিজমটা তার পরে। আমি সম্পূর্ণরূপে আইজেনস্টাইনের বই পড়ে influenced হয়ে ছবিতে আসি।

১৯৫২-তে film festival-এ যে neo-realistic ছবিগুলো দেখান হয়েছিল সেগুলো আমাদের definitely খুব মোহিত করেছিল, কিন্তু কাকে influence করেছিল আমি ঠিক বলতে পারিনা। কেননা সত্যজিৎ বাবুর ছবিতে রেনোয়া সাহেবের লিরিসিজম এবং ফ্লাহাটির লিরিসিজম—নেচার লাভ এই থেকে তার আরম্ভ। আমার ছবি কারোই বোধহয় না। যদি থাকে আইজেনস্টাইনের আছে। কেননা neo-realistic ছবি আমার 'অযান্ত্রিক' একদমই না। 'নাগরিক'-ও না। 'অযান্ত্রিক' কমপ্লিটলী একটা Fantastic Realism. একটা Car—একটা গাড়ী without any trick shot ওটাকে animate করা হয়েছে। She is the heroine, আর Driver হচ্ছে হিরো। Whole গল্পটা একটা ড্রাইভার আর তার গাড়ী। আর কিছু নেই। এটার সঙ্গে neo-realism এর সম্পর্ক কি? ওটাকে সম্পূর্ণরূপে fantastic realism বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি এবং সে সময় ওটা খুব powerful ছিল। এবং নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকের খুব ভাল লেগেছিল। Unconsciously হয়তো খানিকটা—সেই সারা পৃথিবীর ছবি দেখলেই হয়ে থাকে, যেমন জাপানী ছবি দেখেও হয়েছে।

মু. খ. না, আপনাদের চলচ্চিত্র সৃষ্টির পর পরই ভারতে Subjective Realism-এর শুরু হয় বলে বলা হয়েছে। এ জন্যেই আমি এই প্রশ্নটা করেছিলাম।

ঋ. ঘ. হ্যা, এরকম অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে। এ সমস্ত lebelling এর কোন মূল্য নেই। ওই lebel গুলো lebelই। ওগুলো কোন কাজেরই না। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব পথে চলছে। আর ঐ ফরাসী 'নিউ-ওয়েভ' আমি একেবারে পছন্দ করি না। ওটা একটা Stunt আমার মতে।

মু. খ. আমরা 'নিউ-ওয়েভে'র কিছু ছবি দেখেছি, যেমন ত্রুফোর 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ' কিংবা গদারের 'ব্রেথলেস'। এগুলো দেখে মনে হয়েছে যে এরা একটা আন্দোলনের ফসল।

ঋ. ঘ. 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ'! ওটা নিউ-ওয়েভই না। তবে খুব ভাল ছবি। আর 'ব্রেথলেস' আমি দেখিনি, ওদের যেটা দারুন 'নিউ-ওয়েভ' রেনের 'লাস্ট ইয়ার এট মারিয়ানবাদ', ওটা একেবারে Completely existentialist ছবি। 'নিউ-ওয়েভ'টা কি? লেবেলিং এর ব্যাপারগুলো কাটো তোমরা পথের থেকে। তোমরা নতুন করে ছবি ভালবাসতে এসেছো। এই লেবেলগুলো হচ্ছে অত্যন্ত false-critic দের তৈরী। লেবেলিং বলে কিছু নেই। একটা অবস্থা থেকে একটা পটভূমি থেকে এখন তোমাদের ঢাকায় নতুন ছবি শুরু হবে। তোমাদের এখানকার শিল্পীরা পৃথিবীর ছবি দেখে তার থেকে influenced হবে যেমন, তেমনি এদেশের ইতিহাসের যে পটভূমি তাদের suffering sorrow-র যে পটভূমি—তা থাকতে বাধ্য। তার থেকে নাম লেবেল করার দরকারটা কি? এক একজন এক এক দিক থেকে করবে। I don't believe in names.

মু. খ. বেশ, আপনি গদারের ছবি সম্পর্কে কিছু বলুন।

ঋ. ঘ. গদার কি new wave নাকি? Godar is an utter communist film maker, এবং একেবারে bold. He believes in street—fight from the street—এই তো বক্তব্য তাঁর। সে 'নিউ ওয়েভ' মোটেই না। আর সেও বদলাচ্ছে তো। তাঁর last statement গুলো কি? ত্রুফোর সাথে গদারের কোথায় মিল? আঁলা রেনের সাথে ক্লুব গ্রিবের কোথায় মিল?

মু. খ. ফর্ম-এর দিক থেকে কিছু মিল থাকতে পারে।

ঋ. ঘ. তা হলেতো সব ছবিতেই কিছু কিছু মিল পাওয়া যাবে। ফর্ম-টর্ম কিছু একটা ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে Content—Approach. তার থেকে expression টা আসে। form টা শুধু expression-এর জন্য। যেমন গদার completely একজন working communist. সে ভেবেছিল গল্পের কোন value নেই। এই ছিলো তার stand. এখন সে বলছে যে, না গল্পের দরকার আছে। এখন he has changed, লোকে অভিজ্ঞতা থেকে, নিজের ছবি দেখে, পৃথিবী দেখে, তার ছবি দেখে অন্যের reaction দেখে আস্তে আস্তে বদলায়। যে আমি 'অযান্ত্রিক' করেছিলাম, সে আমি কি আছি? সত্যজিৎ বাবুর 'সীমাবদ্ধে'র সাথে 'পথের পাঁচালী'র কি মিল? 'অশনি সংকেত'-এর সাথে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটা শট-ফটে মিল থাকতে পারে, আর কি মিল?

মু. খ. কোন এক লেখায় বার্গম্যানকে আপনি নকলনবীশ বলে উল্লেখ করেছেন।

ঋ. ঘ. জোচ্চোর বলেছি।

মু. খ. আপনি বলেছেন বার্গম্যান সব জিনিসকে খানিকটা ভাইকিংসদের ফিলসফির সঙ্গে মিলিয়ে চালাবার চেষ্টা করেন যাকে আপনি চমক্ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না। আপনি 'তিতাস'-এর শুটিং চলাকালীন এক সময়ে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন বার্গম্যান হল শিল্পের জোচ্চোর। আপত্তি না থাকলে বার্গম্যান সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণাটা একটু বিশদভাবে বলুন।

ঋ. ঘ. বার্গম্যান সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়। বার্গম্যানকে দু'একটা ছবি ছাড়া আর সব ছবিই মধ্যযুগ, আদি মধ্যযুগ ক্রুসেডের পিরিয়ড এবং তারো আগের পিরিয়ড এগুলো নিয়েই সৃজিত হয়েছে। কেন হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে সুইডেন হচ্ছে one of the last countries to be christianised. সুইডেনে বিশেষ করে whole Scandinevia

তে Viking philosophy যেমন মারামারি, হানাহানি ইত্যাদি একটা খুব vigorous ব্যাপার ছিল। তার সঙ্গে লড়াই করে ঢুকতে হয়েছে Christianity-কে। এখনও সেই Conflict-টাকে althrough refer back করে contineously। যেমন 'Virgin Spring, Virgin Spring-টা কি? আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে একটা চার্চ স্থাপন করে তার পিছনে একটা মিথ্যা গপ্পো তৈরী না করলে তো লোককে আর টানা যায় না। সেই জন্যই গপ্পো ফাঁদা হয়েছে যে একটা বাচ্চা মেয়ে raped হয়েছিল but she was so innocent যে সেখানে একটা spring grow করলো, এবং সেখানে বিরাট করে Cathedral তৈরী শুরু হলো। এখন এর পেছনে একটা গল্প তৈরী করতে না পারলে তো পুরুতদের জমবে না। সেই জন্য একটা গল্প তৈরী করা—সে মেরে কেটে যেন তেন—আসলে কিছুই না। আসলে হচ্ছে যে একটা emotional surcharge না করে তো আর Pagan philosophy কে আনা যাবে না। লোকের মধ্যে ঐ জায়গায় একটা পীর, ওখানে একটা দরবেশ, এখানে একটা গুরুদেব এই সমস্ত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে—উনি ছিলেন সেখানে, কাজেই এটা হয়েছে। এই যে গল্প—এগুলো কি? What is this 'Seventh Seal'? Terrific. জোচ্চোর বলেছি এই জন্য—জোচ্চোর তো আর যাকে তাকে বলা যায় না। জোচ্চোর কাকে বলবে, One of the supreme brain, one of the supreme technician যে জেনেশুনে বদমাইশি করছে। গাধাদের কাছ থেকে তো এটা আশা করা যায় না—যে জোচ্চোরি করতে জানে না। If he does not know the truth, he cannot cheat. So knowing fully well he is cheating. Do you follow me? সেই জন্যই তাকে জোচ্চোর বলেছি।

মৃ. খ. কিন্তু তার কিছু কিছু ছবি যেমন ধরুন 'Soul' ব্যতিক্রমধর্মী মনে হয়।

ঋ. ঘ. Terrific ছবি। শুধু 'Soul' কেন, 'The Face' ও Terrific ছবি। শেষটায় আমার মনে হয় যেন ego থেকে বেরিয়ে এসে খানিকটা আজকের agony কে ধরার চেষ্টা আছে। 'Silence' ও তাই। বলছি যে series of film যেমন 'Winter light', 'Wild strawberries'-christian philosophy র সেই ডাক্তার—সেই স্টিগমেটারের চিহ্ন, ক্রসের চিহ্ন, সিম্বল সমস্ত কিছু Biblical। এই জিনিষগুলিকে I don't like.

মৃ. খ. এটা তো Social Consiousness এর ব্যাপার।

ঋ. ঘ. এখানে social consciousness কোথায়? Seventh century কি Eighth century-র Sweeden এর সাথে আজকের সুইডেন এর কোন সম্পর্ক আছে? social consciousness এর মানে কি? একথার বললাম সেটা একটা কথা। তা করছে তো। পাসোলীনি করেনি? 'Gospel According to St. Mathews' সম্পূর্ণ Biblical কিন্তু কি terrific ভাবে সেটা আজকের context এ টেনেছে। কাজানজাকিস, কাকোয়ানীস এরাও তো ক্রিশ্চিয়ান myth গুলো নিয়েই ছবি করেছেন এবং আজকের context এ টেনে। কিন্তু এ ব্যাটা শুধু পেছনের দিকে নিয়ে যাবারই চেষ্টা করছে। এঁরা ঐতিহ্যটাকে টেনে আজকের দিনের সঙ্গে তার মানে তৈরী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আর এ ভদ্রলোক চেষ্টা করছেন আমাদের পিছনমুখী করতে একই জিনিস—ওটা আমি কেন করব না। আমি করতে পারি—আমিও কি রামায়ণ, মহাভারতের গল্প করতে পারি না? করা মানে, আমি কি করবো ওটাকে ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। মোটেই না। ওখান থেকে টেনে আমাদের ঐতিহ্যের অংশ আমাদের দেশের কাজেই তাকে আমার টানার সমস্ত অধিকার আছে। এদের সবাইকে আমি দেখিয়েছি আমার ছবিতে। আমি দেখাচ্ছি যে এই হচ্ছে ছবিটুকু।

মৃ. খ. সে ক্ষেত্রে আপনার নিজের তো বক্তব্য থাকতে পারে।

ঋ. ঘ. আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হাজার বছর ধরে আমার চাষী বসে আছে। আর তোমরা নেচে কুঁদে যাচ্ছ। সকলে নচ্ছার। ছবি আরম্ভ হচ্ছে এক বুড়োকে দিয়ে। আর কিছু নেই। শেষ ও হয়েছে সেই বুড়োকে দিয়ে। বুড়ো বসেই আছে। সে কাশছে। কি করবে? আর দাদারা সব করে যাচ্ছে। বাকতাল্লা বাজিয়ে বড় বড় কথা, হ্যান ত্যান। সকলেই দেশের মুক্তি আন্দোলন পকেটে করে বসে আছে। কি করে মুক্তি আসবে? কি করে সব কিছু হবে? সকলে জানে—সব ডাক্তার। সব গদীর জন্য দৌড়োদৌড়ি করছে। এই তো বক্তব্য আমার। আমি এটা as a common Citizen of India who has gone through all these things, এর point of view থেকে দেখছি। No political issues. Universal প্রবলেম। সেটা হলো এই জন্য যে ওরা আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমি জানিনে solution, আমার কাছে কোন Theory নেই।

মৃ. খ. এটা এক ধরণের exposition. কিন্তু আপনার নিজের একটা বক্তব্য থাকতে পারে তো?

ঋ. ঘ. সুইডেন-এর Definitely অধিকার আছে করার। Crusades, প্রথম Christianity advent Pagen, philosophy এগুলো সম্পূর্ণ ওর সম্পত্তি। কিন্তু সে সম্পত্তি-

টাকে তুমি কিভাবে ব্যবহার করছো ? যেহেতু সে extremly powerful—One of the greatest film maker of the world. সে জন্যই ও কথা বলা হয়েছে। একটা হেজী, পেজী, Tom, Dick and Harry কে তো আর কেউ জোচ্চোর বলবে না। That fellow does not know, বুঝেছ ঃ

মু. খ আপনার নিজের লেখা কাহিনী নিয়ে ছবি 'যুক্তি, তক্কো ও গপ্পো' কে সরাসরি পলিটিক্যাল ছবি বলতে চেয়েছেন। পলিটিক্যাল ছবির যদিও কোন নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই তথাপিও কি মৃণাল সেনের মত কোন বিশেষ একটি মতবাদ কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শ ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হবেন, নাকি অন্য কিছু ?

ঋ. ঘ. না, ব্যাখ্যার কথা না। ওতে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭২ সালে পশ্চিম বাংলার যে রাজনৈতিক পটভূমি এবং সেটাকে আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তা চিত্রায়িত করা হয়েছে। তাতে কোন মতবাদের ব্যাপার নেই। আমি সেটাকে দেখেছি from a point of view of not a politician. Political কোন মতবাদকে যেমন Navalite মতবাদ আমার please করার কথা না, ইন্দিরা গান্ধীকে Please করার কথা না, CPM কে please করার দরকার নেই CPI কেও please করার দরকার নেই— আমার থাকলেও ছবিতে আমি স্লোগানে বিশ্বাস করিনা। ওর থেকে যদি emerge করে, through situation, through conflict একটা কিছু যদি তোমাদের mind এ আসতো এলো। কিন্তু আমি এইটেই soiution বলতে পারি না।

মু. খ. অবশ্য এটা কোন ছবিতে আপনি বলেন নি।

ঋ. ঘ. না বলা যায় না। আমি তো মনে করি বলা উচিতও না কিন্তু এগুলোকে ধরা উচিত, কারণ আমি চোখের পরে দুঃখের কটাক্ষ তো দেখছি।

মু. খ. আপনার প্রায় সব ছবিতেই একটা Optimism লক্ষ্য করেছি। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

ঋ. ঘ. ও সমস্ত অপটিমিজম্-টপটিমিজম্ বুঝি না। মোদ্দা বাংলা হচ্ছে—এই হচ্ছে যুক্তি-তক্কো-গপ্পো। একে যদি তোমরা political বলো তো political, non-political বলো তো non-political. But no slogan, no party-বাজী, Universal Condemnation. আমার কিছু বক্তব্য নেই। I am not a political man, আমি politics করি না। কাজেই কোন party করি না। কিন্তু চারপাশে আমি reality দেখেছি তো।

মু. খ. আপনি কি কোন 'ইজমে' বিশ্বাস করেন ?

ঋ. ঘ. আমি কিসেতে বিশ্বাস করি সেটা আমার অন্য জায়গায়। As an artist আমি সেটাকে চাপাতে চাইনা। আমি mainly present করতে চাই যে এই ব্যাপারগুলো হয়েছে। এখন তুমি decide করো।

মু. খ. তার মানে আপনি কোন ideology impose করতে চান না।

ঋ. ঘ. Automatically থাকবেই ভিতরে, কিন্তু সেটা সোচ্চার নয়। তোমরা 'সুবর্ণরেখা' দেখনি ? এতে ideology নেই ? এতেও থাকবে।

মু. খ. হ্যাঁ দেখেছি। ভীষণ আশাবাদী ছবি।

ঋ. ঘ. আশাবাদ ছাড়াও ideology একটা definitely আছে। Analysis of the condition of the then West Bengal. তার পরে একটা comment আছে তো ? এখানে ও একটা comment থাকবে। আর সেই Comment টা দিয়ে আমি একটা slogan mongering বা ঐ সমস্তের মধ্যে নেই।

মু. খ. ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন যাদের টাকা দিচ্ছে আর যারা এফ, এফ, সি-র টাকা পাচ্ছে না এ নিয়ে দুটো গ্রুপ তৈরী হয়েছে। তাঁদের বক্তব্যও দু'রকম। এফ, এফ, সি-এ পক্ষপাতিত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রকাররাই এফ, এফ, সি-র অর্থ সাহায্য পাচ্ছেন। নতুনরা যারা ভাল ছবি করতে চাইছে তারা তাদের স্ক্রিপ্ট নিয়ে দেন-দরবার করতে করতে উৎসাহ ধৈর্য্য দুটোই হারিয়ে ফেলছে। এতে এফ, এফ, সি-র দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে না ? তা হলে আর ভালো ছবি সৃষ্টিতে এফ, এফ, সি-র ভূমিকাটা রইলো কোথায় ?

ঋ. ঘ. FFC এ পর্যন্ত অন্ততঃপক্ষে, আমি ঠিক exactly এর পরিসংখ্যানটা বলতে পারবো না, তবে জন্ম থেকে গোটা ষাটেক ছবি finance করেছে। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলতে কি আগে যাদের নাম ছিল এমন লোকের মধ্যে একমাত্র মৃণাল সেন এবং আমিই সাহায্য পেয়েছি। আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে কেউ পায় নি। আর প্রতিষ্ঠিত সব নতুন নতুন ছেলে তাদের মধ্যে more than 75·/. যারা ছবি করতে গিয়েছিলো টাকা মেরে পালিয়েছে। Straight টাকা মেরে হাওয়া হয়েছে। যেমন একজনের নাম বলছি অচলা সচদেব বলে একজন actress আছেন তার স্বামী জান সচদেব। আড়াই লাখ টাকা advance নিয়ে বসে আছে। ফেরত নেওয়ার কোন উপায় নেই। এইভাবে সয়লাব করছে। আর তারা যে নতুন ছেলেদের টাকা দেয়নি তা না। আমারই student, Gold medalist from Film Institute of poona মনি কাউলের দু'দুটো ছবিকে finance করেছে এবং ওর দুটো ছবিরই যথেষ্ট নাম হয়েছে। He has established himself, not only

that, এ বছর ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যে সেমিনার হয় সেখানে Jury হয়ে সে গিয়েছে। এতকিছু সম্মান সে পাচ্ছে। কুমার সাহানীকেও FFC একটা ছবি করতে দিয়েছে। সে ছবিটা এখনো release হয় নি। কে বলেছে নতুন ছেলেদের দেয় না? একজন দু'জন এখানে ওখানে তড়পে বেড়াচ্ছে। এখানকার মধ্যে আমি কিন্তু যতদূর জানি পূর্ণেন্দু পত্রীকে ওরা দেয় নি। সে জন্যই এতসব ব্যাপার। কিন্তু He is not a new director. সে 'স্বপ্ন নিয়ে' বলে একটা ছবি করেছিলো। তারপর এখন 'স্ত্রীর পত্র' করেছে। কাজেই তাকে—You cannot say, he is a new one.

মৃ. খ. কিন্তু তার অভিযোগটা খুব বড় করে দেখান হয়েছে।

ঋ. ঘ. সেটা আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপ। Because he works in আনন্দবাজার। তারা ওটা নিয়ে নাচানাচি করেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনের কিস্সু যায় আসে না। আনন্দবাজার তো হচ্ছে একটা fascist organisation. Fascist ও নয় CIA agent।

মৃ. খ. এটা কি Off the record না কি?

ঋ. ঘ. Off the record কেন, on the record. I shout from the house tops, from the house tops to the streets. আজকে তোমাদের এখানে off the record করতে যাব কি জন্য?

মৃ. খ. পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে ক'বছর ছিলেন? সেখানে শিক্ষক থাকাকালীন অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন।

ঋ. ঘ. এটা কে বললো, আমি ছিলাম মানে? পুনায় আমি visiting Professor হিসাবে দু'বছর জড়িত ছিলাম। প্রত্যেক দু'মাস পর পর যেতাম। দশদিন করে থাকতাম—চলে আসতাম। তারপর আমি Vice-Principal হিসাবে মাত্র তিন মাস ছিলাম। পুনায় আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আমি মনে করি আমার জীবনে যে কয়টা সামান্য ছবি করেছি সেগুলি যদি পাল্লার একদিকে দেয়া হয় আর, মাস্টারিটা যদি আরেক দিকে দেয়া হয় তবে ওজনে এটা অনেক বেশী হবে। কারণ কাশ্মীর থেকে কেরালা, মাদ্রাজ থেকে আসাম পর্যন্ত সর্বত্র আমার ছাত্র-ছাত্রী আজকে উঠছে। I have contributed at least a little in their luck which is much more important than my own film making, আমি বলছি তো ওটা অনেক বেশী।

মৃ. খ. পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে আপনার ছাত্রদের মধ্যে কুমার সাহানী 'মায়া দর্পণ' এবং মনি কাউল 'উসকী রোটী' ছবির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে আপনি দারুণ গর্বিত। পুনা থেকে পাশ করা কে, কে, মহাজনও আপনার ছাত্র যে এখন সবচাইতে প্রতিভাবান আলোকচিত্রী। আপনি শিক্ষক থাকাকালীন পশ্চিম বাংলার কোন ছাত্র-ছাত্রী কি পুনায় ছিল না যাদের প্রতিভা উপরোক্ত শিল্পীদের সাথে তুলনা করা চলে?

ঋ. ঘ. ছিলো। বেশ কয়জন ছিলো। ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে ধ্রুবজ্যোতি বসু ও সোমেন বলে দুটো ছেলে ছিল এবং এরা দু'জনেই সুযোগ সুবিধা পেলে মহাজনের থেকে খারাপ কাজ করবে না। ব্যাপার হচ্ছে ফিল্ম লাইনে ভাল কাজ জানলেই তো আর নাম করা যায় না। প্রতিযোগিতাও করা যায় না। মহাজন lucky যার ফলে সে একটা ভাল break পেয়ে গিয়েছে। এরা break এখনো পাচ্ছে না তাই ডকুমেন্টারী ফকুমেন্টারী করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এদের কাজ খুব ভাল।

মৃ. খ. দেশভাগ অর্থাৎ ভাঙা বাংলার প্রতি আপনার যে মমত্ববোধ সেটা আপনার ছবির একটা বিশেষ দিক। অন্তত সে কারণেই আপনার বিষয়গত ভাবনা সমন্বিত ট্রিলজী 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমলগান্ধার' আর 'সুবর্ণরেখা'। আপনার মতে আমাদের এই ভাগ হয়ে যাওয়াটার কারণেই আজকের এই অর্থনৈতিক সংকট। স্বাভাবিক ভাবে তাই আপনার ছবিতে কিছু রাজনৈতিক সমস্যাও আলোকিত হয়। আপনি কি ভাবেন না ভাবেন সেটা বড় কথা নয়, আপনার ছবিটাই বলে দিচ্ছে এই হয়েছে বলে এ রকম হচ্ছে, এই না হলে হয়তো অন্য রকম হতো ইত্যাদি। বেশ বোঝা যায় আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আপনার ব্যথাটা কোথায়। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আপনি সেরকম একটা ছবি করলেন না কেন? বিষয়বস্তুর দিক থেকে আপনি 'তিতাস' কে বেছে নিলেন কী কারণে? এ ছবিটা তো আরও পরে হতে পারত। কেননা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আপনার পূর্বেকার চিন্তা ভাবনাগুলো আরও উন্নতভাবে প্রকাশ পেতে পারত।

ঋ. ঘ. যখন আমার তিতাস করার কথা আসে তখন এ দেশটা সবে স্বাধীন হয়েছে। এবং most unsettled। এখন যে খুব একটা স্বাধীন হয়েছে তা মনে হয় না। কিন্তু তবু যখন একেবারে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কি চেহারা নেবে। সব শিল্পই দু'রকম ভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে খবরের কাগুজে শিল্প। সেটা করতে পারতাম। আরেকটা হচ্ছে উপন্যাস—যেটা lasting value। সেটার জন্য থিতোতে দিতে হয়। নিজের মাথার মধ্যে অভিজ্ঞতা খরচা করতে হয়। Time দিতে হয়—ভাবতে হয়। It takes two-three years, four years and then only you can make such a film, otherwise you cannot be honest. তুমি খবরের কাগুজেপনা করতে চাও করতে পারো। আমি খবরের কাগুজে তো নই। আমি অনেক গভীরে ঢোকার চেষ্টা

করি। কাজেই তখন ফট করে এসে—পঁচিশ বছর যেখানে আসিনি, সেখানে এসে কিছু বুঝতে না বুঝতে নাড়ীর যোগ না করতে করতে দেশের মানুষকে গঞ্জে, বন্দরে, মাঠে, শহরে যাদের দেখিনা, জানিনা, চিনিনা—আমি পাকামো করতে যাব কোন দুঃখে? আমার কোন অধিকারই নেই। এই হচ্ছে এক। আর দু' নম্বর হচ্ছে তখন condition কেমন fast changing এটা, ওটা, সেটা, নানা রকম তার মধ্যে থেকে একটা Pattern আস্তে আস্তে বেরোক। আমি ভাববার সুযোগ সুবিধা পাই। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হোক বারে বারে। আস্তে আস্তে ঠিক সময়েই ওটা হবে। আর ফরমায়েস দিয়ে শিল্প হয় না। তুমি হুকুম দিলে 'দরবেশ' খাব, কি 'রাঘবশাহী' খাব কি 'রস কদম্ব' খাব তা নয়। 'দে দাও মরণ চাঁদের' এ ব্যাপারটা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার ভেতরে থেকে যখন ইচ্ছে আসবে তখন করবো। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সেইটে করার পক্ষে তিতাস-টা ছিল আমার পক্ষে আইডিয়াল। কারণ তিতাস ছিল একটা subject যে subject মোটামুটি যে বাংলাটা নেই তার। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার বাংলা। তার উপর তো পটভূমিটা। এর subject-টা এমন যা বাংলাদেশের সর্বত্র ঘোরার সুযোগ দেয়—গ্রাম বাংলাকে বোঝার সুযোগ দেয়। গাঁয়ে গিয়ে shooting করাটা বড় নয়। shooting করার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের সাথে মেশা, নাড়ীর স্পন্দনটাকে বোঝার চেষ্টা করা। কাজেই তিতাস-টা একটা অজুহাত এদিক থেকে। এবং ঐ অবস্থায় তিতাস ধরে করলে হয় কি—সেই মাকে ধরে পূজো করা হয়। তা এতগুলি কারণেই এই তিতাস পরে হতে পারত না। এখনো তিতাস আমার একটা study আর আমার একটা worship হিসাবে দেখা যেতে পারে। This river, this land, this people এদের মধ্যে যাবার একটা ব্যাপার আছে, আবার আছে এর সঙ্গে নিজেকে re-establish করা। আর শেষ হচ্ছে ও সময়ে ওটা time ছিল না এবং time এখনো আসে নি। এখনো serious study করে serious work যেটা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে লোকে দেখে কিছু বুঝবে, সেরকম ছবি করার অবস্থা এখনো আমার আসে নি। মানে আমি এখনো এতটা বুঝে উঠতে পারি নি—কোন দিকে যাবে ইতিহাস। আমি যেদিন তাগিদ বোধ করবো, আমি ঠিক জুড়ে দেব। বুঝতে পেরেছো?

মু. খ. আপনি তো বাংলাদেশে একটা ছবি করলেন। এখানকার অভিনেতা অভিনেত্রী কলাকুশলী এবং যান্ত্রিক আয়োজন নিঃসন্দেহে ভাল ছবি তৈরীর পক্ষে যথেষ্ট। তা নয়ত তিতাসের মত মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হতো না। তবু কেন বাংলাদেশে ভাল ছবি হচ্ছে না? বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে যতটুকু জেনেছেন তাতে কি মনে হচ্ছে আপনার? গলদটা কোথায়?

ঋ. ঘ. আমার জানা নেই। কারণ আমি এতো ভালো করে জানিও না। আর এ কথা আলোচনা আমার কি করা উচিত?

মু. খ. আমাদের একটা suggestion হিসাবে যদি কিছু বলেন, আমরা যারা আছি তাদের প্রতি আপনার একটা উপদেশ অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনি তো ইণ্ডাস্ট্রিতেও কিছু দিন ছিলেন।

ঋ. ঘ. Suggestion হচ্ছে, এখানে ছবি না হওয়ার কারণ হচ্ছে যে পঁচিশ বছর ধরে তোমাদের দরজায় কুলুপ দিয়ে রাখা ছিল। কিন্তু সে দেখতে, শিখতে কিংবা পড়তে দেওয়া হয় নি। Somehow this has happened. হঠাৎ দরজা খুলেছে। এখন এই সুযোগটা গ্রহণ করে তোমাদের উচিত, যে করে পারো Film Society Movement করার সাথে সাথে একটা পাঠাগার তৈরী করা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ film সম্পর্কে বই, ম্যাগাজিন এবং ক্লাসিক বইগুলো জোগাড় ক'রে নিজেরা পড়াশুনা করো। আসলে জিনিষটা হচ্ছে যে Serious attitude টা develop করা উচিত। কিন্তু attitude develop করতে যেটা আমরা করেছিলাম সেটা হচ্ছে পড়াশুনা। কারণ আমাদের কারোই মুরোদ ছিল না film করি বা বিদেশের ছবি দেখি। ঠিক এই অবস্থা ছিলো কলকাতার, তা ১৯৪৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত। ১৯৫০-এ শুরু হলো আমাদের World ক্লাসিক্‌স এবং অন্যান্য ভালো ছবি দেখা, যদিও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন (Calcutta Film Society) শুরু হয়েছে ১৯৪৮ থেকে। তার আগে আমরা কি করেছি? আমরা তার আগে কোথায় আইজেনস্টাইনের Film Form, Film Sense, পুদভকিনের Film Technique & Film Acting, ক্রাকাওয়ের, এবং পল রথার বই জোগাড় করে, রজার ম্যানভিলের বই জোগাড় করে, পড়ে, বুঝবার চেষ্টা করে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি, তারপর ছবি পেয়েছি এবং দেখেছি। আমাদের এই চেষ্টাটা Film Industry-র completely বাইরে ছিলো। আমরা সকলেই ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে জড়িত ছিলাম। যেমন আমি Assistant Director ছিলাম, আমি গল্প লেখকও ছিলাম আবার এ্যাকটিংয়েও ছিলাম। কিন্তু সেটা ছিলো একটা দিক। কারণ ওখানে এসব কথা বললে হাসতো আজকের মত। একই, কোন তফাৎ নেই। নিজেদের individual চেষ্টায় বা বন্ধু বান্ধবরা কয়েকজন মিলে এদিক ওদিক করতে করতে এক আধটা বই নিয়ে, পড়ে, আলোচনা করে বোঝবার চেষ্টা করো। এই করতে করতে বছর খানেক বা বছর দুয়েকের মধ্যে একটা আন্দোলন দানা বাঁধলো। তখন society তৈরী করার একটা অবস্থা তৈরী হলো। এই ভাল ছবির movement-টা, সত্যিকারের সৎ ছবির movement টা এই commercial world এর বাইরে করতে হয়। পরে commercial world-এ তার

effect পড়ে এবং সেখানে আঘাত করার প্রশ্ন আসে। কিন্তু আঘাতটা করবে কে? অপ্রস্তুত সেপাই কতগুলো—হাতে ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার—তাতে আর করতে পারবে না, তাদের তো complete mental preparation থাকা উচিৎ। আর ভেতরে কি আছে সেটার দরকার নেই। সব পৃথিবীতেই সমান আর কী।

মু. খ. উভয় বাংলার মানুষদের নিয়ে তো আপনি যথেষ্ট ভাবেন। আপনার চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতেও তারই পদচারণা। এখন এই যে দু'দেশের মধ্যে চলচ্চিত্র বিনিময় এবং যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র সৃষ্টির কথা উঠেছে, এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন।

ঋ. ঘ. করা উচিত। যত বেশী পারা যায় যৌথ প্রযোজনায় ছবি করা উচিত। আদান প্রদান হওয়া উচিত। যাওয়া আসা উচিত। মেশা উচিত। এটা তোমাদেরই করতে হবে। পৃথিবীর কোন দেশেই সম্পূর্ণভাবে আশা করা যায় না যে এ সমস্ত ব্যাপারে সরকারী আমলাদের সাহায্য পাওয়া যাবে। কোন জায়গায় কোন Film Society, কোন Film Movement, কোন Art movement কোনদিন bureaucrat দের দিয়ে হয়নি। এরা একটা চেহারা করে পাঠাবে, আবার তারা ওখান থেকে একটা চেহারা করে পাঠাবে। এ চলবেই, এগুলো inevitable। কতগুলো ব্যাপার, তোমাদের দল বেঁধে যাওয়া উচিত কলকাতায়, গিয়ে ঘুরে দেখা উচিত। কিছু বই পড়া উচিত, কিছু মেশা উচিত। আবার ওখান থেকে ছেলেপেলে এখানে আসা উচিত। ঠিক same. আর একটা পথ হচ্ছে ঐ joint production. ওখান থেকে কিছু ছেলে কিছু কর্মী এলো, তোমরা কিছু জুটলে। ঠিক এগুলোই হওয়া উচিত। কিন্তু এগুলো করার জন্য যদি মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাক! নিজেদের মধ্যে জোর আনতে হবে, পরে সরকারকে convince করতে হবে। যেমন Indian Government এখন আর এই media-র গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারবে না। যার জন্য তার, FFC তৈরী করতে হয়েছে, Film Institute তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তার আগে কত বছরের চেষ্টায় তাদের মনে এই seriousness টা ঢোকাতে হয়েছে, নইলে প্রথম দিন বললে কেউ দিত নাকি? '48-এ ভাবতে পারত নাকি কেউ যে সরকার টাকা দিচ্ছে, ব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে Film কে।

মু. খ. FFC আর Film Development Board-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

ঋ. ঘ. কলকাতায় West Bengal Film Development Board—সেটা Provincial আর এটা হচ্ছে All India থেকে। Development Board টা সবে হয়েছে, ওটার কোন কাজ-টাজ নেই।

মু. খ. ভারতের ভাল বাংলা ছবি, শিল্প, ছবি কিংবা চলচ্চিত্র আন্দোলনের কথা উঠলেই আবশ্যিকভাবে তিনটি একঘেঁয়ে নাম এসে যেত—সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক আর মৃণাল সেন। কিন্তু আমার কথা সম্প্রতি এর সাথে আর একটি নাম যুক্ত হয়েছে পূর্ণেন্দু পত্রী। কিন্তু এদের বাইরেও কি প্রতিশ্রুতিশীল চলচ্চিত্রকার নেই? যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের নাম অনুচ্চারিত কেন?

ঋ. ঘ. এ তো বাংলা ছবির কথা হচ্ছে।

মু. খ. না, আপনি All India Basis-এ বলুন।

ঋ. ঘ. মনি কাউল, কুমার সাহানী এদের নাম তো এখন উঠছে। আর কলকাতায় এখন পর্যন্ত কাউকে দেখা যায় নি। কাজেই এদের কথা কি বলবো।

মু. খ. চলচ্চিত্র সর্বাধুনিক শিল্পমাধ্যম। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের শিল্পীদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে না জানলেও বোধহয় স্বীয় মাধ্যমে করে খাওয়া যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রকারকে সকল প্রকার শিল্পকলা সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হয়। বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা চলচ্চিত্রের ব্যাপারে আদৌ কোন উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন না বরং এ মাধ্যমটির প্রতি তাদের চরমতম অনীহা। চলচ্চিত্রের প্রতি সাহিত্যিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কি?

ঋ. ঘ. ঐ বললাম তো, লোককে জোর করে তো আর কিছু করানো যায় না? সাহিত্যিকদের অনীহার কারণ হচ্ছে সাহিত্যিকরা চোখের সামনে যা দেখছেন তার ভিত্তিতে হবে অনেকটা। কাজেই তারা যখন দেখবেন কিছু ছেলেপেলে কিছু serious চেষ্টা করছে, পারুক আর না পারুক, সবাই যে successful হবে এমন তো নয়। কিন্তু attempts হচ্ছে। Some good boys, রুচিবান কিছু ছেলে পুলে কিছু করার চেষ্টা করছে। তখন automatically সাহিত্যিকরা বুঝবে যে জিনিষটা serious. এখন বললে তাঁরা বলবেন যে এখানে যা হয় তাতে আমরা কি বলবো? ভালো একটা গল্প দেবো, কেউ নেবেনা। তাই তো এখন সত্যি সত্যি ঘটনা। আমরা করবোটা কিভাবে? How to help and why to get interested? তাদের সবাইকে interested করতে গেলে এখান থেকে একটা force আসা উচিত। তাহলে automatically তাদের মনের মধ্যে আগ্রহ আসবে। আগ্রহ এলেই interested হবে। এবং তখন তারা সেই দিকে লেখার কথা ভাববেন। Filmic story কাকে বলে এটা নিয়ে চিন্তা করবেন। 'যাঁরা তোমাদের এখানে sincere লেখক আছেন তাঁরা এটা করবেন। কিন্তু এখন how do you expect serious people to be interested?

ম. খ. যতদূর জানি এ যাবৎ আপনার কোন ছবি সরকারীভাবে কোন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রেরিত হয়নি।

জর্জ শাদুলের আমন্ত্রণের পর কি 'সুবর্ণরেখা'কে কোন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠান সম্ভব হয়েছিল ? আপনার ছবি বিদেশে না পাঠানোর ব্যাপারে কারণটা কি—সরকারী আমলাদের কারসাজী, না কি রাজনৈতিক ?

ঋ. ঘ. আমি তো সমস্ত কিছু বলতেও পারবো না। তবে এটা ঠিকই যে সরকারী ভাবে কখনো আমার কোন ছবি যায় নি। আর আসল কথা হচ্ছে যে 'সুবর্ণরেখা'র পিরিয়ড পর্যন্ত আমি ব্রাত্য ছিলাম—আমি অপাংক্তেয় ছিলাম। সেটা রাজনৈতিক কারণে তো বটেই। তাছাড়া ভেতরে ভেতরে সব হিংসার ব্যাপার ট্যাপার থাকে। এখন আমি জাতে উঠেছি। তখন তো আমি ছিলাম না এমন। কাজেই এখান থেকে ওখান থেকে নানা রকম খোঁচাখুঁচি—অমুক তমুক। যেমন 'সুবর্ণরেখা' তারা আটকাতে পারেনি। তখন India তে ভালো Subtitle হতো না। কোন ছবি বিদেশে পাঠাতে গেলে subtitle না করে পাঠানো ঠিক নয়। You cannot expect তারা Venice কিংবা Cannes-এ বসে বাংলা বুঝবে।

মু. খ. শুনছি বাংলাদেশে সৃজিত আপনার ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম' বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সরকারী-ভাবে, কিংবা অন্য কোন বাধা এসেছে কি ? আর তিতাস যে বাণিজ্যিকভাবে ভারতে প্রদর্শিত হবার কথা ছিল তার কি হলো।

ঋ. ঘ. এসবগুলো চেষ্টাই চলছে। এখন পর্যন্ত সরকারী-ভাবে এরা বিভিন্ন festival এ যেখান থেকে দাওয়াত পেয়েছেন সে সব জায়গায় পাঠাবার কথা ভাবছেন। সে নিয়ে আলোচনা চলছে। সে একই ব্যাপার কলকাতায় দেখানোর ব্যাপারেও। ওখানেও এটা আলোচ্য অবস্থায় আছে। এখনো final কিছু হয় নি।

মু. খ. সত্যজিৎ রায় কোন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ভারতবর্ষে এখন তিনটি কমিউনিস্ট পার্টি—এবং আমি সত্যিই জানিনা যে তার অর্থ কি ? কমিউনিস্ট পার্টির এই ত্রিধা বিভক্তিতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি।

ঋ. ঘ. তিনটে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আমার আপত্তি—ওটা ফিল্মের কোন ব্যাপার নয়। ওটা 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তে আমার বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসবে, আর রাজনীতি আলোচনা আমি করতে পারি। ৮/১০ ঘন্টা আমি বলতে পারি। কিন্তু why—লাভটা কি। ওটার সাথে ফিল্মের কি সম্পর্ক আছে ? কমিউনিস্ট পার্টি-ফার্টির কথা তুলে লাভ কি আছে। আমি তো মনে করিনা যে as a film maker আমার politics নিয়ে কথা বলা উচিত। As a social being I may have some feelings, some ideas যা আছে ছবিতেই আছে, ওটা নিয়ে আমি কোন মতামত দিতে চাই না।

মু. খ. ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করবেন বলে একবার ভেবে ছিলেন তার কি হলো ?

ঋ. ঘ. ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করবো বলে ভেবেছিলাম, তার স্ক্রিপ্ট হয়েছে এবং সে স্ক্রিপ্ট ছাপাও হয়েছে। কিন্তু ছবি হওয়াটা তো চাট্টিখানি কথা না ? ছবি করা গেল না।

মু. খ ওটা কি একেবারে বাদই দিয়েছেন, নাকি ছবি করার ইচ্ছে আছে আপনার।

ঋ. ঘ. এখন সে ভিয়েতনাম আর কোথায় ? এখন আর ছবি করার কোন মানেই হয় না।

মু. খ. যুক্তি তক্কো গপ্পোর' পর কি ছবি করবেন ? কোন পরিকল্পনা থাকলে কিছু বলুন।

ঋ. ঘ. এখনো আলোচনা চলছে, ভাবছি। এখনো কিছু final হয় নি কথাবার্তা চলছে।

মু. খ. আপনার অধিকাংশ ছবির কিছু কিছু চরিত্র Archetypal symbol হয়ে প্রকাশ পায়। আপনি মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং এর কালেকটিভ আনকনশাসনেস দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তাই আপনার ছবির চরিত্রেরা যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা, গৌরী, 'কোমল গান্ধার'-এর অনুসূয়া, শকুন্তলা, 'সুবর্ণরেখা'র সীতার মা, সীতা, এবং তিতাসের রাজার ঝি, ভগবতী প্রত্নপ্রতিমার আদলে গঠিত। আপনার 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' এবং আগামী ছবিতে কি এ ধরণের আর্কিটাইপাল ইমেজের প্রকাশ ঘটবে ?

ঋ. ঘ. আর্কিটাইপাল ইমেজ এমন একটা জিনিষ যেটা অঙ্ক কষে আসে না। আর দ্বিতীয়ত সে চিন্তা এখন যদি আমার থাকে তবে ওটা প্রভাবিত হবেই কোন না চরিত্রে।

মু. খ. বাংলাদেশের কোন ছবি দেখেছেন কি ? দেখে থাকলে আপনার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলুন।

ঋ. ঘ. বাংলাদেশের একটাই ছবি দেখেছি আমি, 'জীবন থেকে নেয়া'। হ্যাঁ, 'ওরা এগারোজন'-ও দেখেছি। এই দুটো, দুটো ছবি দেখে আমি বাংলাদেশের ছবি সম্পর্কে কি বলবো। 'জীবন থেকে নেয়া' আমি কলকাতায় দেখেছি। ও সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায় যে তখনকার অবস্থায় এমন একটা ছবি এখানে বসে করা, এর জন্য বুকের পাটা দরকার। ছবির content-এর দিক থেকে বলছি। Form বা Structural ব্যাপার এ সমস্ত আমি আলোচনাই করছি না। তখনকার যে অবস্থা ছিল তার মধ্যে একটা ছেলে এরকম Bold ভাবে কাজ করতে পারে, ভাবতে পারে, সেটা অভিনন্দনযোগ্য। আর 'ওরা এগারোজন'—ঠিক আছে।

মু. খ. 'তিতাস' এখানকার দর্শক নেয় নি। এর কারণটা কি ? আপনি নিজে এ ব্যাপারে কি মনে করেন।

ঋ. ঘ. আমি তখন প্রথমতঃ মৃত্যুশয্যায়। কাজেই কে

দিয়েছে কে নেয় নি তারপরে যে লেখা 'তিতাস' সম্পর্কে এখানে হয়েছে তা উড়ো উড়ো শুনেছি, আমি পড়িনি কিছু। কারণ আমি বলতেই পারবো না। কারণ আমি এখানে ছিলামও না এবং কোন interest নেওয়ার মত অবস্থাও আমার ছিল না। আমি হাসপাতালে তখন পড়ে আছি। আর এর মধ্যে লেখাও বিশেষ পাই টাই নি। কাজেই এর সম্বন্ধে আমি বলি কি করে। কেন নেয় নি সে সম্বন্ধে তো তোমরা বলতে পারবে। তোমরাতো এখানে উপস্থিত ছিলে। আমি তখন এখানে নেই। So how can I tell!

মু. খ. চিত্রবীক্ষণের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন যে এখানকার খবরের কাগজওয়ালারা 'তিতাস' করার সময় প্রথম প্রথম আপনাকে সুচক্ষে দেখে নি পরে নাকি এ বিরূপ ভাবটা প্রীতির সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু 'তিতাস' মুক্তি পাবার পর এখানকার পত্র-পত্রিকাগুলো আপনি পড়েছেন কি না জানি না, অনেকেই আপনাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গালাগাল করেছে। এতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

ঋ. ঘ. এ বিষয়ে আমার বলার মত কোন ব্যাপার আছে? প্রথমে যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন সত্যি সত্যি কিছু লেখা টেখা বেরিয়েছিল। সেগুলি পড়ে বুঝতে পারলাম যে তারা খুব ভালভাবে নেয় নি। তারপর সে লোকগুলোর সাথে কাজ করাকালীন আমার ব্যক্তিগত পরিচয় টরিচয় যখন হলো আমি দেখলাম যে তাদের more or less আমার প্রতি বেশ ভালই attitude, তারপর ছবি বেরুনোর পরে কেউ যদি অভিসন্ধিমূলক ভাবে কিছু করে থাকে—প্রথমতঃ কে করেছে, কে করে নি—বললামতো আমি কিছু জানি না। যদি করে থাকে তার উত্তর দেওয়া আমি ঘৃণ্য মনে করি। আর যদি ইচ্ছা করে না করে তার যদি সত্যিই মনে হয়ে থাকে তা হলে আমি তাকে সেলাম করি, কিন্তু এটা যদি বোঝা যায় কেউ অভিসন্ধিমূলকভাবে কোন কিছু করছে তবে তার উত্তর দেওয়া কি উচিৎ? কি লাভ হবে দিয়ে?

মু. খ. বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আর কোন ছবি করার কথা ভাবছেন কি?

ঋ. ঘ. না এখনো পর্যন্ত ভাবার মতো সময় আসে নি।

মু. খ. ডাক পড়লে আসবেন কি?

ঋ. ঘ. সে সব পরের কথা পরে হবে। এ সব conjectural কথাবার্তাগুলো আলোচনা করে লাভ কি? কেউ যখন এখনো ডাকেনি তখন ডাক পড়লে আসবো কি না তা ভেবে কি হবে? তা ছাড়া নিজের হাত এখন full: এই তিতাসের পুরোটা তৈরী করতে হবে তো, 'যুক্তি-তক্কো গপ্প' শেষ করতে হবে। তা আমার হাত তো at least for a month or two full. তার পরে এ দুটো ছবি কলকাতায় রিলিজ করতে গেলে যথেষ্ট ঝামেলা, আমাদের দেশে Director-এর, বিশেষ করে কলকাতায় ছবি রিলিজের জন্য তার দায়িত্ব বেশী, তাই সেই রিলিজের পেছনে দৌড়াও, তারপর রিলিজের সময় লোককে ইয়ে করো, কাজেই ঐ সব দিকে এখন concentrate করতে হবে, কাজেই immediately এখন বলে কি লাভ?

মু. খ. ইন্দিরা গান্ধীর ওপর প্রামাণ্য ছবি (যাকে আপনি প্রামাণ্য ছবি না বলে Character study বলতে চেয়েছেন) করতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? এ ধরণের বিষয়বস্তু আপনার চলচ্চিত্র মানসের সাথে খাপ খায় না। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক এবং চিন্তার দিক থেকেও যা একান্তই ভিন্ন। ইন্দিরা গান্ধীর উপর এই ছবি করতে যাওয়াটাকে অনেকে আপনার কম্প্রোমাইজিং এ্যাটিচুড এবং স্ববিরোধিতা বলে আখ্যায়িত করতে চাইছে। এ সম্পর্কে আপনি যদি স্পষ্ট করে কিছু বলতেন।

ঋ. ঘ. আমার স্পষ্ট করে কিছুই বলার নেই এ বিষয়ে, ছবিটা আদ্দেক হয়ে পড়ে আছে, যদি শেষ হয়—ছবি যখন বেরোবে তখন কেন করতে চেয়েছিলাম পরিষ্কার দিনের আলোর মত হয়ে যাবে। এবং স্ববিরোধিতা কিনাই ওটা প্রমাণ করবে। এবং compromise কিনা ওটাই প্রমাণ করবে। আর্টিস্ট-এর কাছে এসব প্রশ্ন করে লাভ নেই, খালি একটাই কথা যে wait কর। See it and then condemn it.

মু. খ. কিছু কিছু লোক এ ধরণের মন্তব্য করছে যে 'ঋত্বিক ঘটক তো এখন ইন্দিরা গান্ধীর ওপর ছবি করছে!' এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

ঋ. ঘ. এ সমস্ত কথার উত্তর দেবার কি আছে? যে উত্তর দিয়েছি সেই উত্তরই। অভিসন্ধিমূলক কথার উত্তর দেওয়াটা ঘৃণ্য। ছবিটা আমি যদি শেষ করি, ছবিটা দেখলেই যদি বোঝা যায় যে আমি অভিসন্ধিমূলক কাজ করছি—কি আমি compromise করছি, কি আমি স্ববিরোধিতা করছি, তখন আমাকে তুলে খিস্তি করো। তার আগে যেটা হয় নি, হবে কিনা তো জানা নাই, সম্ভাবনার ওপর তো বলা যায় না?

মু. খ. পুনাতে যে দুটো শর্ট ফিল্ম হয়েছে যেমন 'রঁদেভো' আর 'ফিয়ার' ওগুলো কি আপনিই করেছেন না ছেলেরা করেছে আপনার তত্ত্বাবধানে?

ঋ. ঘ. 'রঁদেভো'টা ছেলেরা করেছে আমার তত্ত্বাবধানে। For Direction students. আর 'ফিয়ার'টা আমি করেছি for Acting Course.

শিশু চলচ্চিত্র

প্রবোধ কুমার মৈত্র

মন্দের ভালো বলতে হবে যে এবছর 'আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় শিশুদের সম্পর্কে অন্যান্য কার্যসূচীর মধ্যে চলচ্চিত্র স্থান পেয়েছে। ভেবে দেখুন, এদেশে গতবছর দু'শো'রও বেশী ছবি তৈরী হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে দু'টি শিশু বা কিশোর-দের জন্য বিশেষভাবে কল্পিত নয়। পশ্চিমবাংলায় তো শিশু সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ, বেশ কয়েকটি সুসম্পাদিত পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। তবে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এ অনীহা কেন?

একটা কারণ বোধহয়, চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যয়। কিন্তু সেটা পুরো ব্যাখ্যা হতে পারে না। বাংলা ছবির আজকের হালের সংগে ব্যাপারটি নিশ্চয়ই যুক্ত—পরিবেশনের অব্যবস্থা, প্রদর্শনের অকিঞ্চিৎকর ব্যবস্থা, রঙীন ছবির অসুবিধে—সব মিলিয়ে শিশুচিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংকুচিত।

তাই, রাজ্য সরকারকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হয়েছে। বেশ কয়েকটি ছবি তৈরীর কাজ এ বছর শুরু হয়েছে। সত্যজিৎ রায় রঙীন সংগীতবহুল "হীরকরাজার দেশে" ছবিটির শুটিং করেছেন। "গুপী গায়েন বাঘা বায়েন" এর পরবর্তী অংশ হিসেবে ছবিটি কল্পিত। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বিষয় নিয়ে কিশোরদের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য ছবি করা হচ্ছে। যেমন দার্জিলিং থেকে সাগর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক চেহারা, ইতিহাসের কাহিনী। মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে একটি রঙীন ছবি, আরেকটি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে। পরেরটি মানুষের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের রূপরেখা ছোটদের উপযোগী করে তুলে ধরা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ও একটি নাটক অবলম্বনে দুটি ছবি হচ্ছে। কিশোরদের কাছে অ্যাডভেঞ্চার-এর গল্পের আকর্ষণ খুবই। অন্তত এরকম একটি কাহিনী নিয়ে ছবির কাজও এগিয়েছে। সবগুলি ছবি শেষ হলে এক বছরেই বাংলার শিশু-কিশোর চিত্রের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাবে মনে হয়। এগুলি শহর ছাড়াও গ্রামবাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচার করতে না পারলে অবশ্য উদ্দেশ্য সার্থক হবে না।

রাজ্য সরকার এছাড়া কলকাতায় শিশুদের জন্য একটি কেন্দ্র গড়ে তুলতে আগ্রহী। এই কেন্দ্রে ছবি দেখানো, অভিনয়, গ্রন্থাগার সবের ব্যবস্থা করা হবে।

সবচাইতে বড় কথা এবছরই যেন শিশুদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা শেষ হয়ে না যায়। এবছর শুরু করবার বছর হিসেবে মনে করলে প্রতি বছরই কিছু কাজ করে শিশুদের মনের খোরাকের দিকে নজর দেওয়া যাবে।

আমাদের দেশে বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি উদ্যোগ দেখা দিলেও, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কিংবা পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে কিন্তু অনেক আগে থেকেই পরিকল্পিতভাবে কাজ করা হচ্ছে। বিলেতে তো শিশু চলচ্চিত্র আন্দোলন পঞ্চাশ বছরেরও বেশী পুরানো। যেখানে শনিবারের একটি করে প্রদর্শনীতে শিশুচিত্র দেখানো বাধ্যতামূলক। আর অভিনেতা বা কলাকুশলীরা অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করেন শিশুদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুদের জন্য ব্যয় সম্ভবত সবচাইতে বেশী। শরীরের পুষ্টির সংগে মনের পুষ্টি—এক সংগে দেখা সেখানে শিশুর বেড়ে ওঠার সংগে জড়িত। অন্যান্য দেশ, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালী, চেকোস্লোভাকিয়া, জাপান, সব জায়গাতেই শিশু চলচ্চিত্রের সংখ্যার মানও উন্নত, সংখ্যাও বিপুল। ওয়াল্ট্ ডিজনে তো অ্যানিমেশন ছবির জগতে যুগপ্রবর্তক—সারা দুনিয়ার শিশু ও বয়স্ক একসংগে তাঁর ছবি দেখে আনন্দ পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশে বেসরকারী উদ্যোগে শিশুদের জন্য ছবির ঠাঁই নেই। ভারত সরকার দু'দশক আগে শিশু চলচ্চিত্র পর্ষদ গঠন করে এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু সম্যক ফল লাভ হয় নি। এ রাজ্যেও একটি পর্ষদ হয়েছিল কিন্তু অংকুরেই তা বিনষ্ট হয়। আশার কথা, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এরাজ্যের যাঁরা প্রধান পুরুষ—সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার—সবাই কোন না কোন সময়ে শিশুদের জন্য ছবি করবার সময় দিয়েছেন। তরুণ পরিচালকরাও এগিয়ে এসে হাল ধরলে চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও আনন্দের উপকরণ থেকে শিশুরা বঞ্চিত হবে না।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(গত সংখ্যার পর)

দৃশ্য—১৩১

স্থান—শহরের কামারশালা।

সময়—দিন।

কামারশালে বসে অনিরুদ্ধ একটা গনগনে লাল লোহাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটছে। জড়ানো মেয়েলি গলায় গুনগুন্ সুর শুনে সে থেমে যায়।

"হায় লো পিতলের কলসী
তুরে নিয়ে যাবো যমুনায়—
কলসী রে তুর পায়ে ধরি
নিয়ে চল বন্ধুর বাড়ী—"

দুর্গাকে কামারশালের দরজায় দেখা যায়। গলায় বাসি ছেঁড়া ফুলের মালা, চুল উসকো-খুসকো, শাড়ি আগোছাল।

সে দোকানের মধ্যে ঢুকে একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ ঐ অবস্থাতেই গুনগুন্ করার পর কথা বলে।

দুর্গা : কৈ গো বন্ধু!....আমার দা?....
দা দেবে না?

অনিরুদ্ধ এতক্ষণ তাকে অবাক চোখে দেখছিল।

অনিরুদ্ধ : হয়ে গ্যাছে, দাঁড়া!

অনিরুদ্ধ ডাঁই করা যন্ত্রপাতির মধ্য থেকে দুর্গার দা'টা বার করতে থাকে। দুর্গা তখন মুচকি হেসে বলে—

দুর্গা : যদি বলি...বলতে মন গিছে....!

অনিরুদ্ধ দুর্গার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে পড়ে যেন। তারপর ডানদিক থেকে একটা ছোট টুল নিয়ে দুর্গার সামনে রাখে।

দুর্গা হাই তুলে, শরীর দুলিয়ে বসে পড়ে টুলটায়।

দুর্গা : বাব্বাঃ রাতভোর যা ধকল গেইচে!

সে শাড়ির ভেতর থেকে একটা মদের বোতল বার করে সামনে রাখে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ বোতলটার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

একটি বিলিতি মদের বোতল।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ দুর্গার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

দুর্গা : (একটু হেসে) ঐ চালকলের নাগর গো...
মাড়োয়াড়ী মিনসেটা...এই ক'টা আনিয়েছিল (তিনটে আঙুল দেখায়)....ছুটো রেতেই ফাঁক! শেষ বেশ বুয়ে,—যাঃ!....উটা তু নিয়ে যা! (ব্লাউজের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেট বার করে। এপাশ ওপাশ ফুঁ দিয়ে, ঠোঁটে চেপে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বলে) দেখি....

অনিরুদ্ধ বিস্মিত হয়। একটা লাল গনগনে লোহা চিমটে দিয়ে তুলে দুর্গার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দেয়। অন্য হাত দিয়ে হাপর টানতে শুরু করে।

দুর্গা সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ অনিরুদ্ধর দিকে চোখ পড়ে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ সোজা দুর্গার দিকে তাকিয়ে।

কাট্ টু।

দুর্গা অনিরুদ্ধকে লক্ষ্য করে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—অনিরুদ্ধ।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দুর্গা। আদিম দুষ্টুমির হাসি খেলে যায় দুর্গার ঠোঁটে। চোখে রহস্যের ছায়া। সিগারেটে টান দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে দুর্গা।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ হতবাক।

কাট্ টু।

দুর্গা সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়াটা অনিরুদ্ধ'র মুখের ওপর ছেড়ে দেয়। ধোঁয়া সরে গেলে দেখা যায় অনিরুদ্ধ'র চোখে লুকানো প্রেমের আগুন।

ক্যামেরা আস্তে আস্তে সাইড ট্র্যাক্ করে উনুনের ওপর যায়। অনিরুদ্ধর হাত যন্ত্রের মত হাপর টেনে চলেছে। উনুনের কয়লা জ্বলছে আর নিবছে।

উনুনের ওপর কিছুক্ষণ ধরা থাকে ক্যামেরা।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩২

সময়—বিকেলবেলা।

ময়ূরাক্ষীর হাঁটু জলে দুর্গাকে কাঁধে নিয়ে অনিরুদ্ধ আর দুর্গা গান গায়—

ওলো দেখে যা সই দেখে যা

পাখির বোল ফুটেছে

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩৩

স্থান—শিবনাথতলা, গয়েশপুর।

সময়—বিকেলবেলা।

মন্দিরের সামনে গাছের ডাল থেকে সুতো দিয়ে একটি ঢ্যালা ঝুলিয়ে দেয় পদ্ম। প্রণাম করে।

(ব্যাক গ্রাউণ্ডে স্বর শোনা যায়—"ওলো দেখে যা")

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩৪

স্থান—নদীর চড়া।

সময়—বিকেলবেলা।

নদী পার হতে হতে অনিরুদ্ধর কাঁধে চড়ে দুর্গা গাইছে।

"ওলো দেখে যা সই দেখে যা"

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩৫

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের রাস্তা।

সময়—সন্ধ্যা।

পদ্ম মন্দির থেকে ফিরছে। হঠাৎ ছিরু পালকে উল্টো দিক থেকে আসছে দেখতে পেয়ে ঘোমটা টেনে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ায়।

পদ্ম ছিরু পালকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ক্যামেরা চার্জ করে ছিরু পালের ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩৬

স্থান—নদী।

সময়—সন্ধ্যা।

দুর্গা অনিরুদ্ধর কাঁধ থেকে নেমে নদী পার হয়। গানও শেষ হয়ে যায় আর অনিরুদ্ধ ধপাস করে বালির ওপর বসে পড়ে।

দুর্গা উ কি?

কাট্ টু

দৃশ্য—১৩৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—সন্ধ্যা, অগ্রহায়ণ (৩য় সপ্তাহ)

খিড়কি দরজার বাইরে ক্যামেরা।

পদ্ম বাইরে থেকে এসে উঠোন পেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে যায়। কিছুক্ষণ শূন্য ফ্রেমে ক্যামেরা ধরাই থাকে। একটু পরেই টলতে টলতে ফ্রেমে ঢোকে ছিরু পাল। চারদিক তাকিয়ে ঢুকে পড়ে উঠোনে।

কাট্ টু।

পদ্ম হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। হাত ধুতে আরম্ভ করে। পদ্মর পা থেকে ক্যামেরা প্যান্ করে টলায়মান ছিরু পালকে ধরে। হাত ধোয়া বন্ধ করে দেয় পদ্ম। ক্যামেরা টিল্ট-আপ্ করে পদ্মর মুখের ওপর স্থির হয়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল এগিয়ে আসছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম কয়েক মুহূর্তের জন্য নার্ভাস হয়ে পড়ে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট—ছিরু পাল এগিয়ে আসছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম কি করবে ঠিক করতে পারছে না।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল বারান্দার সিঁড়ির কাছে এসে একটুক্ষণ দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে উঠে আসতে থাকে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম ভয় পেয়ে সরে যায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল এগিয়ে আসার সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্মর হাতে হঠাৎ একটা দেয়ালে গোঁজা দা-এর ছোঁয়া লাগে। মুহূর্তের মধ্যে সে দা'টাকে শক্ত করে ধরে।

হঠাৎ দা'টা বার করে উঁচিয়ে তোলে পদ্ম

পদ্ম : নাঃ!

কাট্ টু।

ছিরু হতচকিত হয়ে যায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। যে কোন ঘটনা যেন ঘটাতে পারে সে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল ভয় পেয়েছে। সে এক পা এক পা করে পেছনে সরতে থাকে। পরাজিত জন্তুর মত তারপর পেছন ফিরে দ্রুত চলে যায়।

কাট্ টু।

পদ্ম ঘটনার আকস্মিকতায় এতক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ করেছিল। এখন সে হঠাৎ যেন ভেঙে পড়ে।

পদ্ম বারান্দায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। ভারি নিঃশ্বাস ফেলে দাটাকে দিয়ে এক কোপ মারে মাটিতে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৩৮

স্থান—গ্রামের এক চাষীর বাড়ী।

সময়—দিন, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি।

সমবেত উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে দেখা যায় একজোড়া বলদ একটা বাঁশের খুঁটির চারদিকে ঘুরছে। ধানের ছড়া দিয়ে উঠোনটা সাজানো।

কাট টু।

দৃশ্য—১৩৯

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্যামেরা চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আস্তে আস্তে ট্রলি করে এগিয়ে যায়। দেবু ছাত্রদের সেখানে পড়াচ্ছে।

দেবু (off voice) অট্টালিকা নাহি মোর, নাহি দাসদাসী

ছাত্ররা (off voice) অট্টালিকা নাহি মোর, নাহি দাসদাসী

দেবু (off voice) ক্ষতি নাই আমি নহি সে সুখপ্রয়াসী

ছাত্ররা (off voice) ক্ষতি নাই আমি নহি সে সুখপ্রয়াসী

দেবু আমি থাকি ছোট ঘরে বড় মন লয়ে

ছাত্ররা আমি থাকি ছোট ঘরে বড় মন লয়ে

দেবু নিজের দুঃখের অন্ন খাই সুখী হয়ে

ছাত্ররা নিজের দুঃখের অন্ন খাই সুখী হয়ে

দেবু : পরের সঞ্চিত ধনে হয়ে ধনবান
আমি কি থাকিতে পারি পশুর সমান।

সুধীর নামে একটি ছাত্র উঠে দাঁড়ায়।

সুধীর : মাস্টার মশাই!

দেবু : কি রে?

সুধীর : আজ ইতু। আমাদের আজ হাফ-ইস্কুল হয় মাস্টারমশাই।

দেবু : ও! (একটু থেমে) আচ্ছা··· যা!

সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা উঠে পড়ে এবং চণ্ডীমণ্ডপ ছেড়ে চলে যায়। ছেলেদের পাশ দিয়ে একটা মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে এগিয়ে আসেন বৃদ্ধা রাঙাদিদি।

রাঙাদিদি : এ্যাই!····এ্যাই!··· এ্যাই!···আ মরণ!

চণ্ডীমণ্ডপের দিকে এগিয়ে আসেন তিনি।

রাঙাদিদি : যেমন বজ্জাত ই ভাঙাকালী····তেমনি ঐ গাঁজা-খেকো বুড়ো শিব! কতো বলি, আর ক্যানে,···· ইবার লে—লে আমাকে! তা লেবে? লেবে না ক'!

মণ্ডপে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে মুড়ো ঝাঁটাটি দিয়ে ঝাঁট দিতে শুরু করে।

রাঙাদিদি : ই বুড়ো বয়সে····বাপরে বাপ্····

দেবু : (এগিয়ে এসে) কি গো রাঙাদি! আজ যে এতো সকাল সকাল?

রাঙাদিদি : (চোখের ওপর হাত আড়াল করে) কে? দেবা?

দেবু : তোমার ঝ্যাটার কথা আমি বলে দিয়েছি সতীশকে। কাল এসে নতুন ঝ্যাটা দিয়ে যাবে।

রাঙাদিদি : দিইছিস! বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্! ত্থাথ তো এটা দিয়ে হয়? (ঝাঁটাটি দেখায়)

দেবু : (হাসতে হাসতে) তবু তোমরা আছ তাই এখনো ঝাঁটপাট পড়ছে!··· এরপর কি হবে?

রাঙাদিদি : ক্যানে? তুদের বৌরা এসে দেবে!····আমরা পারছি তো উয়া পারবে না ক্যানে? (তারপর হঠাৎ চোখ পাকিয়ে) নাকি চব্বিশ ঘন্টা স'গ্ দিয়ে কোলে বসায়ে রাখছিস—এ্যাঁ?

কাট টু।

দৃশ্য—১৪০

স্থান—দেবুর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ক্যামেরা বিলুর ওপর থেকে ট্র্যাক ব্যাক্ করলে দেখা যায় সে

হাতজোড় করে ইতুর পুজো করছে। পাশে পদ্ম বিলুর বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে। দুর্গাকে দেখা যায় একটু দূরে বসে।

বিলু : "অষ্ট ধান অষ্ট দুব্বা কলমিপাত্রে থুয়ে
শোন্ রে ইতুর কথা প্রাণমন দিয়ে
ইতু দেন বর
ধনে ধান্যে পৌত্রে পুত্রে বাড়ুক তোর ঘর।"

বিলু পাঁচালী গায় আর পদ্ম ও দুর্গা উলু দিয়ে মাটিতে মাথা নীচু করে প্রণাম করে।

দুর্গা : গড় করো, গড় করো ভালো করে! আমার তো আর করে লাভ নাই, আসচে জন্মে কেউ আমাকে একটা সোয়ামী ধার দিয়ো বাপু।

দেবু বইখাতা আর বেত হাতে নিয়ে উঠোনে ঢোকে। দুর্গা তার দিকে তাকায়।

দুর্গা : হেই মা!....জামাই পণ্ডিত!

কাট্ টু।

পদ্ম দেবুকে দেখেই চমকে যায়। ঘোমটায় মুখ আড়াল করে উঠে দাঁড়ায়।

দুর্গা : উ কি? উঠলে কেনে?

দেবু পদ্মকে দেখে।

দুর্গা : (পদ্মকে) বোসো দিকি! কেউ কিচ্ছু বুলবে না! উ— । আমি নে'সচি সঙ্গে ক'রে...বুল্লেই হল!

হাসি হাসি মুখ নিয়ে দুর্গা দেবুর কাছে আসে।

দুর্গা : গিয়ে দেখি, গোঁজ হয়ে বসে আচে ঘরে।....কি? ....না, পুজোর দিন—কথা শুনবে কোথা? পালের বাড়ী হয়—সেখানে তো যায় না!...তো আমি বুল্লাম—ঠিক আছে। আমার বিলুদিদি আচে,....চল সেখানে! তা বলে, বাপ্ রে! পণ্ডিতের বাড়ী আমি যাবো না!

বিলু : তা কি করবে? সেদিন পুজো নিয়ে যা কাণ্ডটা হল!

দেবু : শুধু কাণ্ডটাই দেখলে। দোষটা দেখলে না?

দুর্গা : (হাত নেড়ে) এটা কিন্তু তোমার যুগ্যি কথা হল না জামাই পণ্ডিত!

দেবু : কেন?

দুর্গা : আচ্ছা, মানলাম না হয় কম্মকার মুখ্যু....না হয় কম্মকারেরই সব দোষ।....কিন্তু সেই দোষে তুমি (পদ্মকে দেখিয়ে) ওর পুজোটা ফিরিয়ে দিলে কোন্ মুখে?....বচ্ছরকার পুজো?....বলো!... তুমি তো পণ্ডিত!...বুকে হাত রেখে বলো! কাজটা তোমার ঠিক হয়েছে—বলো বলো...কি?

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু উত্তর দিতে পারে না।

কাট্ টু।

দুর্গা : কি? এখন কথা নাই কেনে?

কাট্ টু।

দেবু কথায় হেরে যায়। চোখ নামিয়ে নেয়।

বিলু : (off voice) ওমা!...ওকি!

দেবু সেদিকে তাকায়।

কাট্ টু।

বিলু ক্রন্দনরত পদ্মর দিকে এগিয়ে যায়।

বিলু : কি হয়েছে?

পদ্ম চোখ মোছে।

দুর্গা : কান্‌ছ কেনে?

কাট্ টু।

নীরবে পদ্ম তার চোখ মোছে।

কাট্ টু।

দেবু পদ্মর দিকে তাকায়, সে কিঞ্চিৎ অভিভূত। কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারে না। তারপর ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—

দেবু : কেঁদো না মিতে বৌ,....ভুল আমারই!....আমি নিজে গিয়ে অনির কাছে,.. ওকে বসতে বল্ দুর্গা। .. জল না খাইয়ে ছাড়িস্ নে—

দুর্গার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দুর্গা : বা রে! আর আমার কথা বুল্‌লে না যে!... (বিলুকে) দেখেচ, আমার জলখাবারের কতা বুল্‌লে না!

দেবু : তোর আবার ভাবনা কি? তোর তো দিদিই আছে!

দুর্গা : উঁহু,....টাকার চেয়ে সুদ মিষ্টি, দিদির চে দিদির বর ইষ্টি! তুমি নিজের মুখে একবার আদর ক'রে বলো।

দেবু : ফাজিল—

দেবু বারান্দার দিকে যেতে উদ্যত হয়, এমনি সময় দূরে বাইরে ঢ্যাঁড়া পেটানোর শব্দ শুনে সকলে দরজার দিকে আসে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৪১

স্থান—দেবুর বাড়ীর সামনেকার গ্রাম্য রাস্তা।

সময়—দিন।

সেট্‌লমেন্ট অফিসের একজন পিওন কর্মচারী গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে একজন ঢাক-পিটিয়ে।

পিওন : এতদ্বারা সর্বসাধারণকে নুটিশ দেওয়া যাইতেছে যে, আগামী ২২শে পৌষ ১৩৩২ হইতে এই গ্রামে সার্ভে সেট্‌লমেন্টের খানাপুরীর কাজ শুরু হইবেক—।

দৃশ্য—১৪২

স্থান—দেবুর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

দরজার কাছে দেখা যায় দেবু, দুর্গা, পদ্ম ও বিলুকে।

বিলু : কি ?···কি শুরু হবে বলছে ?

দেবু : খানাপুরী···সরকার থেকে যার যার জমির মাপজোক···কিন্তু—

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—১৪৩

স্থান—পুরোন চণ্ডীমণ্ডপ ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ক্যামেরার সামনে থেকে সেই সেট্‌লমেন্ট অফিসের পিওন-কর্মচারী, ঢাক-পিটিয়ে আর একদল বাচ্চারা সরে যায়।

পিওন : অতএব পেত্যেক জমির মালিকগণকে নিজ নিজ জমিতে উপস্থিত থাকিয়া সীমানা সম্বন্ধ দেখাইয়া দিবার আদেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবেক—

ক্যামেরা প্যান করে দেখায় চণ্ডীমণ্ডপের একটা খুঁটিতে ঐ মর্মে একটা নোটিশ লাগানো রয়েছে। একদল গ্রামবাসী সেটি দেখছে। জগন ডাক্তার এগিয়ে আসে।

জগন : গুষ্টির পিণ্ডি হইবেক! ·ঠাকুরমার ছেরাদ্দ হইবেক! ··ইয়ার্কি!···মামদোবাজী!

মুকুন্দ : মাঠে এখনো ধান···সবে পাক ধরেচে এর মধ্যে ওরা যদি ওপর দিয়ে শেকল টেনে নিয়ে মাপজোক করে—

জগন : থামেন তো!···শেকল অমনি টানলেই হল, না? মগের মুলুক! আজই দরখাস্ত করছি কালেক্‌টারের কাছে—

কাট্‌ টু

দৃশ্য—১৪৪

স্থান—খিড়কি পুকুরের কাছে ছিরু পালের দাওয়া।

সময়—দিন।

ছিরু পাল আর দাসজী মুখোমুখি বসে দাবা খেলছে। দূরে দেখা যায় সেট্‌লমেন্টের কর্মচারী, ঢাক-পিটিয়ে, লোটন ও বাচ্চার দল যাচ্ছে।

দাসজী : (দাবার চাল দিতে দিতে) তা বেশ, সেট্‌লমেন্টের আগেই হয়ে যাক্! কিন্তু ব্যাপার কি বলো তো ?···এ্যাদ্দিনের বাপুত্তি নামটা—

ছিরু : না না, ওসব পাল ফাল আর চলে না। একেবারে হেলে-চাষার গন্ধ। তার চাইতে··"ঘোষ"·· "শ্রীহরি ঘোষ"·· কেমন মানায় বলুন দিকি ?

দাসজী : তা যদি বল্লে তো!—

হঠাৎ সে অন্য কি যেন দেখতে পায়।

দাসজী : কে হে? · দুগ্‌গোর সঙ্গে উটি কে ?

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—১৪৫

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাড়ে বাঁশ ঝাড়।

সময়—দিন।

দাসজীর পার্সপেক্‌টিভে লং শটে দেখা যায় বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে দুর্গা আর পদ্ম ক্যামেরার দিকে পেছন করে হেঁটে যাচ্ছে। দুজনের হাতেই কলার পাতায় মোড়া প্রসাদ।

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—১৪৬

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের দাওয়া।

সময়—দিন।

ছিরু পাল ও দাসজী দুজনেই দূরে পদ্ম ও দুর্গার দিকে তাকিয়ে আছে। ছিরু পালের চোখে কামনার আলো।

ছিরু : কামার বৌ।

দাসজী : উঁ ?

ছিরু : অনিরুদ্ধর পরিবার।

দাসজী : তা দুগ্‌গোর সঙ্গে ঘোরে কেন ?

ছিরু : কি করে জানব বলেন ?·· পরচিত্ত অন্ধকার।

দুজনেই আবার পদ্মর দিকে তাকায়।

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—১৪৭

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাড়ে বাঁশ ঝাড়।

সময়—দিন।

ক্লোজ, লো অ্যাঙ্গেল শটে ধীরে ধীরে পদ্ম ক্যামেরা থেকে সরে যায়। দুর্গাও।

কাট টু।

দৃশ্য—১৪৮

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের দাওয়া।

সময়—দিন।

দুর্গাকে নিয়ে পদ্মর যাবার পথে তাকিয়ে আছে ছিরু পাল আর দাসজী। ক্যামেরা চার্জ করে ছিরু পালের ওপর।

দাসজী : বা বা বা !…এ যে ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল হে ··· অঁ্যা ?

এফেক্ট মিউজিক শোনা যায়। ক্যামেরা জুম্ ফরোয়ার্ড করে ছিরু পালের মুখের ওপর।

এফেক্ট মিউজিক জোরালো হয়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৪৯

স্থান—পদ্মর ঘর।

সময়—রাত্রি (যে কোন সময়)

দ্রুত কতগুলি কাটা কাটা শটে দেখানো হয় ছিরু পাল পদ্মকে ধর্ষণ করছে। ছিরু পালের অবচেতন মনের ইচ্ছে।

একটা ধারালো কাটারি দেখা যায় ফোরগ্রাউণ্ডে।

পদ্ম : নাঃ

পদ্ম কাটারি হাতে ছুটে আসে ক্যামেরার দিকে, তারপর চীৎকার করে ওঠে—

পদ্ম : নাঃ নাঃ

কাট টু।

দৃশ্য—১৫০

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের দাওয়া।

সময়—দিন।

ছিরু পালের চমক ভাঙে।

দাসজী : (ছিরুর ভাবান্তর লক্ষ্য করে) কি হল ?

ছিরু : অঁ্যা ?·· না····

দাসজী : ওগ্ গোকে দিয়ে (চোখ টিপে) ··একবার দেখবে নাকি ?

ছিরু : (ভ্রূকুটি করে) নাঃ ! ও হারামজাদীকে আর বিশ্বাস নাই।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫১

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের বাঁশ ঝাড়।

সময়—দিন।

পদ্ম আর দুর্গা ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ এক-মুঠো ধুলো আউট ফ্রেম থেকে কেউ ছুঁড়ে দিতেই ক্যামেরার ফ্রেম ঢাকা পড়ে।

দুর্গা : (মুখ ঢেকে) এ্যাই !···কে রে !

উচ্চিংড়ে : হুই— !

দুর্গা : এ্যাই ছোঁড়া ! যা, ভাগ্ বলচি।

উচ্চিংড়ে : (আবার ধুলো উড়িয়ে) হুই— !

দুর্গা : তবে রে !···দাঁড়া তো দেখাইছি মজা—

দুর্গা আশপাশে একটা কঞ্চির খোঁজে তাকায়। উচ্চিংড়ে ইতিমধ্যে মুঠো মুঠো ধুলো ছুঁড়ে নাচতে থাকে।

উচ্চিংড়ে : হুই—হুই—হুই····

পদ্ম : ছিঃ অমন করে না বাবা !··· কার ছেলে তুই ?

দুর্গা : আর কার ? ···ঐ তারিনী বাউণ্ডুলের ! ··দিনরাত পথে পথে · আর বজ্জাতি ! যা ভাগ্ !····ভাগ্ বলচি। (হঠাৎ চুল সরাবার জন্য কপালে হাত দিয়েই) ওমা !····আমার টিপ ?

চারদিক তাকিয়ে খুঁজতে আরম্ভ করে টিপ।

পদ্ম : ধুলো ছাড়্ !···ধুলোয় বসে খেলতে নেই !

উচ্চিংড়ে : এঃ

পদ্ম : ছাড়্ ! মেঠাই দেব।

উচ্চিংড়ে : (সঙ্গে সঙ্গে হাত পেতে) কৈ, দে !

পদ্ম : ও মা ! ঐ হাতে ?····আগে আমার ঘর চল্। হাত ধুয়ে তবে তো ?

উচ্চিংড়ে : (সন্দিগ্ধ মনে) না। মারবি।

পদ্ম : (হেসে) কে বুল্লে ?···মারব না, চল্।····এই দ্যাখ্ !

কলা পাতায় মোড়া প্রসাদটা দেখায়।

কাট্ টু।

দুর্গা ইতিমধ্যে টিপটা খুঁজে পেয়েছে। সেটি লাগাতে লাগাতে এগিয়ে আসে।

দুর্গা : ও মা ! জোটালে তো ?···এরপর রোজ গিয়ে জ্বালাতন করবে—তখন বুঝো। (উচ্চিংড়েকে) আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে !····চল !!

উচ্চিংড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাওয়ায় ধুলো ওড়াতে থাকে আর ওদের সঙ্গে চলে।

পদ্ম আর দুর্গা ছুটছে। ক্যামেরা পাশে পাশে চলে।

সেতার বাজনার শব্দ

পদ্ম : নাম কিরে তোর ?

উচ্চিংড়ে : (লাফাতে লাফাতে) উচ্চিঙ্গে।

পদ্ম : ও মা !....ও আবার কেমন নাম ?.. উচ্চিংগে ?

উচ্চিংড়ে : আমি খুব লাফাই তো ? দেখবি ?....এই ত্যাখ্....

উচ্চিংড়ে লাফায়, আর দুর্গা ও পদ্ম তা দেখে হাসে।

পদ্ম : এ্যাই !.. পড়ে যাবি !....এ্যা-ই !

উচ্চিংড়ে ক্যামেরা থেকে সরে যায়।

Mixes into

দৃশ্য—১৫২

স্থান—যে কোন জায়গা।

সময়—রাত্রি।

আকাশে চাঁদ। আলোয় ঝলমল চারিদিক।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৩

স্থান—বায়েনপাড়ার পুকুর ও বাঁশ ঝাড়।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

পৌষ মাস, মাঠে ধান পাকা।

বাঁশ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে কানুনগো আর লোটন আসছে। ধুতি জামা মোজা জুতো পরায় কানুনগোকে ঠিক ফুলবাবুর মতোই দেখাচ্ছে।

ওরা দুজন ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কানুনগো : কৈ হে.. কোনদিকে.. কোনখানে ?...

লোটন : আপনি একটু দাঁড়ান।

এই বলে সে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৪

স্থান—বায়েনপাড়া—ধর্মরাজতলা। দুর্গার মায়ের ঘরের পিছন।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

লোটন ফ্রেমে ইন্ করে দুর্গার মা'র ঘরের জানলার কাছে যায়।

লোটন : দুগ্‌গার মা !....দুগ্‌গার মা—

দুর্গার মা জানলার কাছে আসে।

দুর্গার মা : আর বোলো না বাপু। সনজে থেকে এই নিয়ে তিনবার তাগাদা দিচ্ছি !....হারামজাদী মেয়্যা.... যাও, নিজে শুধোও ক্যানে

লোটন দুর্গার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৫

স্থান—বায়েনপাড়া—ধর্মরাজতলা—দুর্গার ঘরের পিছন।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

লোটন ফ্রেমে ইন্ করে দুর্গার ঘরের জানলার দিকে যায়। জানলা বন্ধ।

লোটন : (ফিসফিসিয়ে) দুগ্‌গা.. দুগ্‌গা আছিস ?

দুর্গা : (off voice) কে ?

দুর্গা জানলা খুলে উঁকি দেয়।

লোটন : ঘরে কেউ আছে নাকি ?

দুর্গা : ক্যানে ?

কেউ যেন ভেতর থেকে দুর্গার হাত ধরে টানে। দুর্গা তাকে থামিয়ে দেয়, বলে—

দুর্গা : আরে উঁকি ?....ঐ ত্যাকো ! (লোটনকে) ক্যানে গো ?

লোটন : কঙ্কনা থেকে বাবু এসেছে। কানুনগোবাবু।

দুর্গা : কি বাবু ?

লোটন : ঐ সেটেলমেন্ হবে না ?.. তার বড়বাবু '

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৬

স্থান—পুকুর ও বাঁশ ঝাড়—বায়েনপাড়া।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

বাঁশ ঝাড়ের তলায় একলা দাঁড়িয়ে কানুনগোবাবু গায়ের মশা মারছে। লোটন ফ্রেমে ঢোকে।

কানুনগো : (আগ্রহভরে) কি ?

লোটন : নাঃ ! ঘরে লোক রইছে—

কানুনগো : (বিমর্ষ হয়ে) চচুঃ।....ম্যাসাগার !

দৃশ্য—১৫৭

স্থান—দুর্গার ঘরের ভেতর।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্—অনিরুদ্ধ ও দুর্গা আলিঙ্গনরত।

লো এ্যাঙ্গেল ক্লোজ কম্পোজিট শট্।

দুর্গা : তোমার লেগেই আমার সব লাটে উঠবে।

অনিরুদ্ধ : (জড়িত গলায়) উঠুক না।

দুর্গা : হেই মা। উঠুক না, তবে খাবো কি !

অনিরুদ্ধ : খাবি ?

দুর্বুদ্ধি আর দুষ্টুমির হাসি খেলে যায় তার চোখে। দুর্গার ঠোঁটের দিকে নিজের ঠোঁট এগিয়ে আনে অনিরুদ্ধ। দুর্গা প্রতিবাদ করে—

দুর্গা : এ্যাই !… হাৎ !…এ্যাই খ্যাকো !….এ্যা-ই !

অনিরুদ্ধর ঠোঁট ক্যামেরার আরও কাছে এগিয়ে এসে এক সময় লেন্স ঢাকা পড়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৮

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

পদ্ম রান্নার কাজে ব্যস্ত।

ভূপাল : (off voice) কম্মকার ! কম্মকার রইছ নাকি ?

পদ্ম দরজার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

ভূপাল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ভূপাল : কম্মকার নাই ?

পদ্ম : (নীচু গলায়) ফেরে নাই এখনো—

ভূপাল : খ্যাকো দিকি !…উদিকে গোমস্তা শালা রোজ বুলবে—বসে বসে ভাত মারবার জন্যে মায়না দিছি তুকে ?….কম্মকারকে বুলো, কাল যেন একবার সেরেস্তাটা ঘুরে যায়।

পদ্ম মাথা নেড়ে আবার রান্নার কাজে যায়।

ভূপালও ফিরে যেতে যেতে গজরাতে থাকে।

ভূপাল : যায় কুথা ! ওপারের কামারশালও তো খোলে নাই ক' আজ !

পদ্ম ভূপালের শেষ ক'টা শব্দ শুনে কিঞ্চিৎ থমকে দাঁড়ায়। মুহূর্তখানেক কি যেন ভাবে, তারপর ওসব কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে গিয়ে বসে রান্নার কাজে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৫৯

স্থান—দুর্গার ঘরের বারান্দা, বায়েনপাড়া।

সময়—রাত্রি।

এক হাতে লম্ফ ও অন্য হাতে অনিরুদ্ধকে ধরে ঘরের বাইরে আনে দুর্গা। অনিরুদ্ধ পূর্ণ মাতাল।

দুর্গা : এসো !….এসো !…

অনিরুদ্ধ : ক্যানে ?….আট্ থাকলে কি হত ?

দুর্গা : না !….অনেক হইছে !….উথানে যে একজন বাড়া-ভাত নিয়ে বসে আছে….তার ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬০

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

পদ্ম অনিরুদ্ধর জন্য একটা থালায় খাবার গোছাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬১

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের বাঁশ ঝাড়।

সময়—রাত্রি।

এক হাতে লম্ফ আর অন্য হাতে মাতাল অনিরুদ্ধকে কোন রকমে সামলে নিয়ে আসছে দুর্গা।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬২

স্থান—খিড়কি পুকুর।

সময়—রাত্রি।

ওরা দুজন ফ্রেমে ঢুকে থামে।

দুর্গা : যাও।

লম্ফটা নিবিয়ে দুর্গা তাড়াতাড়ি চলে যায়। অনিরুদ্ধ কম্পিত পায়ে এগিয়ে যায় বাড়ীর দিকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬৩

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

ক্যামেরার দিকে পিঠ করে মাতাল অনিরুদ্ধ বাড়ীর দরজা ঠেলে। দরজাটা খুলতেই দেখা যায় পদ্ম লম্ফ হাতে করে উঠোন থেকে এগিয়ে আসছে।

পদ্ম : ও মা ! কোথায় ছিলে গো ?….উদিকে ভূপাল চৌকিদার এসে—

হঠাৎ তার কথা থেমে যায়। বিস্ময়ে পাথরের মত কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকে পদ্ম।

অনিরুদ্ধ : (off voice) কি ? কি দেখছিস ?

পদ্ম উত্তর দেয় না। সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার ঠোঁট কাঁপছে। সারা শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে শুরু করে।

অনিরুদ্ধ : (off voice) আরে ! অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস ক্যানে ?….পুতুল হয়ে গেলি….নাকি ?

কাট্ টু।

ক্যামেরা জুম্ করে অনিরুদ্ধ'র মুখের ওপর। দেখা যায় দুর্গার কপালের টিপটা তার চুলের মধ্যে আটকে রয়েছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—কম্পমান পদ্ম।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—অনিরুদ্ধ।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—কম্পমান পদ্ম।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—অনিরুদ্ধ।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায়।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : (ঝুঁকে পড়ে) পদ্ম !....পদ্ম !

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬৪

স্থান—কঙ্কনায় সেটল্‌মেন্ট অফিসের তাঁবু।

সময়—দিন, পৌষলক্ষ্মীর আগের দিন।

নীল আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তারিনীর লো এ্যাঙ্গেল শট্। তারিনী গাইছে।

তারিনী : এখন পীরিতির পরিণাম
এতদিনে বুঝিলাম
ভিখারি সাজিলাম, ছিল কপালে, পাগল
পাগল হইয়ে বন্ধু আমায় বানাইলে পাগল।

ক্যামেরা পেছনে সরে গিয়ে দেখায় বিরাট ধান ক্ষেতের মাঝে বেশ কয়েকটা তাঁবু পড়েছে সেটল্‌মেন্ট অফিসের। কানুনগো-মশাই একটি হেলান-চেয়ারে বসে, আর সব কর্মচারীরা ম্যাপ, চেন, অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে জমি মাপজোপের কাজে ব্যস্ত।

কানুনগো : বাঃ....বেড়েতো !...কি নাম ?

তারিনী : এজ্ঞে তারিনীচরণ ! দুটো পয়সা দেবেন বাবু, মুড়ি খাবার লেগে ! কাল পৌষলক্ষ্মী

কানুনগো : অমনি ?

কানুনগো উঠে দাঁড়ায় ও একটা পয়সা ছুঁড়ে দেয় তারিনীর দিকে, সেটা সে কুড়িয়ে নেয়।

কানুনগো : এই, শোন !

তারিনী : এজ্ঞে ?

কানুনগো : (দূরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে) ঐ যে গাঁ-টা... ঐ-যে-রে, কাঁদর পেরিয়ে....কি যেন নাম ?

তারিনী : এজ্ঞে শিবকালীপুর—উ আজ্ঞা আমাদের গাঁ বটে, শিবকালীপুর !

কানুনগো : (বিড় বিড় করে) অ ! শি-ব-কা-লী-পু-র !

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬৫

স্থান—লং শটে শিবকালীপুর গ্রাম।

সময়—দিন।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬৬

স্থান—কঙ্কনার সেটেল্‌মেন্ট তাঁবু।

সময়—দিন।

কানুনগো দূরের গ্রামে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখটা জ্বল্‌জ্বল্ করে ওঠে। ধীরে ধীরে সে সাইকেলটার দিকে এগিয়ে যায়।

কানুনগো : অ !

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৬৭—১৭৪

স্থান—গাঁয়ের এক চাষীর বাড়ী।

ক্যামেরা পেছনে সরে এসে দেখায় পৌষলক্ষ্মী উৎসব উপলক্ষে বিলু ও একদল গ্রামের বৌ ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে আর গান গাইছে।

"এসো পৌষ, সোনার পৌষ
এসো আমার ঘরে,
বোসো আমার মা লক্ষ্মী
এ ঘর আলো করে।
আয় জননীর পা ধোয়াই
চুল দিয়ে আয় পা মোছাই
জননীকে দিই সাজায়ে
আলতা সিঁদুরে।
ঢেঁকুস্ কুস্ ঢেঁকুস্ কুস্
তুলবে ঢেঁকি বোল রে
কানায় কানায় উঠবে ভরে
লক্ষ্মী মায়ের কোল রে
যেয়ো না যেয়ো না পৌষ
যেয়ো না ঘর ছেড়ে
পিঠে ভাতে সুখে রাখো
স্বামী পুত্তুরে॥

সীতায় ধান মেলেলো
ঐ কদমের তলেরে
লক্ষ্মী মায়ের কৃপাতে
ক্ষেতে সোনা ফলেরে।

এই গান চলার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি শটে দেখান হয় আলপনা দেওয়া পিঠে ভাজার দৃশ্য। আরও দেখানো হয় কানুনগো সাইকেল চেপে গ্রামের রাস্তা দিয়ে আসছে; পদ্ম একা বারান্দায় বসে আছে ইত্যাদি।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৭৫

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ীর সামনের রাস্তা।

সময়—দিন।

কানুনগো সাইকেল চেপে ক্যামেরার দিকে আসছে। হঠাৎ সে দূরে কাউকে দেখতে পেয়ে থেমে যায়।

কাট্ টু।

খালি গায়ে একজন গ্রামবাসী কোদাল দিয়ে একটা নালা তৈরি করছে। ক্যামেরার দিকে পেছন।

কাট্ টু।

কানুনগো : এ্যাই! ওরে এ্যাই! এই!....

কাট্ টু।

খালি গায়ের লোকটা কানুনগোর দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় সে দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

কানুনগো : হ্যাঁ, তোকে তোকে! শোন্ শোন্, শোন্ না...

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত এই ব্যবহারে হতবাক। সে এগিয়ে এসে কানুনগোর সামনে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

কানুনগো : ইয়ে তোদের ইদিকে বায়েনপাড়াটা কোন্ রাস্তায় রে? ঐ যে....চারদিকে বাঁশবন....মশা! ....বায়েনপাড়া!

দেবু যারপরনাই বিস্মিত। কোন উত্তর দেয় না। এই অচেনা লোকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত সে চোখ বুলিয়ে নেয়।

কানুনগো : আ মোলো! অমন মরা মাছের মতো চেয়ে আছিস কেন? বোবা নাকি?

দেবুর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে কর্কশ উগ্র একটা সঙ্গীত খুব তাড়াতাড়ি জোরে বেজে যায়। দেবু সরাসরি কানুনগোর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে—

দেবু : না!...কি বলবি বল্?

কথাটা ঠিক শুনতে না পেলেও কানুনগো দেবুর স্পর্ধা দেখে রেগে যায়।

কানুনগো : কি বললি?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৭৬

স্থান—গ্রামের যে কোন জায়গা।

সময়—সন্ধ্যা।

পশ্চিমের আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে সিলুট গ্রাম। শঙ্খ ধ্বনিত হয়। অনিরুদ্ধ ফ্রেমে ইন্ করে। গ্রামের মেয়েরা প্রদীপ হাতে চলেছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৭৭

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে বাঁশ ঝাড়।

সময়—সন্ধ্যা।

অনিরুদ্ধ বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে বাড়ী ফিরছে। দূরে পৌষ-লক্ষ্মীর গান শুনে একটু থামে, আবার চলতে শুরু করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৭৮

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—সন্ধ্যা।

একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বারান্দায় বসে আছে পদ্ম। তার দৃষ্টি শূন্য, শুকনো, ভাবলেশহীন।

অনিরুদ্ধ উঠোনে এসে পদ্মকে দেখে, চারদিকে চোখ বুলোয়। পদ্ম নিরুত্তর।

অনিরুদ্ধ : একি! বাতি জ্বালিস নাই? (তুলসীতলার দিকে চেয়ে) সন্ধ্যেও দিস নাই নাকি?

পদ্ম উঠে গিয়ে কুলুঙ্গি থেকে লম্ফটা নেয়।

অনিরুদ্ধ : (দাওয়ায় উঠে এসে) বলি ব্যাপার কি তোর? ....সাত কথাতেও রা' করিস না? দিনরাত কি ভাবিস এত?....কার কথা?

কাট্ টু।

পদ্ম তীক্ষ্ণভাবে রিঅ্যাক্ট করে।

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে—

অনিরুদ্ধ : এই তুই !....তুই-ই আমার লক্ষ্মী ছাড়ালি—বুঝলি ?

পদ্ম কি !!

অনিরুদ্ধ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই তুই !! যখন ভাখো, একেবারে উদাসিনী রাই হয়ে বসে রয়েছেন—পটের রানী ! আজ বাদ কাল পৌষলক্ষ্মী, কুনো খেয়াল নাই ! আর এই শোন্,... শোন্ অন্য বাড়ীতে কি হচ্ছে ?

দূর থেকে উলুধ্বনি ও পৌষের গান শোনা যায়।

পদ্ম : এতবড় কথা ! ·

অনিরুদ্ধ : হ্যাঁ হ্যাঁ, এতবড় কথা !....কোন্ পিত্তোশে ? কোন্ পিত্তোশে মানুষ এখেনে থাকবে ?·· কি দিছিস তুই আমাকে ? ···দিনরাত শুধু কবচ, তাবিচ আর মাদুলি। দূর্ দূর্, এর নাম সংসার ? ··যদি বংশে বাতিই না জল্লো তবে শ্মশান খারাপ কিসে ?

পদ্ম প্রায় ফ্যাকাশে চোখে তাকায় অনিরুদ্ধর দিকে। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

অনিরুদ্ধ : হ্যাঁ হ্যাঁ শ্মশান শ্মশান ! বাঁজা বৌয়ের থেকে শ্মশান অনেক ভালো !

অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকে যায়।

ক্যামেরা পদ্মর ওপর স্থির। তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ। কয়েক মুহূর্ত শোকাহত হয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পদ্ম। তারপর একবারে ভেতর থেকে গভীর ক্ষোভে দুঃখে চাপা রাগে ফিস্ ফিস্ করে ওঠে।

পদ্ম : তবে, তবে তাই হোক্....তাই হোক্ · (হঠাৎ রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে) শ্মশানই হয়ে যাক্ সব—

রান্নাঘরে জলন্ত উনুনের দিকে ছুটে যায় পদ্ম।

পদ্মর গলা শুনে অনিরুদ্ধ বিচলিত হয়। ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসে।

পদ্মর চলন্ত পা অনুসরণ করে ক্যামেরা। রান্নাঘরে উনুনের কাছে গিয়ে সে একটা জলন্ত কাঠ বার করে নেয় উনুন থেকে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : পদ্ম !

কাট্ টু।

পদ্ম : (উন্মাদের স্বরে) শ্মশানের চিতেই জলুক আজ থেকে—

পদ্ম ছুটে যায় বারান্দার কোণে এবং জলন্ত কাঠটাকে গুঁজে দেয় খড়ের চালে।

অনিরুদ্ধ ছুটে যায় পদ্মর দিকে।

অনিরুদ্ধ : (বাধা দিয়ে) পদ্ম ! · পদ্ম কি করছিস ?

পদ্ম : ছেড়ে দাও ···ছেড়ে দাও আমাকে।

অনিরুদ্ধ : শোন্....শোন্ পদ্ম—

পদ্ম : ছাই হয়ে যাক্....শেষ হয়ে যাক্ সব কিছু—

অনিরুদ্ধর বাধা অগ্রাহ্য করে পদ্ম বারান্দার অন্য কোণে ছুটে যায়। অনিরুদ্ধ ওকে থামাতে চেষ্টা করে।

অনিরুদ্ধ : আরে পদ্ম, শোন্ শোন্—

পদ্ম : বলছি তো ছেড়ে দাও আমাকে—আমার মাথার ঠিক নেই—

অনিরুদ্ধ : (ধমকে) পদ্ম, কি করছিস !!

পদ্মর হাত শক্ত করে ধরে থাকে অনিরুদ্ধ। আর ঠিক তখনই খুব নীচু স্বরে উচ্চিংড়ের নাকি-কান্না শোনা যায়।

ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় উচ্চিংড়ে উঠোনে দুজনকে ঝগড়া করতে দেখে বারান্দার কোণে গিয়ে বসেছে। তার চোখ জলে ভর্তি। ভয়ও পেয়েছে সে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ও পদ্ম উচ্চিংড়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে : খিদে নেগেচে !....দুটো খেতে দে কেনে ?

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ও পদ্ম।

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে : দুটো খেতে দে !·· খিদে নেগেচে !

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ও পদ্ম। ক্যামেরা ধীরে ধীরে পদ্মর মুখে চার্জ করে।

উচ্চিংড়ে : (off voice) এ্যাই ! · দে না !....দুটো খেতে দে !

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে কাঁদতে শুরু করে।

কাট্ টু।

ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা মৃদু সুর বেজে ওঠে। পদ্ম জলন্ত কাঠের টুকরোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে, আস্তে আস্তে তার হাতটা নীচে নামে।

কাঠটা পড়ে যায়। ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করে। কাঠের আগুন যায় নিভে।

বি—র—তি

ফেড্ আউট।

(পরবর্তী অংশ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়)

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 July 1979 Vol. 12 No. 10

Published by Asoke Chatterjee from Cine Central, Calcutta, 2 Chowring
Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANI

বীক্ষণ

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

১৯১৯
১৯৭৯

সোভিয়েত চলচ্চিত্রশিল্পের
ষাট বছর







জনগণই আমাদের শক্তির উৎস

বামফ্রন্ট সরকার ৩৬ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক দলগুলির সভা, সমিতি, সংগঠন ও আন্দোলন করার পূর্ণ অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

গ্রাম শহরের শ্রমজীবি মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক ও আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করছেন। ক্ষেত মজুররা বিধিসঙ্গত নিম্নতম মজুরী আদায় করছেন। বর্গাদাররা 'অপারেশন বর্গায়' পাচ্ছেন বর্গার স্বত্ব। নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার। গ্রামীণ জনজীবনে আজ এসেছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের জোয়ার।

শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হচ্ছেন জয়যুক্ত। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এসেছে নতুন জোয়ার।

বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের অবসান ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে দৃঢ় সংকল্প।

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বেকার সমস্যা, বিদ্যুত সমস্যা ও নানাপ্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী অনেকগুলি ব্যবস্থাই নিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার।

গ্রাম-শহরের কায়েমী স্বার্থ ও জনগণের শত্রুরা গণআন্দোলনের আঘাতে আতঙ্কিত। তাই তার মুখপাত্ররা আর্তনাদ সুরু করেছেন, ধুয়ো তুলছেন আইন ও শৃঙ্খলার।

বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সমস্ত সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন পশ্চিমবাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে চান। এই সরকার একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন জনগণই শক্তির উৎস।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৮৮৪৪ /৭৯



"সোভিয়েত চলচ্চিত্রের ষাট বছর"

১৯১৯ সালের ২৭শে আগস্ট সোভিয়েত রাষ্ট্র চলচ্চিত্র শিল্পসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ঐতিহাসিক আদেশনামায় স্বাক্ষরকারী ছিলেন লেনিন। লেনিন ঘোষণা করেছিলেন যে "সকল শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ"।

লেনিনের ঘোষণাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামগ্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে অক্টোবর বিপ্লবের মহান আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা শুধু জীবনের সত্যরূপ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলেন না, সমাজ বিকাশের দ্বন্দ্ব ও গতি-প্রকৃতিকে উপলব্ধি করে সর্বহারা শ্রেণীর নতুন শিল্পবোধের সৃষ্টি করলেন। এই নূতন শিল্পবোধের মূল ভিত্তি হ'ল শ্রেণীচেতনা ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার দৃঢ় আকাঙ্খা।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পতাকাবাহী সোভিয়েত চলচ্চিত্র নিরলসভাবে বুর্জোয়া ধ্যান ধারণা ও প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকলো। দেশের শিল্পায়ন, কৃষিতে সমবায় খামারের প্রতিষ্ঠা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সোভিয়েত জনগণের সংগ্রাম ও সাফল্য চলচ্চিত্রায়িত হতে থাকলো। সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ ও চলচ্চিত্র কর্মীরা সোভিয়েত ছবি দেখে উৎসাহিত হলেন।

ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই-এর দিনগুলিতে বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষ সোভিয়েত ছবি দেখে উদ্বুদ্ধ হলেন।

বিশ্বযুদ্ধের পরেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞ সোভিয়েত চলচ্চিত্রে বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হল।

আজকে তাই সোভিয়েত চলচ্চিত্রের ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আমরা স্মরণ করতে চাই কুলেশভ, ভের্তভ, আইজেনস্টাইন, পুডোভ্কিন, ডভঝেঙ্কো, ডনস্কয় ও অন্যান্য মহান চলচ্চিত্রকারদের যাঁরা সোভিয়েত চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শবাহী হাতিয়ার হিসেবে।

বর্তমান শতাব্দীর ইতিহাসে মহত্তম ভূমিকায় অধিষ্ঠিত সেই সোভিয়েত চলচ্চিত্র আমাদের প্রেরণার মত কাজ করুক—সোভিয়েত চলচ্চিত্রশিল্পের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শুধু একথাটিই বলছি।

"আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রসংক্রান্ত সমগ্র শিল্প ও বাণিজ্যের পিপলস্ কমিসারিয়াট অফ এডুকেশন বিভাগে হস্তান্তর সম্পর্কে"

১। সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রসংক্রান্ত সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য, এই শিল্প ও বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সংগঠন এবং কারিগরী উপায় ও যন্ত্রপাতির সরবরাহ ও পরিবেশন পিপলস্ কমিসারিয়াট অফ এডুকেশন-এর উপর ন্যস্ত হবে।

২। এই বিষয়ে পিপলস্ কমিসারিয়াট অফ এডুকেশনকে এতদ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে: (ক) সুপ্রীম কাউন্সিল অফ ন্যাশনাল ইকনমি-র অনুমতি অনুযায়ী বিশেষ কোন আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান বা সমগ্র আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র-শিল্প জাতীয়করণ করা, (খ) আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বা দ্রব্যাদি দখল করা; (গ) আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রশিল্পের কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির স্থির ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা, (ঘ) আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রশিল্প ও বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব করা, (ঙ) বিভিন্ন সময়ে নির্দেশনামা ঘোষণা করে আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রশিল্প ও বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করা, যে নির্দেশনামা এই শিল্প-সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিবর্গ এবং সোভিয়েত সংগঠনগুলির প্রতি বাধ্যতামূলক হবে।

চেয়ারম্যান অফ দি কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিশার্স
ভি. উলিয়ানভ (লেনিন)

একজিকিউটিভ অফিসার অফ দি কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিশার্স
ভল্যাড বনচ ব্রুয়েভিচ্

মস্কো, ক্রেমলিন
২৭শে আগস্ট, ১৯১৯

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া,
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরঘাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে লেনিনগ্রাডের কাছে রেপিনাতে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র বসেছিল। উপলক্ষ্য ছিল ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি। আলোচনার বিষয়: আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র শিল্পে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'Soviet Film' পত্রিকায় ১৯৬৮ সালে এই আলোচনার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। চিত্রবীক্ষণেও এর আগে এই আলোচনাগুলির কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই আলোচনাগুলি আমরা প্রকাশ করছি।

চলচ্চিত্র-শিল্পের নতুন দর্শন

জর্জি স্টয়ানভ-বিগর (বুলগেরিয়া)

অনুবাদ: রবীন ভট্টাচার্য

সমগ্র মানব-ইতিহাসে মহান অক্টোবর-বিপ্লব এক অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয় ঘটনা। এই বিপ্লব অসম্ভব গতিশীল, এই বিপ্লব শুধু ধ্বংস ও বর্জনে সীমিত নয়, বরং ব্যাপ্ত মহান সৃজনশীলতায়, সমগ্র মানবজাতিকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করায় এবং ব্যক্তি ও সমাজ-সম্পর্কে নতুন ও প্রগতিশীল আদর্শের ঘোষণায়।

আমরা যখন ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সিভিল ওয়ার সম্পর্কিত তথ্যচিত্রগুলি দেখি, তখন আমাদের বিশ্বাস হয়না যে, ছবিগুলি অর্ধশতাব্দী আগে তোলা।

...পেট্রোগ্রাড্ ও মস্কোর শ্রমিকদের উত্তাল মিছিল, লালফৌজবাহিত ট্রেনগুলি, গোলন্দাজবাহিনীর তরুণেরা, বিপর্যয়, ক্ষুধা, সেকালের পোশাক-পরা জনতা, সামান্য অস্ত্রাদিতে সজ্জিত, আবার ছুঁচালো টুপি, মেশিনগানের শকট, অশ্ব, বেয়নেট এবং এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে দেখা মুখের সারি, হাসি-খুশী অথবা বিষন্ন, আমরা আর তাদের দেখবনা।

আইজেনস্টাইন, ভের্তভ, ভ্যাসা লিয়েভ ভ্রাতৃদ্বয়, রম চলচ্চিত্র-পরিচালক হওয়ার আগে এ রকম দেখতে ছিলেন। আজকের অধ্যাপক, স্থপতি, শিক্ষাবিদ ও মহাকাশচারীদের পিতারা দেখতে এরকম ছিলেন, যাঁরা দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষকে উপেক্ষা করে, দেশের ভিতরের ও বাইরের চূড়ান্ত বাধা অতিক্রম করে বিপ্লবের পতাকা উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের মধ্যে সবাই এই বিপ্লব ও তার ফল অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে এর বিপুল গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কার বাদ দিয়ে সমকালীন সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়।

আমি আমার দেশ বুলগেরিয়া থেকে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই।

কুড়ি দশকের গোড়ার দিকে প্রগতিশীল বুলগেরিয়ান সংবাদপত্র আর. এল. এফ. (ওয়ার্কার্স' লিটারারী ফ্রন্ট) বেশ কয়েকজন ইয়োরোপীয় লেখকের কাছে সোভিয়েত চলচ্চিত্র সম্পর্কে এক প্রশ্নমালা পাঠিয়েছিলেন। প্রখ্যাত প্রগতিশীল ফরাসী লেখিকা জেরমাইন দুলাক এই প্রশ্নমালার উত্তরে লিখেছিলেন যে, সোভিয়েত চলচ্চিত্রের অর্থ হচ্ছে চলচ্চিত্রশিল্পের মৌলিক আদর্শের নবজন্ম, যে আদর্শ ভাবালু কাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত ও বিনষ্টপ্রায়। জীবনের গভীরে প্রবেশের ছাড়পত্র সোভিয়েত ছবিগুলি অর্জন করেছে, এটাই তাদের সাফল্যের রক্ষাকবচ।

হেনরী বারবুসে বিশ্বাস করতেন যে, সোভিয়েত চলচ্চিত্র-পরিচালকরা তুলনারহিত, কেননা তাঁরা কাহিনী ও দৃশ্যসজ্জায় জীবনের রং লাগাতে সক্ষম এবং সৃষ্টি করতেন এমন ছবি, যা গভীর উদার প্রেরণার উপকরণে জীবন্ত বাস্তব।

আমি এ প্রসঙ্গে আর কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত উপস্থিত করার প্রয়োজন দেখছিনা, কেননা তাঁদের বক্তব্য বহুবার প্রকাশিত হয়েছে ও বহুল প্রচারিত।

আমরা ফ্যাসিস্ট দেশগুলিতে[১] সোভিয়েত চলচ্চিত্রপ্রসঙ্গে পুলিস ও ও সেন্সর কর্তৃপক্ষের চিঠিপত্রের সারাংশ জনসমক্ষে উপস্থিত করতে পারি, তা থেকে বলা যেতে পারে যে, শত্রুপক্ষও একভাবে সোভিয়েত ছবিকে প্রশংসা বা অভিনন্দন জানিয়েছে।

এটা নিশ্চয়ই ঠিক নয় যে, যে জার্মাণ কৌসুলী বিচারালয়ে এক অদ্ভুত প্রতিবাদী 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' ছবিটি হাজির করেছিলেন তিনি শুধু আমাদের মতই বুঝতেন যে, সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্প অন্যান্য দেশের থেকে ভিন্ন চরিত্রের। তিনি দাবী করলেন যে, এই ছবিতে কিছু কিছু দৃশ্য রয়েছে যা সামরিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এমন কিছু দৃশ্য যেখানে বিদ্রোহের কথা আছে, যেখানে সাধারণ সৈনিকদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করতে দেখা যাচ্ছে। একজন বুলগেরিয়ান কৌসুলী আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি 'দি ব্যাটলশিপ পোটেমকিন', 'মাদার', 'দি আর্থ', ও 'শ করস্' একেবারে নিষিদ্ধ করে দিলেন।

'চ্যাপায়েভ' ছবিটি তেরবার সেন্সর করা হয়েছিল এবং অবশেষে চেনা যায়না এমন ক্ষত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। 'দি থার্টিন',

১ কুড়ি বা তিরিশ দশকে

'সার্কাস', 'ট্রাক্টর ড্রাইভার্স', 'আলেকজান্ডার নেভস্কী', 'দি ব্লু এক্সপ্রেস' ছবিগুলি সেন্সর কর্তৃপক্ষের রোষদৃষ্টিতে প্রায় একইরকমভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল।

আমি বুলগেরিয়া ছাড়া অন্য কোন দেশের কথা জানিনা যেখানে সোভিয়েত ছবি-প্রদর্শনের আগে প্রেক্ষাগৃহে পুলিসের নির্দেশ-অনুযায়ী পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘোষণা ছবির পর্দায় দেখানো হত :

"অনুগ্রহ করিয়া হাততালি দিবেননা।

এই নির্দেশ লঙ্ঘন করা হইলে ছবির প্রদর্শন বন্ধ হইয়া যাইবে।"

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বুলগেরিয়াতে একজন তরুণ কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন 'চ্যাপায়েভ' ছবিটি সাতবার দেখার অপরাধে। তরুণটির আশা ছিল যে, তিনি ছবির নায়ককে নদী অতিক্রম করতে দেখবেন, প্রতিটি সময় তাঁর ধারণা ছিল যে, এই আশা সার্থক হবে। তরুণটির কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিলনা যে, ছবির নায়ক কমাণ্ডার এমন অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্প আদর্শগতভাবে নতুন—এই ধারণার প্রমাণ এর চেয়ে ভালোভাবে উপস্থিত করা সম্ভবতঃ সম্ভব নয়। এটা শুধু সুন্দর সম্পাদনা, অপূর্ব ফোটোগ্রাফি বা চলচ্চিত্রের কৌশলগত খুঁটিনাটির বিষয় নয়। ফ্যাসিস্ট পুলিস এই সমস্ত কিছু বুঝতনা। এই ফ্যাসিস্ট দস্যুরা তাদের শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে সঠিকভাবেই সোভিয়েত চলচ্চিত্রের মূল চরিত্র-আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই তাঁরা ভীত হয়েছিলেন সোভিয়েত ছবির বৈপ্লবিক স্বরূপ উদঘাটনে যে, বৈপ্লবিক সত্যের দর্শনে বুলগেরিয়ার শ্রমজীবী মানুষ শত সহস্র বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ক্রমশঃ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় যাঁরা মহান প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে এই সোভিয়েত ছবিগুলি ছিল প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস। প্রতিরোধ-সংগ্রামে যোগ দিয়ে তাঁরা সোভিয়েত ছবির বীর নায়কদের নামে নিজের নিজের বাহিনীর নাম রাখতেন, যেমন কমকা, মুক্তাকা, ক্লিম, চ্যাপায়েভ…। এই অকুতোভয় সাহসী নায়কদের কথা মনে রেখে এই বীর যোদ্ধারা যুদ্ধ করতেন এবং মৃত্যুর সময়ে তাঁদের এই বিপ্লবী আদর্শ অটুট ছিল।

বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা বিবিধ দার্শনিক, নান্দনিক, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাবলী নিয়ে ছবি করেছেন, নতুন অনুসন্ধান ও নতুন মূল্যায়নে এর সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন যে, সমস্যাবলী গ্রিফিথের ছবিতে পরীক্ষার বিষয় ছিলনা এবং যে সমস্যাবলী বর্তমানকালে বার্গম্যান বা গদারের ছবিতে অনুপস্থিত।

নিঃসন্দেহে এই দৃষ্টিকোণজাত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভূমিতে প্রতিভাবান্ সৃজনশীল শিল্পী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে এবং যার থেকে অতুলনীয় সম্ভার, নতুন রীতি ও আঙ্গিক জন্মলাভ করেছে।

আজকে চলচ্চিত্রে নতুন ফরাসি-সাহিত্যের প্রভাবপ্রসঙ্গে বহু কিছু লেখা হচ্ছে, চলচ্চিত্রের ভাষা-পরিবর্তনে জয়েস্ বা কাফ্কার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু, ডভ্ঝেঙ্কো যুদ্ধের পরে তাঁর শেষ চিত্রনাট্যে জয়েস্ বা কাফ্কার প্রভাব ছাড়াই ইউক্রেনিয়ান্ ধ্রুপদী সাহিত্য ও মায়াকোভস্কীর রচনা অবলম্বন করে এক নতুন বিন্যাসে কাহিনীকে উপস্থিত করেছিলেন। কাহিনীর এই বিন্যাস, সময় ও স্থানের অবস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি কাহিনীর বিস্তার চৈতন্যবাদের প্রবাহে, চিন্তার সংলগ্নতায়; কথোপকথনে সমস্ত ক্রিয়াপদ ও ভাব ব্যবহৃত—বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যত ইত্যাদি।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্পের অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের চলচ্চিত্র-শিল্পকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে এ কথা সম্ভবতঃ বলার অপেক্ষা রাখেনা। এই ঐতিহ্য এই সমস্ত দেশের জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পকে বুদ্ধিদীপ্ত, অভিজ্ঞতাপুষ্ট শিল্পবোধের আলোকে নতুন সম্ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব ও আমেরিকান চলচ্চিত্র

জে লীডা [আমেরিকা]

বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র-জগতে এক কথায় সমগ্র বিশ্বে অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র সম-অর্থবাহীরূপে প্রতিভাত হয়েছে। ইয়োরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রনির্মাতা ও দর্শকদের কাছে সোভিয়েত ছবির যে কোন সাফল্য বা গৌরব ১৯১৭ সালের বিপ্লব সঞ্জাত ফল বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বাস্তবতার প্রতিফলনে আমেরিকান চলচ্চিত্র সাফল্য ও বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত ছিল। বায়োগ্রাফ কোম্পানীর হয়ে তোলা গ্রিফিথের দশ বা কুড়ি মিনিটের ছবিগুলি চলচ্চিত্রে বাস্তব উপকরণের সার্থক ব্যবহারের সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইয়োরোপে, বিশেষতঃ, ফ্রান্সে ও ডেনমার্কে বাস্তব ঘটনাবলীর নাটকীয় উপস্থাপনা গ্রিফিথকে এই পথ অনুসরণে ও আরো সার্থক রূপায়ণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৯১৮ সালে আমেরিকান চলচ্চিত্রশিল্প বিশিষ্ট ব্যবসায়ে পরিণত হল। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, ভূ-সম্পত্তি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী নীতি, নিয়ম ইত্যাদির উপর ক্রমাগত নির্ভরশীলতায় আমেরিকান চলচ্চিত্রশিল্প ক্রমশঃ পদ্ধতি, কাহিনী এবং প্রযোজনার বিভিন্ন ছকে গণ্ডীবদ্ধ হতে শুরু করল। চলচ্চিত্রের অঙ্গন থেকে বাস্তবজীবন প্রায় নির্বাসিত হয়ে গেল। কখনো কদাচিৎ ফ্লাহার্তি, স্ট্রহিম বা চ্যাপলিনের মত উদ্ধত মহৎ শিল্পী এই প্রচণ্ড নির্ধারিত গণ্ডীবদ্ধ মেকী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে স্বাভাবিক সতেজ, বাস্তবে প্রাণবন্ত, সৎ আবেগে উদ্ভাসিত ছবি তৈরি করতেন। ধনতান্ত্রিক জগতে সঙ্কট শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নতুন দুটি ঘটনা আমেরিকান ছবিকে বাস্তবের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করল: সবাক ছবির শুরু এবং সাফল্য এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্রের শিল্পগত সাফল্যের প্রভাব।

এই সময়ে আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশী প্রদর্শিত সোভিয়েত ছবিগুলি পর্যালোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, হিংসা ও ব্যঙ্গ এ ছবিগুলিতে বিশেষভাবে বিধৃত। এই বিষয়গুলির উপস্থাপনা তৎকালীন চলচ্চিত্র-পরিচালকদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। সে কারণেই পুডোভ্‌কিনের ছবি 'দি এণ্ড অফ সেণ্ট পিটার্সবার্গ' ছবিটির শিল্পপতির বীভৎস নিষ্ঠুরতার প্রতিফলন দেখা যায় এডওয়ার্ড জি, রবিনসনের ছোট সিজার চরিত্রে। তিরিশ শতকের বহু ছবির চিত্রনাট্য 'রোড টু লাইফ' ছবির দ্রুতগতিসম্পন্ন দৃশ্যাবলী দ্বারা প্রভাবিত।

বাস্তবতার এই বন্যা এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে ছবি তোলা সূচিত করল যা এযাবৎকাল ফিল্ম কোম্পানীগুলির কাছে ছিল এক কথায় অস্পৃশ্য। কোম্পানীগুলি অনেক সময়েই মনে করেছিলেন যে, পরিচালকরা বেশীদূর এগিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের ছবির বক্তব্য তরল করে দেওয়ার জন্য তাঁরা সব সময়েই সচেষ্ট ছিলেন এবং প্রায়শঃই চাপসৃষ্টি করে পরিচালকদের আপোষে বাধ্য করতেন। এই তরলীকরণ ও আপোষ সত্ত্বেও ছবিগুলি একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায়না, জীবনানুগ বাস্তবের সুর এ ছবিগুলিতে কিছু পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেই আমরা এগুলিকে আজও মনে রেখেছি। ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—'আই অ্যাম্ এ ফিউগিটিভ্ ফ্রম্ দি চেইন্ গ্যাং', 'ট্যাক্সি', 'টু সেকেণ্ডস্', 'কেবিন ইন্ দি কটন', 'ওয়াইল্ড বয়েজ অফ্ দি রোড্' ও 'মেয়র অফ হেল্'। এই বিষয় ও পদ্ধতি পরবর্তী ছবিগুলিতেও অনুসৃত যেমন 'বর্ডার টাউন', এবং 'ব্ল্যাক ফিউরি এণ্ড ব্ল্যাক লিজিয়েন'। শেষ ছবিটি আমেরিকার তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সংগঠন কু ক্লুক্স্ ক্ল্যানের প্রতি তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষ আক্রমণ।

কিছু কিছু পরিচালক বাস্তবতার অভ্যুদয়ের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের সমগ্র প্রচেষ্টা এই ধারার অনুসারী করে তুললেন। প্রতিভাবান রাউবেন মামাউলিয়ান এঁদের মধ্যে অন্যতম। মামাউলিয়ান মস্কোর মঞ্চজগৎ থেকে নিউইয়র্কের রঙ্গমঞ্চে যোগ দিয়েছিলেন। এই পালাবদলের সন্ধিক্ষণে তিনি চলচ্চিত্র-জগতে প্রবেশ করলেন এবং অসাধারণ বাস্তবানুগ ছবি তুলে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন। তাঁর ছবি 'এ্যাপ্লজ' (১৯২৯) ও 'সিটি স্ট্রীটস্' (১৯৩১) সোভিয়েত মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত। কিং ভিদর এর আগেই জীবনানুগ বাস্তবতায় অনুরাগের জন্য চলচ্চিত্রশিল্পব্যবস্থার বিরাগভাজন হয়েছিলেন, এই সময়ে তিনি কোন স্টুডিওর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেননা। ১৯৩৪ সালে ভিদর স্বাধীনভাবে একটি ছবির প্রযোজনা করলেন। বেকার শ্রমিকদের একটি কৃষি-সমবায়-স্থাপনের ঘটনা নিয়ে তোলা এই ছবির নাম 'আওয়ার ডেইলি ব্রেড্'। এ ছবির বিষয়বস্তু একদিকে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট ও অপরদিকে বেশ কিছু সোভিয়েত ছবিতে ব্যবহৃত আঙ্গিকগত পদ্ধতির ব্যবহার তুলে ধরল। আঙ্গিকগত এই পদ্ধতি বিশেষ করে তুরনের 'তুর্কসিব' ও ব্রেইজম্যানের 'দি আর্থ ইজ থার্স্টি' ছবিতে পরীক্ষিত। এমনকি, আইজেনস্টাইনের অসমাপ্ত ছবি 'কুই ভিভা মেক্সিকো' আমেরিকান ছবিতে দ্রুত ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করল। 'কুই ভিভা মেক্সিকো' 'ভিভা ভিলা' (১৯৩৪) ছবিটির মূল অনুপ্রেরণা যা পরবর্তী দুই দশক ধরে মেক্সিকোর বিশিষ্ট চলচ্চিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে অব্যাহত ছিল।

ইলিয়া ট্রউবার্গের 'ব্লু এক্সপ্রেস' ছবিটির কাহিনী নবরূপে অনূদিত হল আমেরিকান ছবিতে। জোসেফ স্টেনবার্গ ও প্যারামাউন্ট স্টুডিও এই কাহিনী পরিবেশনের মাধ্যমে মার্লিন ডিয়েট্রিশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ফলতঃ 'ব্লু এক্সপ্রেস' ছবির সমস্ত সামাজিক বাস্তবতা 'সাংহাই এক্সপ্রেস' (১৯৩১) ছবিতে অনুষ্ঠিত।

যখন এসথার শাব নির্দেশিত 'ক্যাননস অব ট্রাক্টরস' ছবিটি আমেরিকায় পৌছাল, তখন এই শিল্পীর মতবাদ ও সৃজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমেরিকান চলচ্চিত্র-সমালোচকদের আলোড়িত করল এবং গিলবার্ট সেল্ডেস যুদ্ধোত্তর যুগের আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র তুলে ধরলেন তাঁর 'দিস ইজ আমেরিকা' (১৯৩৩) ছবিতে।

আমেরিকান চলচ্চিত্রশিল্পীদের সংযোগ ও যোগসূত্র শুধু আইজেনস্টাইন ও শাব, এক ও রেইজম্যান্ বা পুডোভ্কিন্ ও ট্রউবার্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এই প্রথিতযশা সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের অনিবার্য প্রভাব আমাদের যুগের আমেরিকান চলচ্চিত্র-পরিচালকদের প্রেরণাস্বরূপ। তুরিন বা ভের্টভের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির সমারোহের সময় রিচার্ড লিকক অত্যন্ত তরুণ, তবুও লিককের বর্তমান শিল্পপ্রতিভা বহুলাংশে এই প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের প্রেরণা-সঞ্জাত। জীবনানুগ বাস্তবতার প্রতিফলনে সমৃদ্ধ আর একজন আমেরিকান চলচ্চিত্রকার এলিয়া কাজান সম্প্রতি এক ফরাসী পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, তাঁর সমগ্র শিল্পীজীবনে ডভ্ঝেঙ্কোর প্রভাব অপরিসীম, বিশেষতঃ ডভ্ঝেঙ্কোর 'এয়ারোগ্রাড' ছবিটি তাঁর শিল্প-ভাবনার আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্র-গত যোগসূত্র কোন যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় কাজেই আমার আলোচনা যা তিরিশ দশককে কেন্দ্র করে করা হয়েছে নিঃসন্দেহে অসমাপ্ত ঃ অক্টোবর বিপ্লব সোভিয়েত চলচ্চিত্রে যেভাবে উদ্গত, সেভাবে আমেরিকার চলচ্চিত্র-শিল্পের সার্বিক কাঠামোয় বিপুলপ্রভাবে বিস্তারিত।

অক্টোবর বিপ্লব ও চলচ্চিত্র

ফার্নাণ্ডো বিরি [আর্জেন্টিনা]

চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমি যে বইটি প্রথম পড়েছি সে বইটি হল আইজেন-স্টাইনের 'ফিল্ম সেন্স'। সে অনেক বছর আগের কথা। আমি তখনো আমার কৈশোরে, বাস করছিলাম এক গ্রামে (সান্তা ফে, আর্জেন্টিনা) কর্কটক্রান্তির সীমানায়। সেখানেই আমার জন্ম, সেখানেই আমি বড় হয়েছি এক ভীষণ বিরাট নদী পারানার তীরে। যে কোন তরুণের মত আমিও প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিলাম—একদিকে প্রথমে স্কুলে ও পরে কলেজে আইন পড়াশুনা, অপরদিকে আমার সত্যকারের আকাঙ্ক্ষা একটা ভোজবাজিকর, ভবঘুরে বিদূষক ও জাদুকর হওয়ার তাড়নায়। আমি অবশেষে শেষেরটিই বেছে নিলাম। আমি নিজস্ব পুতুলনাচের দল খুললাম, 'ডন্ কুইক্সোট' থেকে ধার করে দলের নাম রাখলাম ' দি ডেন অফ পেড্রো দি টিচার'। বিভিন্ন শহরে ও গ্রামাঞ্চলে আমি এই পুতুল-নাচের প্রদর্শনী-অনুষ্ঠান করেছিলাম।

তারপর আইজেনস্টাইনের সেই বই যা আমি তাঁর ছবি দেখার অনেক আগেই পড়েছি, আমাকে চলচ্চিত্রের দিকে আকৃষ্ট করল। আমি বলতে চাইছি যে, ছোটবেলা থেকেই আমরা ছবি দেখি, ছবি দেখতে আমাদের ভালো লাগে, তখন মনে হয়, যে ছবি সারা পৃথিবীর কথা বলছে, এমন সমস্ত ছবির সংগ্রহ যাতে সমস্ত পৃথিবীটা দেখা যায়। আইজেনস্টাইনের উপলব্ধি চলচ্চিত্রজগতের এক নূতন আবিষ্কার। সরল-ভাবে বলতে গেলে, যে চলচ্চিত্র-শিল্প সংস্কৃত ও প্রকাশ-মাধ্যমের প্রকরণ হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী, চলচ্চিত্র আদর্শগত উপাদানে সমৃদ্ধ ও দৃশ্যগত উপস্থাপনায় এক বৃহদাকার ফ্রেস্কোর অনুরূপ।

অনেক পরে, আমি যখন আইজেনস্টাইনের ছবি দেখলাম, দেখলাম ঠিক সেই বইয়ের মত ইতিহাস তার অনুপ্রেরণার সঞ্জীবনে উপস্থিত।

বুয়েনাস এয়ার্সের ফিল্ম-ক্লাবে অনেক বছর বাদে আমি পুডোভ্কিন্ এবং ডভ্ঝেঙ্কোর ছবি দেখলাম। পুডোভ্কিন্ সম্পর্কে আমাকে আরো অনেক কিছু জানতে হল যখন আমি 'রোম এক্সপেরিমেণ্টাল সেণ্টারে' হাতে-কলমে কাজ করছি। সেখানেই আমি পুডোভ্কিনের 'সিনেমা এণ্ড সাউণ্ড সিনেমা' পড়ি।

চলচ্চিত্র-শিল্প এক জায়গায় অচল, অনড় হয়ে থেমে থাকেনি, ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর নব নব পরিবর্তন তুলে ধরে। কিন্তু আইজেনস্টাইন, পুডোভ্কিন্ ও ডভ্ঝেঙ্কো অক্টোবর-বিপ্লবজাত 'নতুন চলচ্চিত্রের প্রতীক হয়ে ল্যাটিন আমেরিকায় নতুন চলচ্চিত্রের জগতে স্বচ্ছ সাংস্কৃতিক ও জীবন্ত প্রেরণা হয়ে আজও অমলিন, আজও উজ্জ্বল।

অক্টোবর বিপ্লব ও মঙ্গোলীয় চলচ্চিত্র

চোইকিলিন চিমিদ [মঙ্গোলিয়া]

পঞ্চম মস্কো চলচ্চিত্র-উৎসব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে আমরা শুধু বিশেষ জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের কীর্তির স্বাক্ষরই দেখলামনা, দেখলাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের অতুলনীয় বিপুল প্রভাব। এই উৎসবের উদ্দেশ্য 'চলচ্চিত্রশিল্পে মানবতা ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী ও শান্তি'; এই উদ্দেশ্য বিপ্লবের আদর্শের অনুরূপ। বহু সভা-সমিতি, সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে যোগদানের মাধ্যমে আমার ধারণা হয়েছে যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মানুষ আমাদের দেশের অধুনা অতীত বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, কিন্তু, তাঁরা আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সাধারণভাবেও অবহিত নন।

এই উৎসবের সময়ে ১১ই জুলাই আমাদের দেশের মঙ্গোলীয় জনগণ বিপ্লবের ৪৬তম বার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করছিলেন। মঙ্গোলীয় জনগণের বিপ্লব প্রত্যক্ষভাবে অক্টোবর বিপ্লবের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত।

বিপ্লবের সাফল্য শুধু স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনই সূচিত করলনা, জাতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ ও সমগ্র জনগণের সংস্কৃতিতে প্রবেশের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলল।

বিপ্লবের পূর্বে মঙ্গোলিয়াতে কিছু কিছু ছবি সীমিত গোষ্ঠীর মধ্যে দেখানো হত। এ সমস্ত ছবির দর্শক ছিলেন রুশ-প্রভাবাধীন কিছু কিছু সামন্ত-অধিপতি। কিন্তু, বস্তুতঃ, ২০ দশকের শেষ দিক ও ৩০ দশকের গোড়ার দিক থেকেই বৃহৎ জনসমাজে নিয়মিতভাবে সোভিয়েত নির্বাক ছবির প্রদর্শনী শুরু হল।

এই ছবির মানুষ ও জীবনের সঙ্গে নিজেদের বহু পার্থক্য থাকলেও মঙ্গোলীয় জনগণ এ ছবিগুলির মধ্যে নিজেদের চরিত্র ও জীবনের কিছুটা প্রতিরূপ খুঁজে পেল।

১৯৩৬ সালে 'সন অফ মঙ্গোলিয়া' ছবিটি মুক্তিলাভ করল। মঙ্গোলীয় কাহিনী ভিত্তি করে ইলিয়া ট্রউবার্গ এ ছবিটি তুললেন, এ ছবিতে অনেক মঙ্গোলীয় অভিনেতা অভিনয় করেছিলেন। ত সেভেন নামে এক যাযাবর উপজাতীয়ের কাহিনী প্রসঙ্গে এ ছবিতে জনগণের বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ও মহান সৃজনশীল ক্ষমতার উত্তরণের আখ্যান বিধৃত।

ছবিটি সোভিয়েত ও মঙ্গোলিয়ার নতুন চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রথম যৌথ-প্রযোজনা। ১৯৩৫ সালে মঙ্গোলিয়াতে প্রথম স্টুডিও স্থাপিত হল। সঙ্গত কারণেই প্রথম দিকে তথ্য-চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে এই স্টুডিওর কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র জনগণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে ছবি তোলা শুরু হল। নতুন মানুষ, তার জন্ম, জীবিকা ও সামগ্রিক উন্নতি অর্থাৎ নতুন জীবনের প্রাণস্পন্দন স্পন্দিত হল মঙ্গোলিয়ার চলচ্চিত্রে এবং বস্তুতঃ সামগ্রিক সংস্কৃতিতে।

১৯২৫ সালে মঙ্গোলিয়ার বুদ্ধিজীবীরা ম্যাক্সিম্ গোর্কীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কোন কোন ইয়োরোপীয় পুস্তক তাঁরা মঙ্গোলীয় ভাষায় অনুবাদ করবেন। উত্তরে ম্যাক্সিম গোর্কী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তাঁরা যেন এমন সমস্ত বই বেছে নেন, যাতে ঘাত-প্রতিঘাত আছে, প্রচণ্ড চিন্তা-ভাবনা আছে ও যাতে সচল স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কারিগরী ও বিভিন্ন সাহায্য নিয়ে আমরা আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্প গড়ে তুলেছি। আমাদের চলচ্চিত্রকাররা সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষালাভ করেছেন এবং সোভিয়েত পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানদের সহযোগে বহু মঙ্গোলীয় কাহিনী-চিত্র নির্মিত হয়েছে। প্রখ্যাত সোভিয়েত-চলচ্চিত্রকার ইউরি টারিচ সপ্তদশ শতাব্দীর এক প্রখ্যাত মঙ্গোলীয় দেশপ্রেমিকের জীবনী নিয়ে বিরাট ছবি-নির্মাণে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন। ছবিটি হল 'হিরোজ্ অফ্ দি স্টেপ্' (১৯৪৫)। বর্তমান বছরে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় 'এক্সোডাস্' নামে ওয়াইড্ স্ক্রীনে ছবি তুলেছি।

যৌথ-প্রযোজনার ছবিগুলি খুবই জনপ্রিয়, যেমন 'হিজ্ নেম্ ইজ্ সুখে-বাতোর' (১৯৪২, পরিচালক-আলেকজাণ্ডার জারখি, ইয়োসিফ হেইফিটজ্). 'এনভয় অফ্ দি পীপ্ল্', ও 'দোজ্ গার্ল', এল্, ভান্‌গানের চিত্রনাট্য-অবলম্বনে দু'খণ্ডে তোলা 'ওয়ান্ অফ মেনি' ('ট্রেইল্ অফ্ এ ম্যান্'), ছবিতে একাধারে সৈনিক ও শিক্ষক এমন একজন সাধারণ যাযাবর উপজাতীয় মানুষের কাহিনী নিয়ে তোলা, 'সিন্‌স্ অ্যাণ্ড ভার্চু্‌স' (পরিচালক এন্ চিমিড -অসর্) ও 'হাই ওয়াটার' (পরিচালক ডি. ঝিয়েঝিড্)। এঁদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন।

মঙ্গোলীয় ছবিগুলি জীবনের বাস্তব প্রতিফলনে সমৃদ্ধ, বিবিধ আঙ্গিক-গত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শিল্পসম্মত নব নব সৃজনশীলতায় সজীব। মঙ্গোলীয় অভিনেতারা সংযত, অথচ সার্থক অভিনয়ে নিজেদের অভিনয়-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন।

আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প ক্রমশঃ উন্নতির পথে। নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়েছে (প্রতি ৬ জনের মধ্যে ১ জন কোন-না-কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণরত), বহু নতুন চিত্রগৃহ ও রঙ্গমঞ্চ দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হয়েছে। আমাদের এখন প্রয়োজন আরো বেশী ও আরো ভাল ছবি। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-পরিচালকদের এখন আশু কর্তব্য হচ্ছে জনগণের জীবনে গভীরভাবে প্রবেশ করা এবং সেই জীবনের চিত্র সার্থকভাবে প্রকাশ করা। নতুন বিষয়গুলি যেমন শিল্পায়ন, গ্রামাঞ্চলে সমবায়-মূলক খামারের সাফল্য ও নতুন সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির চিত্রায়ণ চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রকাশিত করতে হবে। আমাদের দেশ এক ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্তর পেরিয়ে এসেছে, সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, মাঝের ধনতন্ত্রের স্তর পেরিয়ে এসেছে। এই বিপুল ও মৌলিক পরিবর্তনের আলোকে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও জনগণের জীবনের মূলসূত্র-অনুধাবন আজকে মঙ্গোলীয় চলচ্চিত্রের আশু কর্তব্য।

অক্টোবর বিপ্লব এবং যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্র

স্টেভো অস্টোজিক ও রুডলফ্ স্রেমেক্

১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যুগোশ্লাভ জনগণের হাজার হাজার প্রতিনিধি ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ যোদ্ধা এবং রাজনৈতিক নেতারা। প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আমাদের "চাপায়েভাইটস"-দের সংগ্রাম বিপ্লবের ইতিহাসে এক মহান অধ্যায়।

অক্টোবর বিপ্লবের চিন্তাধারা এবং তার সাফল্য প্রগতিশীল ও স্বাধীন শিল্পী এবং সাংবাদিকদের ওপর এনেছে এক বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া।

ঝিভকোভিক রাজত্ব শেষ হওয়ার পর অবশেষে আমরা দেখতে পেলাম নিকোলাই একের ছবি "দি রোড টু লাইফ্"। এরপরই চলচ্চিত্রপ্রেমীরা দেখলেন গ্রিগরি আলেকজান্দ্রভের কমেডিগুলো। তারপর এলো আবার বন্ধ্যা দশা। তখন চলছিল জেভটিক-কোরোসেক-সিভেটকোভিক—স্টোজাডিনোভিকদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্ব। কিন্তু, অবশেষে একটি সময় এলো। যখন লুবজানার প্রথমশ্রেণীর ম্যাটিকা সিনেমা দেখালো ভ্লাদিমির পেট্রভের পিটার দি গ্রেটের দুটি অংশ। এই ছবির প্রদর্শনীর পরই ধর্মীয় এবং ফ্যাসিবাদী ছাত্ররা "স্ট্রেজ ভ ভিহাজু" পত্রিকার সঙ্গে মিলে সোভিয়েতবিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিল (এই বিক্ষোভকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে সাহায্য করেছিল পুলিস)।

একই সময়ে দেখা গেল ঝাগরেবে নিকোলাই একের ছবিকে প্রচণ্ড সফল হতে। টুসকানেক-এ উরানিয়া সিনেমাতেও পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখানো হয়েছিল। এমনকি বেশ কিছু লোক মেঝেতে বসে ছবিটি দেখেছিল।

সস্তা মিঠে প্রলোভনের ছবির বন্যায় বিরক্ত হয়ে এক সাংবাদিক "নাসা স্টাভারনস্ট" পত্রিকার ১৯৩৭ সালের পঞ্চম সংখ্যায় লিখেছিলেন 'আমাদের "চাপায়েভ", "দি ইউথ অফ ম্যাক্সিম," "উই আর ফ্রম ক্রনস্টাডট" দেখান'। এটাকে কিন্তু শুধু দুঃখজনক অসার আবেদন ভাবলে ভুল করা হবে। বরং, এটা ছিল সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড বিরক্তির অভি-ব্যক্তি। "তিনি লিখেছিলেন, ক্যামেরা ইতিমধ্যেই মস্ত মিথ্যেগুলোর বড় অংশ দেখিয়ে ফেলেছে সবরকমের অসার উপায়ের মধ্যে দিয়ে। গত তিন দশক ধরে ক্যামেরার সামনে মিথ্যের জালগোল পাকিয়ে হাজার হাজার চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই সব ছবি করিয়ে যে চায় ঐ হাজারো চোখকে অন্ধ করে দিতে। কিছু কিছু উজ্জ্বল মুহূর্ত ছাড়া জীবন তার সব বাস্তবতা নিয়ে অনুপস্থিত। কিন্তু, দেখে, মনে হয় এরা বোধ হয় জানেনা, একটা মহান অলৌকিকতা অপেক্ষা করছে। একটি সর্বশক্তিমান চোখ আছে যে আসল ঘটনাকে মনে রাখতে পারে, ধরে রাখতে পারে, আর সেই সঙ্গে দেখাতেও পারে জনগণ কেন অসুখী।'

"ব্যাটলশিপ পোটেমকিন" প্রথম আমদানী করে যুগোশ্লাভিয়া। তখনকার সার্বস, ক্রোট্‌স এবং স্লোভেন্স রাজত্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমস্ত রকম সতর্কতা সত্ত্বেও আইজেনস্টাইনের এই বৈপ্লবিক ছবিটি মস্কোর বলশয় থিয়েটারে উদ্বোধনের মাত্র সাত মাসের মধ্যেই আমাদের দেশে আনা হয়েছিল।

১৯২৬ সালের ৯ আগস্ট ঝাগরেবের সংবাদপত্র "ভিসার" লিখল, "এই সিজনের গোড়ার দিকে ঝাগরেবে "ব্যাটলশিপ্ পোটেম্‌কিন্" নামে অসাধারণ একটি ছবি দেখানো হবে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, এটা শুধু ইতিহাসের চলচ্চিত্রায়ন। কিন্তু এটা তা নয়। বরং, নিপীড়িত জন-গণের স্বাধীনতা এবং মানবিক অধিকারের সব থেকে আদিম এবং স্বাভাবিক

হচ্ছে এটি একটি মহান কবিতা। "ব্যাটল্‌শিপ্ পোটেম্‌কিন্‌" একটি সম্মিলিত কাজ এবং এর প্রধান চরিত্র জনগণ।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন এক অপরিচিত ২৮ বছরের যুবক। এই রুশ ছবির গভীরতার পরিমাপ হবে কিভাবে? এই নামহীন রুশী জনগণ মাঝামাঝি ধরণের কিছু করেনা। বরং যা করে তা হয়ে ওঠে মহান। এর কারণ, প্রত্যেক রুশী শুধু কাজের জন্য শিল্পকে ব্যবহার করেনা। বরং, যা করে, তাতে হয় বিস্ফোরণ। কোন কিছুই এই বিস্ফোরণকে রোধ করতে পারবেনা। এইভাবেই "ব্যাটলশিপ পোটেম্‌কিন্‌" তৈরি হয়েছে।"

যাই হোক, যুগোশ্লাভ পর্দাতে "পোটেম্‌কিন্"-এর প্রতিফলনের প্রচেষ্টা ভয়ংকরভাবে ব্যর্থ হয়।

আট বছর পর প্রখ্যাত স্লোভেন লেখক ডঃ ব্রাটকো ক্রেফ্ট শ্রেণীশত্রুদের আক্রমণ করে লিখলেন ক্রুদ্ধ ভাষায়। লেখাটি বেরিয়েছিল ১৯৩৮ সালে "ক্রিজিঝেভনস্ট" পত্রিকায়। তিনি লিখেছিলেন, "মহান চলচ্চিত্রশিল্পটির প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। আইজেনস্টাইন, পুডোভকিন্‌, ওটসেপ, এক, চ্যাপলিন, পাবস্ট এবং অন্যান্যরা আমার মনে এই বিশ্বাস এনে দিয়েছে। এই অল্প কিছু ছবি ব্যবসায়িক ছবির গ্যাঙ্গস্টারদের তৈরি বাধাগুলো ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছে। এদের শৈল্পিক ক্ষমতাকে ধন্যবাদ জানাই। চলচ্চিত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আশাবাদী। কেননা, আমি এর দাসত্ব-মোচনে বিশ্বাস করি। যা আসবে সর্বসাধারণের দাসত্বমোচনের মধ্য দিয়েই। ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সমাজকে মুক্ত করার সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি সম্ভবতঃ খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বর্তমানে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাতেই আছে চাবুক। আর, এই কারণেই এরা সমাজকে সেই ব্যাবিলনীয় দাসত্বে বেঁধে রেখেছে। আজকের চলচ্চিত্র-শিল্পের অস্তিত্ব এই দাসত্বের অন্ধকারের মধ্যে থাকলেও রাস্তা দেখানোর জন্য টর্চের আলো জ্বলেছে। শিল্পের পথে হাঁটতে গেলে, জনগণের বৃহত্তর অংশের মানসিক উন্নয়ন এবং সচেতনতা আনতে গেলে এর এই পথই ধরা উচিত।"

১৯৪৫ সালের স্বাধীনতার পর সেই সার্বিক উৎসাহজনক পরিবেশে আমাদের চলচ্চিত্র-দর্শকেরা সোভিয়েত ছবিগুলো দেখার সুযোগ পেলেন এতদিন যা ছিল তাঁদের কাছে স্বপ্ন। ঝিগা ভের্তভ, লেভ কুলেশভ, সের্গেই আইজেনস্টাইন, ভ্সেভোলোড পুডোভকিন্‌, আলেক-জাণ্ডার ডভঝেঙ্কো, মার্ক ডনস্কয়, গ্রিগরি কোজিনেৎসভ, লিওনিদ ট্রাউবার্গ, ভ্যাসিলেভ-ভায়েরা, সের্গেই য়ুৎকেভিচ, মিখাইল রম প্রমুখ চলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্র এবং নাটক যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্রের উন্নয়নে এক অনন্যসাধারণ তৈরি করেছে।

যুদ্ধপূর্ব নির্বাক যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্রকে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রাক্ ইতিহাস বলে ভাবা যেতে পারে। স্বাধীনতার ঠিক পরেই আমাদের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র তৈরির কোন বাস্তব সম্ভাবনা ছিলনা। যে সব ছবির মধ্য দিয়ে অক্টোবর বিপ্লবের চিন্তাধারার প্রতি যুগোশ্লাভ জনগণের আনু-গত্যকে ভালোভাবে দেখাতে পারবে। ছাই এবং ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেশ যখন জেগে উঠছে, অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলছে তখন চলচ্চিত্রের ক্যামেরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আরম্ভ করল সেই সব মুখ আর হাতের ছবির মধ্য দিয়ে। যারা ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করছিল, মৃতদের কবর দিচ্ছিল এবং নতুন করে তৈরি করছিল শহরগুলো, কারখানাগুলো।

অক্টোবর বিপ্লবের বিষয় যুগোশ্লাভ ছবিতে এলো অনেক পরে। যখন চলচ্চিত্রকারেরা বেশ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, খুঁজে পেয়েছে তাঁদের বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করার শৈল্পিক ফর্মকে।

সবপ্রথম এর পরিপূর্ণ উন্নতি দেখা গেল "ওলেকো ডানডিক" কাহিনী-চিত্রে। ১৯৫৭ সালে এটি সোভিয়েত-যুগোশ্লাভ যুক্ত প্রযোজনায় তৈরি হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এটি তৈরি। যুক্ত প্রযোজনা চলচ্চিত্রশিল্পে যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োজনীয় তা প্রমাণ করে এই ছবিটি। ছবিটি গৃহযুদ্ধের এক নায়কের সম্পর্কে, এক যুগোশ্লাভ স্বেচ্ছাসেবকের বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে। ওরা সোভিয়েত সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল এবং উক্রাইন সীমান্তে বুডিয়ন্নির সৈন্যদলে যুদ্ধ করেছিল। এটি ওলেকো ডানডিক নামে একজন সার্বের কথা বলেছে, যিনি বিচ্ছিন্ন দলটির কমাণ্ডার ছিলেন। ইনি এই ছবি তৈরির আগে নিজের দেশের থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক বেশী পরিচিত ছিলেন। এই যুক্ত প্রযোজনাকে ধন্যবাদ। কেননা, এ ছবির জন্যই যুগোশ্লাভ জনগণ তাঁদের সেই দেশপ্রেমিককে চিনতে পারল, যিনি গৃহযুদ্ধের সময় প্রায় চ্যাপায়েভের মতই জনপ্রিয় ছিলেন।

আদর্শগত এবং শৈল্পিকবোধ উভয় দিক থেকেই এটি ছিল যৌথ উদ্যোগ এবং যৌথ কথাটার আসল সত্য বজায় থেকে তা হয়েছিল। রুশী চরিত্রগুলো অভিনয় করেছিল রুশীরা এবং যুগোশ্লাভগুলো করেছিল যুগোশ্লাভায়রা। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজের নিজের ভাষায় কথা বলেছিল। ছবিটির পরিচালক লিওনিদ লুকভ।

লুকভের এই সুন্দর ছবি শুধু সোভিয়েত-যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্রকারদের যৌথ উদ্যোগে উৎসাহিত করেছিল তা নয়। সেই সঙ্গে যুগোশ্লাভ লেখকদের সামনে এটাও হাজির করেছিল যে, যুগোশ্লাভিয়ায় বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া নিয়ে যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্রকারেরা যে সব কাজ করেছেন তার মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। যেমন, কোটোরায় খালাসীদের বিদ্রোহ, ক্রোয়াটিয়ায় কৃষকবিদ্রোহ, এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ও আগে এবং আধুনিক যুগোশ্লাভিয়া তৈরির আগে শ্রমিক-সংগঠনের সংগ্রাম। এই সব বিষয়বস্তু রূপায়িত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। অক্টোবর বিপ্লবের বিষয় নিয়ে ভালো ভালো সোভিয়েত ছবিগুলো আমাদের জনগণের ইতিহাস নিয়ে ছবি করার ক্ষেত্রে একই রকম উদাহরণ হতে পারে।

অক্টোবর বিপ্লব ও প্রথম সোভিয়েত ছবিগুলি

(জর্জ সাদুল / ফ্রান্স)

১৯৬৭ সালের ১৩ই অক্টোবর প্যারিস থেকে অবশেষে সেই দুঃখের খবরটি এসে পৌছল। অতি পরিচিত ফরাসী চলচ্চিত্র-সমালোচক জর্জ সাদুল মারা গেছেন। সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা এবং দর্শকেরা এই চমৎকার মানুষটিকে শুধু চিনতেননা, শ্রদ্ধাও করতেন। যিনি বিংশ শতাব্দীর শিল্পের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর জনগণকে একত্র করায় এবং শান্তি-অর্জনে যথাসাধ্য করেছেন।

'৬৭-র গ্রীষ্মে লেনিনগ্রাদের কাছে রেপিনোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে জর্জ সাদুল যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সংক্ষেপ এখানে ছাপা হলো।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর আমরা কিছু সোভিয়েত ছবি দেখার সুযোগ পেলাম। ফ্রান্সে আসা প্রথম ছবিগুলোর মধ্যে ছিল "সার্ফস উইঙ্গস"। পরে যার নামকরণ করা হয় "ইভান দি টেরিবল্"। ছবিটা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করে। তবে এ ছবি থেকে আমি কোন বিশেষ আনন্দ পেয়েছি, এ কথা বলতে পারবনা। কিন্তু, এর প্রযোজনায় যে সম্পদ দেখি, তা পুরোপুরি ধ্রুপদী ঐতিহ্যবাহী।

সেই সময়ে আমি সুররিয়ালিস্ট গ্রুপে তরুণতমদের অন্যতম। আমি বিশ্বাস করতাম সোভিয়েত ইউনিয়নে সবই আভা-গার্দ হতেই হবে। সে রাজনীতি বা শিল্প যাই হোক না কেন। আর তার পরই, আচমকা প্যারিসে দেখানো হলো "ব্যাটলশিপ পোটেমকিন"।

প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন লিও মোসিনাক। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যবসায়িক সফরের সময় তিনি ছবিটা দেখেন। ছবিটিতে ফরাসী সাবটাইটেল ছিল। সুতরাং তাঁর পক্ষে তাঁর বন্ধু, লিও পয়রিয়ার এবং জারমেইন ডুলাককে ছবিটির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার জন্য বোঝানোয় খুব অসুবিধে হয়নি। ওঁরাই চালাতেন ফিল্ম ক্লাব অফ ফ্রান্স। অক্টোবর বিপ্লবের নবম বার্ষিকীর অল্প পরেই ১৯২৬ সালের ১২ই নভেম্বর সের্গেই আইজেনস্টাইনের এই ছবিটি দেখানো হলো। এটা ছিল খুব বাছা কিছু লোকের জন্য প্রদর্শনী। আমি তখন এক আঞ্চলিক তরুণ। সদ্য প্যারিসে এসেছি। সুতরাং, আমি তো আর আমন্ত্রণ পেতে পারিনা। আঁদ্রে ব্রেটন, পল এলওয়ার্ড আর লুই আঁরাগকে মনে মনে খুব হিংসে করছি। কেননা সুররিয়ালিস্টদের রোজ আড্ডার জায়গা ব্লেঞ্চ স্কোয়ারের কাফে সিরানোতে ওরা একদিন জানালো সেইদিনই সন্ধ্যায় ওরা "পোটেমকিন্" দেখতে যাচ্ছে। ······ফরাসী চলচ্চিত্র-জগতের নামী লোকজনদের ভিড়ে সিনেমা আর্টিস্টিক একেবারে উপচে পড়ছে। ছবি দেখে হাততালির ঝড় বয়ে গেল। বোঝা গেল, দর্শকদের মধ্যে সোভিয়েত চলচ্চিত্র এবং পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইনের উপস্থিতির কথা। আইজেনস্টাইন তখনও তিরিশের কোটায় পা দেননি। কিন্তু, একটি সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র পত্রিকা ধিক্কার দিয়ে বলল যে একদল যুবক মনে করছে, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং রাজনৈতিক আলোচনা একসঙ্গেই হতে পারে। ঐ সমালোচক নিশ্চয়ই আমার সুররিয়ালিস্ট বন্ধুদের কথা মনে রেখেই এ কথা বলেছিলেন। কেননা, ওরা ছবি দেখার পর চিৎকার করতে আরম্ভ করেছিল "আপ্ দি সোভিয়েতস্"।

পরের দিন কাফে সিরানোতে আঁরাগ আর পল এলওয়ার্ড বলল ছবিটির কথা ওরা ভুলতে পারবেনা। তারা আরও বলল, এই প্রথম তারা পর্দায় অক্টোবর বিপ্লবের তীব্রতা অনুভব করল। তারা সেই মাংসের বীভৎস দলাগুলোর কথা বলল। বলল, পোকামাকড়ের হামাগুড়ি দেওয়ার কথা, আর অফিসারদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার কথা। কিন্তু, তারা একবারও আইজেনস্টাইনের সম্পাদনা এবং প্রতীকের ব্যবহারের কথা বললনা।

প্যারিসে ''পোটেমকিন্" দেখার কিছুদিন পরই আঁরাগ এবং এলওয়ার্ড ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল। ১৯২৭-এর গোড়ার দিকে আমিও তাদের অনুসরণ করলুম। আর, তারপরই অবশেষে আমি ছবিটি দেখতে পেলাম।

কিন্তু, এর মানে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন না যে, শুধু আইজেনস্টাইনের জন্যই আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম। ১৯২৫ থেকে এবং আরও বেশী করে মরক্কোর ঔপনিবেশিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সুররিয়ালিস্ট-দের মধ্যে শৈল্পিক আভাগার্দ থেকে রাজনৈতিক আভাগার্দ এই পরিবর্তন আসছিল। ১৯২৬-এর শেষে তাঁরা এবং কমিউনিস্ট পার্টি একটি ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেন, ''বিপ্লবই প্রথম এবং শেষ''। এঁদের মধ্যে ছিলেন জর্জ পুলিৎজার (১৯৪২-এ নাজীরা তাঁর ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করে এবং মেরেও ফেলে)। ইস্তাহার লেনিনের ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলে, "শুধুমাত্র সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা এই বিপ্লবকে দেখছি······"।

ফরাসী সেন্সর ''ব্যাটল্‌শিপ্ পোটেমকিন্''-কে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। ২৭ বছর ধরে। এমনকি, ১৯৫১-সালেও যখন সিনেমাথেক ফ্রান্সের

প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা হেনরি ল্যাঙলোইস আন্তিবেসের উৎসবে এই ধ্রুপদী ছবিটি দেখানোর ব্যবস্থা করলেন ট্যুর্সে। তখনও কিছু কিছু সাংবাদিক বলেছিলেন, ফরাসী খালাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার এটা একটা চেষ্টা। বেলজিয়ামে হল এ সব নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সেখানে "পোটেমকিন্"-কে বলা হল "পৃথিবীর সেরা ছবি"। এর ফলে ফরাসী সেন্সার তাদের কদর্য সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হলো।......

১৯৩০-এর অক্টোবরে আমি সোভিয়েত ইউনিয়নে এলাম। আমার সঙ্গে ছিল লুই আঁরাগ এবং এলসা ট্রায়লেত। খারকভে বিপ্লবী লেখকদের কংগ্রেসে যোগ দিতে আমরা এসেছিলাম। এখানে বিদেশী লেখকদের প্রচণ্ড সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা দু'টি নতুন উক্রানিয়ান ছবি দেখার আমন্ত্রণ পেলাম। ছবি দু'টি হলো ডবঝেঙ্কোর "আর্থ" এবং মিখাইল কাউফ্ম্যানের "স্প্রিঙ"।

তখনকার দিনে নীপার বাঁধের বিশাল সমাজতান্ত্রিক কাজকর্মের মত ডবঝেঙ্কোর ছবিও আমাদের মনকে অভিভূত করেছিল। উক্রাইনে থাকার সময় বিপ্লবের শিকড় আমাদের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। তাই যখন ১৯৩২-এর মে মাসে আমাদের সুররিয়ালিজম আর কমিউনিজমের মধ্যে কোনো একটাকে বেছে নেওয়ার সময় এলো তখন আমরা কমিউনিজমের প্রতি আনুগত্যের সিদ্ধান্ত নিলাম। এর জন্য আমাদের হারাতে হলো অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে।

১৯৩২-এ আমাদের সঙ্গে সুররিয়ালিস্টদের মতভেদের অন্যতম কারণ "আর্থ"। কেননা "আর্থ" সম্পর্কে ওরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে মত মেলাতে পারছিলনা। ওদের ভাষায় এটা "আপেলের গল্প"। ওরা বুঝতে পারছিলনা, এটা দেখে আমরা কেন এত উৎসাহিত।

অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন, ডবঝেঙ্কোর মত মহৎ ধ্রুপদী এবং ছন্দময় কবির আবিষ্কারের সঙ্গে নীপার বাঁধের তুলনা করা চলেনা। কিন্তু দু'টো জিনিষই প্রশংসনীয়। বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ লোকের কাছে মহৎ শিল্পকর্মের অর্থ হলো, যা ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। "মহৎ প্রেম" মৃত্যুর থেকেও বেশী শক্তিশালী—এই ব্যঞ্জনায় আমরা ভীষণভাবে মোহিত হয়েছিলাম। "আর্থ" ছবির শেষ কয়েকটি দৃশ্যে এই ব্যঞ্জনাই প্রাধান্য পেয়েছে। পরে "আর্থ"-কে "পৃথিবীর সেরা বারটি ছবির অন্যতম" বলে ঘোষণা করা হলো (ব্রাসেল্‌স্; ১৯৫৮)।

ঐতিহাসিক এবং সমালোচকদের মত সোভিয়েত চলচ্চিত্রের নির্বাক সময়কে আমি "স্বর্ণযুগ" বলে মনে করিনা। বরং, আমার মনে হয়, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ সালই হলো সব থেকে উল্লেখযোগ্য সময়। এই সময় আইজেনস্টাইন, ভ্যাসিলেভ-ভায়েরা, পুডোভকিন্, গ্রিগরি কোজিনেৎসভ, লিওনিদ ট্রাউবার্গ, সের্গেই ইউৎকেভিচ, নিকোলাই এক (ওঁর "রোড টু লাইফ" আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সাফল্যলাভ করেছিল), মার্ক ডনস্কয়, আলেকজান্দার জারখি, জোসিফ হেইফিজ, ঝিগা ভের্তভ, মিখাইল রম, ফ্রিয়েড্রিক এরমলার, সের্গেই গেরাসিমভ, গ্রিগরি রোসাল এবং আরও অনেকের কাজ ছিল। তাঁদের নৈপুণ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উনিশ এবং বিশের দশকে একটা ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে অনেক তরুণ ক্ষমতাসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের আগমন আমাকে খুশী করেছে। এঁদের নাম বিদেশে ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়ছে। কুড়ির দশকের শেষের দিকে শিল্পের চিরাচরিত ফর্মের প্রতি ঘৃণায় সোভিয়েতের তরুণ চলচ্চিত্রকারেরা একত্র হয়েছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন, ঐ ফর্মটা নিতান্তই জরাজীর্ণ বা তার থেকেও খারাপ। সেখানে আছে বুর্জোয়া এবং প্রতিবিপ্লবী ছাপ। সেই 'বৃদ্ধদের' বিরুদ্ধে তাঁদের নামতে হয়েছিল তীব্র লড়াইয়ে। লড়তে হয়েছিল নিজেদের মধ্যেও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী-প্রতিষ্ঠার জন্য।

তাঁরা দেশে এবং বিদেশে সর্বত্রই তাঁদের উদ্দেশ্যকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সারা বিশ্বে অক্টোবর বিপ্লবের আহ্বানকে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সঠিক অর্থে কোন একটা জায়গায় আবদ্ধ নয় বা এটা কোন তাত্ত্বিক আলোচনা বা পুঁথিগত অধ্যবসায় নয়, যা অবিরাম কোন আদর্শকে অনুকরণ করে যায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাকে প্রতিহত করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিজের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নিজেই পথ করে নেবে।

অক্টোবর বিপ্লব ও ভিয়েতনামের ছবি

দি থ্থাই বাও (ভিয়েতনাম)

হ্যানয় ফিল্ম স্কুলের সাধারণ প্রেক্ষাগারে লেনিনের বাণী লেখা আছে স্বর্ণাক্ষরে : 'আমাদের কাছে সকল শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্র হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ।'

ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ্ ভিয়েতনামের চলচ্চিত্রকাররা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লব ও বৈপ্লবিক ঐতিহ্যে এবং সাম্যবাদনির্মাতা অপরাজেয় মানুষের ছবিতে শ্রদ্ধাশীল ও উচ্চধারণা পোষণ করেন। এ ছবিগুলি যেমন 'দি ব্যাট্‌ল্‌শিপ্ পোটেম্‌কিন্, 'আর্থ', 'মাদার', ''লেনিন ইন্ অক্টোবর', 'উই আর ফ্রম্ ক্রন্‌টাড্‌ট্', 'চ্যাপায়েভ', 'দি ম্যাক্সিম ট্রিয়োলজী' 'দি ভিলেজ্ টিচার' ফিল্ম-স্কুলের পঠনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অনেক চলচ্চিত্রকার সোভিয়েত-চিত্রকারদের তত্ত্বাবধানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। চলচ্চিত্র সম্পর্কে সোভিয়েত রচয়িতাদের বিভিন্ন পুস্তক ও বক্তৃতামালা ভিয়েতনামী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রে আইজেনস্টাইনের মন্টাজ, রমের পরিচালন-কৌশল, ডভঝেঙ্কোর ক্যাবিক সুষমা, গাব্রিলোভিচের চিত্রনাট্যের দার্শনিক উপাদান, 'নাইন ডেজ অফ্ ওয়ান ইয়ার' ছবির সংলাপ, ইউরুসেভ্‌স্কীর ক্যামেরার কলাকৌশল, ভের্টভ এবং কারমেনের তথ্যচিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে প্রায়ই আলোচনা-সভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান হয়।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে লেনিনের মতবাদের আলোকে আমরা এই বাণী অনুসরণ করছি : জাতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের জন্য দেশপ্রেম ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে সংগ্রাম কর।

প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা ও ত্যাগস্বীকারসত্ত্বেও আমাদের চলচ্চিত্রকাররা প্রভূত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। ফরাসী ঔপনিবেশিকবাদ-দের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের চিত্ররূপ, 'ভিয়েতনাম ফাইট্‌স্' ও 'দি ভিক্টরী অফ্ দিয়েন্ বিয়েন্ ফু' এবং কাহিনীচিত্রগুলি 'ফায়ার্ অন্ দি সেন্ট্রাল সেক্টর্ অফ্ দি ফ্রন্ট', 'দি ইয়াং সোলজার', 'দাই হাউ' (১৯৬৩ সালের মস্কো-উৎসবে রৌপ্যপদকে পুরস্কৃত), 'দি টমটিট' (১৯৬২ সালের কার্লো'ভি ভ্যারী উৎসবে পুরস্কৃত), 'সি অফ্ ফায়ার্' আমাদের চলচ্চিত্র-কারদের শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে।

১৯৫৪ সালে ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপিত হল এবং উত্তর ভিয়েতনামে পুনর্নির্মাণযজ্ঞ শুরু হল। এই সময়ে তোলা হল, 'ব্যাঙ্ ছিত্ হাই' নামে ছবি, যাতে যুদ্ধবিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত দেশে সব-কিছু পুনর্গঠনের জন্য যাঁরা দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁদের কথা বলা হল। ছবিটি ১৯৫৯ সালে মস্কো-উৎসবে সুবর্ণপদক পেয়েছিল।

যখন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ-ভিয়েতনামে আগ্রাসননীতি চালিয়ে নয়, বর্বর ও বীভৎস আক্রমণ শুরু করল, তখন আরো ছবি নির্মিত হ'ল 'উই অয়ার্ ফোর্স'ড টু টেক্ টু আর্মস্' (দি লিবারেশন্ স্টুডিও), 'বাই এ রিভার্', 'দি স্টর্ম ডেভলাপ্‌স্' ও 'সেভেন্‌টিন্‌থ্ প্যারালাল্', যে-সমস্ত ছবিগুলিতে আমাদের দেশের পুনর্গঠন ও ঐক্যের জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত। পঞ্চম মস্কো চলচ্চিত্র-উৎসবে আমাদের জন্যদের্যের ছবি 'ফ্রিডম্ ফাইটার্স' কুই ভি' (লিবারেশন্ স্টুডিও), ও 'এট্ দি গেট্ অফ দি উইণ্ড' (হ্যানয় ডকুমেন্টারী স্টুডিও), দু'টি ছবিই সুবর্ণপদক পেয়েছে।

আমার মনে পড়ছে প্রতিরোধ-আন্দোলনের গোড়ার দিকের কথা, যখন আমরা জঙ্গলে অস্ত্র তুলে নিয়েছি। তখন প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতার সহস্র বেড়াজাল পেরিয়ে কিছু কিছু সোভিয়েত ছবি আমাদের জঙ্গলে এসে পৌঁছাত, ছবিগুলি দেখার জন্য আমরা ১৫ মাইল হেঁটে আসতাম। যে ছবি দু'টির কথা আমার মনে পড়ছে, সে ছবি দু'টি হ'ল 'মেম্বার অফ দি গভর্নমেন্ট', ও 'দি ইয়াং গার্ড'। ক্রাস্‌নোডনে নাৎসীবিরোধী যোদ্ধাদের ছবিগুলি দেখে আমরা ওলেগ্ কশেভয়, লিউবা সেভসোভা ও সের্গেই টিউলেনিনদের মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এই সমস্ত বীর-চরিত্র বিপ্লবের সার্থক ফসল, ফ্যাসিবাদ উৎখাত করার জন্য যাঁরা জীবন-বিসর্জন দিয়েছিলেন।

আজকে আমাদের চলচ্চিত্রকাররা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছেন, তাঁরা লড়াই করছেন বিভিন্ন ফ্রন্টে, তাঁদের এক হাতে রাইফেল, অপর হাতে মুভি ক্যামেরা। এই অসমসাহসী বীর চলচ্চিত্রকাররা আমাদের জনগণের মহান সংগ্রাম ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের অনিবার্য পরাজয়ের কাহিনী তুলে ধরেছেন ছবির মাধ্যমে। আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতার দল ছড়িয়ে আছেন দেশের সর্বত্র, আকাশে-সমুদ্রে, পাহাড়ে-নদীতে, গ্রামে-শহরে-গঞ্জে, কলে-কারখানায়-খামারে সর্বত্র। তাঁরা তুলছেন যুদ্ধের ছবি, তুলেছেন যুদ্ধ প্রতিরোধের ছবি। বিপুল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে ছবির তৈরির সংখ্যা কমেনি, বরং এই সংখ্যা সাম্প্রতিককালে দ্বিগুণ হয়েছে। আমাদের দেশে কার্টুন ও জনপ্রিয় বিজ্ঞানভিত্তিক ছবিও তোলা হচ্ছে। আমাদের ফিল্ম-স্কুলের বিভাগ সিনারিও-রচনা, পরিচালনা, অভিনয়, ক্যামেরা এবং অর্থনীতি-বিষয়ক বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে চলেছেন।

আমি সোভিয়েত-ইউনিয়নের পার্টি ও সরকার এবং সোভিয়েত জনগণ-কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে সাহায্য ও সমর্থনের জন্য। আমাদের নবীন চলচ্চিত্র-শিল্পে সাহায্যের জন্য আমরা সোভিয়েত সিনেমাটোগ্রাফার্স' ইউনিয়নের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমরা অক্টোবর বিপ্লবজাত সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অনুসরণে সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

রুমানিয়ায় সোভিয়েত চলচ্চিত্র (১৯২০-১৯৪০)

বুজর র‍্যাপিয়ানু

বিপ্লবের অগ্নিশিখায় প্রোজ্জ্বল সোভিয়েত চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে এক সুমহান ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এই নবতম শিল্প নতুন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিফলনে আশ্চর্য সমৃদ্ধ হয়ে শিল্পসংস্কৃতির নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে।

প্রথমদিকে এই চলচ্চিত্র দর্শক হিসাবে পেল স্বাভাবিকভাবে মিত্র সর্বহারা শ্রেণীকে। দর্শকরা ছবির মধ্যে নিজেদের ভাগ্য, নিজেদের জীবন খুঁজে পেল, নিজেদের জীবন-সংগ্রামের প্রতিরূপ খুঁজে পেল পোটেমকিন জাহাজের নাবিকদের মধ্যে। পোটেমকিনের নাবিকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করল যে, মুক্তির একমাত্র পথ বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং এখানেই সোভিয়েত ছবির সার্থকতার যথার্থ কারণ নিবদ্ধ। এই সাফল্যের মূল কারণ হচ্ছে এর বৈপ্লবিক উপাদান, হেনরী বারবুসে যার সম্পর্কে বলেছেন, 'নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ নতুন শিল্প'।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সোভিয়েত ছবির প্রদর্শন রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠল, বিভিন্ন রাজনৈতিক, দার্শনিক ও নান্দনিক ধারণায় সর্বহারা শ্রেণী সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বিপ্লবী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পৃথিবীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর তুলে রাখতে সচেষ্ট ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিরন্তর কুৎসা প্রচারে রত এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সত্য প্রচারে যাঁরা সচেষ্ট ছিলেন তাঁদের দণ্ডিত করতেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য, অক্টোবর বিপ্লবের সংগ্রামী আদর্শের বিস্তার রুদ্ধ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবরোধ করে যে বলয় তৈরি হয়েছিল, বুর্জোয়া রুমানিয়ার অবস্থান ছিল তার মধ্যে বিশিষ্ট। সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তে রুমানিয়া সম্পর্কে প্যারিসের পত্রিকা 'জার্নাল' ১৯২৪ সালে মন্তব্য করেছিল "রুমানিয়া বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ইউরোপের বর্ম"।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রুমানিয়ায় শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং এ কারণেই রুমানিয়াতে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প ও সাহিত্যের প্রবেশ অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু, বাধার বেড়াজাল পেরিয়ে রুমানিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের যা কিছু প্রবেশ করত, তা থেকেই রুমানিয়ার জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসঞ্জাত সাফল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার এভাবেই সাধিত হত। যাঁরা মিথ্যে ও কুৎসার ভারি পর্দা খুলে ফেলতে চাইতেন, তাঁদের কাছে সোভিয়েত শিল্প ছিল এক নির্ভরযোগ্য মিত্র।

১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল অবধি ৪০টি সোভিয়েত কাহিনীচিত্র, ৩টি পূর্ণদৈর্ঘের তথ্যচিত্র এবং ১১টি স্বল্পদৈর্ঘের তথ্যচিত্র রুমানিয়াতে ব্যবসায়িকভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হচ্ছে 'দি হেয়ার অফ চেঙ্গিজ খান'; 'আলেকজান্ডার নেভস্কি', 'ব্লু এক্সপ্রেস', 'স্টর্ম'.'দি রোড টু লাইফ', 'জলি ফেলোজ' ও 'ভল্গা ভল্গা'।

অর্থাৎ প্রতি বছরে গড়ে দুটি করে সোভিয়েত ছবি রুমানিয়ায় এ সময়ে দেখানো হয়েছিল। আমেরিকা ও জার্মানীর ছবির মিলিত সংখ্যা বছরে ছিল গড়ে ২০০টি। সোভিয়েত ছবির সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য এবং ছবিগুলিও সেন্সর কর্তৃপক্ষের রুষ্ট দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারতনা, ছবিগুলি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করত ক্ষতবিক্ষত হয়ে। এ সমস্ত কিছু সত্ত্বেও কোনরূপ ব্যাতিক্রম ব্যাতিরেকে সমস্ত ছবিই প্রচুর সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হত। সংবাদপত্রের সমালোচনা ও ব্যবসায়িক সাফল্য দর্শকদের মনোভাব ব্যক্ত করত।

'সাক্সেস্' পত্রিকা এ সময়ে লিখেছিল "এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সোভিয়েত ছবি আমাদের দর্শকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। এখানে সোভিয়েত ছবির প্রথম রজনী—চলচ্চিত্রের এক বিরাট ঘটনা, এর কারণ, সোভিয়েত রাশিয়ায় কি ঘটেছে, এ বিষয়ে সকলের অগাধ কৌতূহল"।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র সম্পর্কে প্রশংসা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ঔৎসুক্যের প্রকাশ। সোভিয়েত ছবির সাফল্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সামগ্রিক সাফল্যের অঙ্গ হিসাবে প্রতিভাত হত, কম্যুনিস্ট-বিরোধ ও সামরিক-প্রস্তুতির জিগিরে ব্রতী প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের নিরন্তর কুৎসাপ্রচারের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ হিসাবে ছবির সমাদর এক উল্লেখযোগ্য বিষয়।

রুমানিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে অবিচল ছিল যে, জনগণের মধ্যে এই প্রচার ব্যাপকভাবে রাখতে হবে যে, "সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা নিজেদের প্রতিরক্ষার সংগ্রামের অঙ্গ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখা জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজন, মৌলিক ও ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সংগ্রাম"। (১৯২৯ সালে পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের প্রস্তাব থেকে)। এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে রুমানিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সর্বহারা শ্রেণী ও প্রগতিশীল বুদ্ধি-

জীবীদের সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সহানুভূতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরো ফলপ্রসু হতে পারত।

পুলিস ও বিচারালয় সেন্সরশিপ কমিশনে নিজেদের প্রতিনিধি নিয়োগ করল, যে সেন্সরশিপ কমিশন বুর্জোয়া রুমানিয়ায় সোভিয়েত ছবির বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র ছিল। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রুমানিয়ার সেন্সরশিপ পদ্ধতি দেশের ভিতরে ও বাইরে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

সেন্সরই ছিল একমাত্র কারণ, যার জন্য রুমানিয়ার দর্শকরা 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন্', 'মাদার', 'চ্যাপায়েভ' ও 'বাল্টিক ডেপুটি'-র মত ছবি দেখতে পারেনি। অতি অল্প সংখ্যক ছবিই সেন্সর কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পেত, আর সে ছাড়পত্রের মাশুল ছিল প্রচুর কাটাকুটি।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সোভিয়েত ছবির প্রদর্শন রুমানিয়াতে সেন্সর ও পুলিসের বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ও গণতান্ত্রিক মানুষের প্রতিবাদকে মুখর করে তুলত।

এই রকম একটা অবস্থা যা মাঝে মাঝে নাটকীয় আকার নিত, তার মধ্যেও ৪০টি ছবি রুমানিয়ার দর্শকদের মধ্যে মুক্তিলাভ করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে প্রদর্শিত সোভিয়েত ছবির তাৎপর্য বিচার করতে হবে।

সোভিয়েত ছবি কম্যুনিস্ট ও গণতান্ত্রিক মহলে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করল। ১৯৩৬ সালে 'এরা নোভা' পত্রিকায় এস. রল লিখলেন, "সোভিয়েত ছবির প্রথম পনের বছর আমাদের কাছে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে, যে যুগের চলচ্চিত্র মানবসমাজে জনগণের এক শিল্পে পরিণত হয়েছে, এক নতুন সাংস্কৃতিক উপাদান যা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও বর্তমান যুগের মানুষের চিন্তা-ভাবনার সংযুক্তিতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ করে চলেছে।"

প্রগতিশীল সমালোচকরা উপলব্ধি করলেন যে, চলচ্চিত্রের ইতিহাসের গতি সুস্পষ্টভাবে সোভিয়েত ছবির মাধ্যমে নির্ধারিত হতে চলেছে এবং এঁরা চলচ্চিত্রের নতুন পথনির্দেশে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন।

এই সমালোচকরা সোভিয়েত ছবির বৈশিষ্ট খুঁজে পেলেন কাহিনীর উপস্থাপনায়, রাজনৈতিক ও দার্শনিক ধারণায়। "সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র পরিবেশ যা বিরাট পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্রকারদের নতুন ও সঠিক পথের নির্দেশ দেয়।" 'সোভিয়েত শিল্পীরা সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন। সৌন্দর্য নৈতিকতা ও সুস্থ আদর্শ প্রচারের বাহন হিসাবে চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবহার সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বাংশে সার্থক হয়েছে। সত্য ও ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েত ছবির ভূমিকা অতুলনীয়।......'

"রাশিয়ার ছবি জীবনের প্রতি গভীর প্রেমে আবদ্ধ, সমস্ত সম্ভাবনায় আগ্রহী"।

"যুদ্ধোত্তর যুগের সোভিয়েত ছবি অপরিসীম আশাবাদে উদ্বুদ্ধ"।

"সোভিয়েত ছবিতে সমগ্র জীবন প্রতিবিম্বিত।"

রুমানিয়ার সমালোচকরা সোভিয়েত ছবি প্রসঙ্গে এই ধরণের মন্তব্য করেছেন।

সোভিয়েত ছবির অবিসংবাদিত সাফল্য রুমানিয়ার চলচ্চিত্রকে সঙ্কট-পরিত্রাণের সূত্র-অন্বেষণে সাহায্য করল।

রোমানা লিটেরারার সমালোচক লিখলেন : "সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবে বহু-প্রতীক্ষিত রুমানিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পের নবজন্ম সম্ভব হতে পারে।" এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন পেল লেখক কামিল পেট্রেস্কু, জান মিহাইল, সাশু এলিয়াড ও অভিনেতা পপ মার্শিয়ান প্রমুখের কাছ থেকে। "সোভিয়েত চলচ্চিত্রের পুরোধারা সংশিল্পসম্মত চলচ্চিত্রের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করেছেন......সকলকে প্রথম যুগের সোভিয়েত ছবির অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে হবে, এমন ছবি তুলতে হবে যা পর্যটনকারীদের কাছে আমাদের দেশকে ছবির মত তুলে ধরবে। এমন ছবি হবে যাতে রুমানিয়ার কৃষকসমাজের জীবনগাথা ও আদর্শ প্রতিফলিত হবে।"

সাম্প্রতিককালে বহু সোভিয়েত ছবি রুমানিয়াতে প্রদর্শিত হয়েছে এবং সমাদর লাভ করেছে। এই সমস্ত ছবির শিল্পগত ও আদর্শগত উপাদান আমাদের দেশে নতুন রুমানিয়ার চলচ্চিত্রের সূচনা ও বিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে ও করছে।

বৃটেন ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র

নিবা হিবিব

সোভিয়েত চলচ্চিত্রশিল্পের পুরোধাদের শিল্পকীর্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্রে বৃটেন অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের তুলনায় প্রথমদিকে কিছুটা পেছিয়ে ছিল।

এর কারণ মোটামুটি দু'টি। প্রথম কারণ হচ্ছে, ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি—যা বৃটেনের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এক বেড়াজালের সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় কারণ, বৃটেনের প্রচলিত সেন্সরশিপবিধি যা অন্য সমস্ত জাতীয় সেন্সরশিপপদ্ধতির বিচারে বীভৎস ও হাস্যকর ছিল।

বিশ দশকের চলচ্চিত্রামোদীরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ব্যাপারে সেন্সরশিপসংক্রান্ত অচলায়তনের বদ্ধ প্রাচীরের জন্য ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ এবং হতাশ হয়ে উঠছিলেন। এবং ক্রমশঃ সেন্সরশিপসংক্রান্ত আইন পরিবর্তনের জন্য প্রতিবাদ সংহত হয়ে উঠছিল ও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে লাগল। এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ভাস্বর ছিল সোভিয়েত চলচ্চিত্র। সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন সংগঠিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই সোভিয়েত চলচ্চিত্র এক আশ্চর্য সংবাদ হিসাবে পরিণত হয়ে উঠেছিলো।

'ক্লোজ-আপ' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে এক লেখক ঘোষণা করলেন যে, সোভিয়েত চলচ্চিত্র 'স্টার' পদ্ধতির মূল্যহীনতা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেছে। সোভিয়েত ছবি আমাদের শিখিয়েছে যে, প্রতিটি মানুষ, নারী এবং শিশু এক একজন 'স্টার'।

পত্রিকার সম্পাদক লিখলেন, 'রাশিয়ান ছবি দেখার পর অন্যান্য সমস্ত কিছুই আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গেছে, রাশিয়ান ছবিগুলি মানবতার সার্থক এবং প্রত্যক্ষ রূপায়ণে জীবন্ত, সজীব সোভিয়েত চলচ্চিত্র নতুন পৃথিবীর এক আশ্চর্য সম্পদ'।

তিনি আরও বললেন যে, কিভাবে দুনিয়াজোড়া সংবাদপত্রগুলি সোভিয়েত ছবিকে উত্থান, হত্যা ও ধ্বংসের ভাবধারা প্রচারের বাহন হিসাবে চিহ্নিত করার চক্রান্ত করে চলেছে।

বিশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র বৃটেন জুড়ে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন গড়ে উঠল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, লণ্ডন ফিল্ম সোসাইটি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র আন্দোলনে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করল।

১৯২৫ সালে লণ্ডন ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত । এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন—লেখকদের মধ্যে 'জর্জ বার্নার্ড শ, এইচ্. জি. ওয়েল্স্, শিল্পী অগাস্টাস জন, বিজ্ঞানী জুলিয়াস্ হাক্সলী, জে.বি.এস্. হলডেন্ এবং অভিনেত্রী ড্যামে এলেন টেরী প্রমুখ।

অতি অল্প ভোটের ব্যবধানে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল সাধারণ চিত্রগৃহে রবিবার বিকালে ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে সেন্সরশিপ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ থেকে অব্যাহতি দিল এবং এইভাবেই প্রথম ১৯২৮ সালের ২১শে অক্টোবর বেলা ২-৩০ টায় একদল উৎসাহী ফিল্ম সোসাইটি সদস্য নিউ গ্যালারি প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করল সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক ছবি দেখার জন্যে। ছবিটি হ'ল পুডোভ্কিন নির্দেশিত 'মাদার'।

উৎসাহী ও সৎশিল্পে বিশ্বাসী চলচ্চিত্র-সমালোচকরা ছবিটি নিয়ে প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে উঠলেন। 'ক্লোজ্-আপ্' কাগজের একজন সংবাদদাতা লিখলেন যে, সমগ্র লণ্ডন এক সপ্তাহের জন্য উদ্দীপিত হয়ে উঠল, কিন্তু, প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রসমূহ ছবিটির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে উদ্যোগী হয়ে উঠল। তাঁরা এই ছবিটিকে 'কম্যুনিস্ট ভাবধারার প্রচার এবং শয়তানি, ধূর্ততা, হিংসা ও মিথ্যার জঞ্জাল' বলে অভিহিত করলেন।

সোভিয়েত ছবির 'প্রচারমূলক উপাদান' সম্পর্কে বিতর্ক পরবর্তীকালে আরো সোচ্চার হয়ে উঠল যখন পরের বছর ফেব্রুয়ারীতে পুডোভ্কিন্ বৃটেন পরিদর্শনে এলেন এবং তাঁর ছবি 'দি এণ্ড অফ্ সেন্ট পিটার্সবার্গ' ফিল্ম সোসাইটির মাধ্যমে প্রদর্শিত হল। 'দি বেড্ এণ্ড সোফা' (এপ্রিল, ১৯২৯), 'দি নিউ ব্যাবিলন' (নভেম্বর, ১৯২৯) ও 'আর্থ' (অক্টোবর, ১৯৩০) ছবিগুলি প্রভূত প্রশংসা ও প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠল।

'ক্লোজ্-আপ্' কাগজে একজন লেখক অল্গা প্রেব্রাঝেনস্কায়া ও ইভান্ প্রাভ্ভ্ নির্দেশিত 'দি পেজান্ট ওম্যান্ অফ্ রিয়াজান্' (মার্চ, ১৯৩০) ছবিটির অসম্ভব সামাজিক গুরুত্বের কথা এবং দ্রুত নাটকীয় গতি, বক্তব্যের স্বচ্ছতা এবং কাব্যিক সৌন্দর্যের উল্লেখ করলেন। ফিল্ম সোসাইটির বহু সদস্যের সঙ্গে এ ছবিটি প্রসঙ্গে আলোচনা করে আমি দেখেছি যে, তাঁরা এ ছবিটি সম্পর্কে কি আশ্চর্য গভীর আত্মিক যোগ অনুভব করেন।

"ব্যাটল্শিপ্ পোটেমকিন্" ফিল্ম সোসাইটিতে ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রদর্শিত হল। ছবিটিতে কাহিনীর মহৎ সংগ্রাম দর্শককের বিপুলভাবে মুগ্ধ করল।

বিশ ও ত্রিশ দশকে বৃটেনের প্রচণ্ড সংগ্রাম ও আন্দোলনমুখর রাজনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেন্সরশিপবিধি ও এই আইনের প্রতিবাদ-আন্দোলনের বিকাশ লক্ষণীয়। খনিশ্রমিকদের ধর্মঘট ও ১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট এবং পরবর্তী অগ্নিগর্ভ অবস্থা, ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকের ভুখা-জাঠা ইত্যাদি ইত্যাদি আন্দোলন সমগ্র বৃটেনে এক ঝটিকা-যুদ্ধ-অবস্থা সৃষ্টি করে তুলেছিল। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি এই অবস্থায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল এক বিপ্লবের সম্ভাবনায় এবং নিজেদের শাসন ও শোষণ বিপন্ন হতে পারে, এমন সমস্ত কিছুই বে-আইনী ঘোষণা করতে তৎপর হয়ে উঠল।

'ব্যাটল্‌শিপ্‌ পোটেম্‌কিন্‌' ছবিটিকে বোর্ড অফ সেন্সর ছাড়পত্র দিলনা এবং লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ও মিড্‌ল্‌সেক্স কাউন্টি কাউন্সিল পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় ছবিটিকে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করল। কারণ হিসাবে এঁরা বললেন যে, ছবিটিতে 'বর্বর হিংসা' দেখানো হয়েছে। এই বিধিনিষেধের মূল কারণ যে শাসকশ্রেণীর হস্তক্ষেপ, এটা বুঝতে অবশ্য সাধারণ মানুষের কোন অসুবিধা হয়নি। শাসক-শ্রেণীর ধারণা ছিল যে, ছবিটি বিপ্লবের একটি বিশ্বস্ত দলিল।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রভাব ছিল বিপুল। কিন্তু, এই ছবিগুলি যাঁরা দেখার সুযোগ পেতেন, সংখ্যার বিচারে তাঁরা ছিলেন নগণ্য। চাঁদার উচ্চ হারের জন্য লণ্ডন ফিল্ম সোসাইটির সদস্যরা সাধারণতঃ আসতেন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় থেকে।

কাজেই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করার প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সংগ্রাম ও উপলব্ধির বিশ্বস্ত বাহক সোভিয়েত ছবি ব্যাপকভাবে প্রদর্শনীর জন্য ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের নব বিস্তার বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল।

আশ্চর্যের কথা এই যে, লণ্ডন ফিল্ম সোসাইটি সেন্সরশিপসংক্রান্ত যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিলেন সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে শ্রমিকশ্রেণীর চলচ্চিত্রসংস্থাগুলিকে বঞ্চিত করা হল। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের থিয়েটার ও মিউজিক্‌ হল্‌ কমিটির চেয়ারম্যান মিস্‌ রোজামণ্ড স্মিথ্‌ এই বিষয়ে এক অদ্ভুত উত্তর দিলেন। তিনি বললেন যে, এই ধরণের সংস্থাগুলির সদস্যদের চাঁদার হার অত্যন্ত কম বলে যে কেউ এই ধরণের সংস্থার সদস্য হতে পারে এবং সেহেতু এই সংস্থা-সমূহের প্রদর্শনীকে সাধারণ প্রদর্শনীর মত বলা যায়। এইভাবে সেন্সরশিপের বিষয়ে দুটি পদ্ধতি চালু হ'ল, ধনীদের জন্য এক ধরণের আইন এবং শ্রমিকদের জন্য আর এক নিয়ম। ওয়ার্কার্স ফিল্ম সোসাইটি খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করল এবং অবশেষে ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে একটি কো-অপারেটিভ্‌ প্রেক্ষাগার ভাড়া নিল।

এই সোসাইটি একেবারে শুরুতেই অভাবিত সাফল্যলাভ করল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শত শত শ্রমিক এই সংস্থার সদস্য হল। বিভিন্ন প্রদেশে বিপুল সাড়া পড়ে গেল, সাউথ ওয়েল্‌সের খনি শ্রমিকদের অঞ্চল থেকে বিভিন্নস্থানে শ্রমিকরা এগিয়ে এলেন, সংগঠিত হলেন এবং সারা দেশের শিল্পাঞ্চলে এই সংস্থার শাখা স্থাপিত হ'ল। ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে ওয়ার্কার্স ফিল্ম সোসাইটিসমূহের এক ফেডারেশন্‌ স্থাপিত হ'ল। এই সর্বপ্রথম এইভাবে শ্রমিক শ্রেণী সোভিয়েত ছবি দেখার সুযোগ লাভ করল।

ত্রিশ দশকে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন আরো বিস্তারিত ও ব্যাপক-ভাবে প্রসারিত হয়ে উঠল। এই আন্দোলনের শরিকদের মধ্যে একদলের কাছে এই আন্দোলন ছিল বস্তুতঃ চলচ্চিত্রের নান্দনিক ও শিল্পগত বিষয়ে আসক্তিপ্রসূত। অপরদলের কাছে এই আন্দোলন রাজনৈতিক মতামতের ভাববাহী উপাদানে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈত্রী এবং বিশেষ ক'রে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংগঠিত করার হাতিয়ার হিসাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল এবং এই ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ছবি ছিল এক আশ্চর্য সম্পদ। কেননা, সোভিয়েত ছবি একাধারে ছিল শিল্পসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাণবন্ত এবং অন্যদিকে বৈপ্লবিক আবেদনে সমৃদ্ধ।

'ফোরাম্‌' নামে একটি ছোট ব্যবসায়িক চিত্রগৃহ শুধুমাত্র সোভিয়েত ছবি দেখানো শুরু করল। এই চিত্রগৃহেই লণ্ডনের চিত্রামোদীরা 'উই ক্রম ক্রনস্টাড্‌ট', 'চ্যাপায়েভ', 'লড্‌ হোয়াইট্‌ সেইল' ও 'দি নিউ গালিভার' প্রমুখ বিখ্যাত ছবিগুলি দেখার সুযোগ পেল। এই সমস্ত ছবির মধ্যে 'বেড্‌ এণ্ড সোফা' ছবিটি দীর্ঘ ছয়মাস ধরে চ'লে এক নতুন কীর্তি স্থাপন ক'রল।

ক্রমশঃ এটা স্পষ্টতঃই প্রতিভাত হ'য়ে উঠল যে, সোভিয়েত ছবি সাধারণ মানুষকে বিপুলভাবে আকর্ষণ করছে। আজকের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত বহু লোকই মনে করেন যে, সোভিয়েত ছবিই তাঁদের সামনে প্রথম সমাজতন্ত্র ও মানুষের মুক্তির চেহারা তুলে ধরেছে।

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানেই আমাদের দুই দেশ মৈত্রীবদ্ধ হ'ল। এই মৈত্রী সমগ্র সংস্কৃতিতে, বিশেষতঃ, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত হ'ল। এই প্রথম সাধারণ ব্যবসায়িক চিত্রগৃহে ব্যাপকভাবে

সোভিয়েত ছবি প্রদর্শিত হওয়া শুরু হ'ল এবং এই সমস্ত ছবি বৃটেনের জনগণকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আরো উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলল।

বৃটেনে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রভাব ব্যাপক ও বহুমুখী। বৃটেনের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই প্রভাব অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রত্যক্ষ। সমগ্র চলচ্চিত্রের সংজ্ঞার নবরূপায়ণে এবং চলচ্চিত্র একটি শিল্প, এই প্রতীতির সার্থক প্রয়োগে সোভিয়েত ছবি আমাদের দেশে সাড়া জাগিয়েছে। সেন্সরশিপবিধিতে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির বিরুদ্ধে সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রগতিশীল সার্থক আন্দোলনকে সম্ভব করেছে। আমাদের দুই দেশের মৈত্রীবন্ধনকে সোভিয়েত চলচ্চিত্র দৃঢ়তর ক'রেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান ত্যাগ ও বিপুল বীরত্ব আমরা সোভিয়েত ছবি থেকে জেনেছি, অগণিত মানুষকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করেছে সোভিয়েত চলচ্চিত্র এবং অসংখ্য মানুষকে সোভিয়েত ছবি অকৃত্রিম আনন্দ ও অভিনব প্রেরণা দিয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লবজাত চলচ্চিত্র থেকে ইতালীর নব-বাস্তবতা।

সান্জিয়োঃ মেক্‌চিনি (ইতালী)

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের ফসল বিপ্লবী সোভিয়েত চলচ্চিত্র ইতালীয় চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ যুগ—নয়া বাস্তবতার যুগ, এমনকি আজকের ধারা ও ধারণাকেও আশ্চর্যভাবে প্রভাবিত করেছে।

তিরিশ দশকের গোড়ার দিকে ফ্যাশিবাদ কর্তৃক আরোপিত শত সহস্র বিধি-নিষেধের বেড়াজালকে উপেক্ষা ক'রে ইতালীর চলচ্চিত্রকাররা চলচ্চিত্র সম্পর্কে সোভিয়েত শিক্ষকদের মূল্যবান রচনাবলী থেকে শিক্ষা-গ্রহণ ক'রতে শুরু করেছিলেন। এই মহান চলচ্চিত্রকারদের ছবির প্রদর্শনী তৎকালীন ইতালীতে অত্যন্ত কদাচিৎ হলেও এই দুর্লভদর্শন ছবিগুলি ছিল এই রচনাবলীর মূলসূত্রের বাস্তব দৃষ্টান্ত। এই শিক্ষার প্রভাব প্রাথমিকভাবে অনুভূত হ'ল কয়েকজন তরুণ পরিচালকের তথ্য ও কাহিনী চিত্রে। আলেক্‌জান্দ্রো ব্লাসেট্টি পরিচালিত 'সান' (১৯২৯) 'মাদার আর্থ' (১৯৩০) ও 'পালিয়ো' (১৯৩২), ইভো পেরিলি নির্দেশিত 'দি বয়' (১৯৩৩) ও উমবের্তো বার্বারো পরিচালিত 'শিপইয়ার্ডস ইন্ দি অ্যাড্রিয়াট্রিক্' ছবিগুলি এই জাতীয় প্রভাবপ্রসূত বলে সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। আজকে এই সমস্ত ছবির কথা কারুরই মনে নেই। শুধুমাত্র ইতিহাসের কিছু কিছু পাতায় সামান্য উল্লেখের মধ্যেই এ ছবি-গুলির পরিচয় অবশিষ্ট রয়ে গেছে। কিন্তু, সে সময়ে এ ছবিগুলি চলচ্চিত্রের জগতে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়েছিল, ইতালীয় চলচ্চিত্রের এক দশকের অনড় অবস্থাকে আলোড়িত করেছিল এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্র থেকে উদ্ভাত ধ্যান ও ধারণাকে প্রসারিত ও ব্যাপ্ত করেছিল, যে ধ্যান ধারণাগুলি সূচিত করেছিল আগামী দিনের আরো মহৎ তাৎপর্যকে।

১৯৩২ সালের ৬ থেকে ২১ আগস্ট অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ পরিবেশে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল ভেনিসে। পরবর্তীকালেও ভেনিসে আন্তর্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এক্সেলসিয়র, হোটেলের চত্বরে লিডো প্রেক্ষাগৃহে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হল। ফারাও ধরণের স্থাপত্যে কোন এক শেখের নির্দেশে বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল, শেখ সাহেব ভেনিসে এসে এই বাড়িতে ছুটি কাটাতেন শত শত স্ত্রী ও উপপত্নী নিয়ে।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের শুরু আংশিকভাবে সোভিয়েত চলচ্চিত্র থেকে হয়েছে বলে বলা যেতে পারে, কেননা, রোমের ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশনাল্ ফিল্মসের অধ্যক্ষ লুসিয়ানো দে ফেও সোভিয়েত নির্বাক যুগের 'শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে অসম্ভব অভিভূত হয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯২৯-১৯৩০ সালের আর্থনীতিক সংকটজনিত মন্দা থেকে হোটেল ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের কিছুটা অব্যাহতি দেওয়ার উদ্দেশ্য এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত ছিল। এইভাবে আশা করা হয়েছিল যে, সে বছরে পর্যটনের সময়কাল আরো বর্ধিত ও আকর্ষণীয় করা যাবে। কাউন্ট ভল্‌পি ডি মিস্তরাটো, যিনি তিরিশ দশকের ভেনিসে রেনেসাঁ-যুগের অভিজাতদের মত বাস করতেন, তাঁর কাছে এই সঙ্কটের সমাধানের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হ'ল। ভল্‌পি পরামর্শ চাইলেন দে ফেও-র কাছে। দে ফেও তখন লীগ্ অফ্ নেশন্‌সের প্রতিনিধি হিসাবে সদ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঘুরে এসেছেন, সেখানে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের চরম সাফল্যের দিক্‌চিহ্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছবিগুলি দেখে তাঁর মনে চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে প্রভূত উৎসাহ ও সাধারণ ব্যবসায়িক ছবি সম্পর্কে প্রচণ্ড বীতরাগ দানা বেঁধে উঠছিল।

দে ফেও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিলেন

এবং নিজে এই উৎসবের সংগঠক হতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন। সোভিয়েত ছবি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহের জন্যেই বস্তুতঃ প্রদর্শনী-সূচীতে সোভিয়েত ছবি অন্তর্ভুক্ত হল।

ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠির ধারণা ছিল যে, বেসরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই চলচ্চিত্র উৎসব সতর্কতার সঙ্গে মনোনীত স্বল্পসংখ্যক দর্শকের (যার বেশীর ভাগই বিদেশী) মধ্যে সীমিত থাকবে এবং তাঁরা এই উৎসবে হস্তক্ষেপের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এই ভেবে যে, বিদেশে সোরগোল উঠবে যে, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইত শাসকগোষ্ঠি অসহনীয়তা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছেন। তা সত্ত্বেও কিছু অদ্ভুত ধরণের হস্তক্ষেপ ঘটল, যেমন কর্তৃপক্ষ রেনে ক্লেয়ারের ছবি, 'আ নাউস লা লিবার্তে'র নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করলেন 'আ মে লা লিবার্তা'। ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠি ভীত হলেন এই ভেবে যে, ছবিটির মূল নাম ইতালীর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠবে বা এই নাম সংগ্রামের জন্যে এক মারাত্মক আহ্বানস্বরূপ হয়ে উঠবে।

ভেনিসের কিছুটা প্রস্তুতিহীন প্রথম উৎসবে তিনটি সোভিয়েত ছবি 'রোড্ টু লাইফ্' (নিকোলাই এক), 'আর্থ' (ডভ্‌ঝেঙ্কো) ও 'কোয়ায়েট্ ফ্লোজ্ দি ডন্' (অল্‌গা প্রেব্রা ঝেন্সকায়া ও ইভান্ প্রাভ্‌ভ্) দেখানো হল। সমস্ত ছবিগুলিই বিশেষ করে এক নির্দেশিত ছবিটি বিপুলভাবে সমাদৃত হল। সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হল—'রাশিয়া নতুন ভাষায় কথা বলছে'। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা খুব বাস্তবতার সঙ্গে দর্শকদের মতামতের ভিত্তিতে কোন পুরস্কার বা পদক ছাড়াই উৎসবে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করলেন। সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলেন, নিকোলাই এক এবং তাঁর ছবি 'রোড্ টু লাইফ্' সমালোচক ও চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল। অনেকে এই প্রচণ্ড প্রভাবের সূত্র অনুসরণ করে মনে করেন যে, একের 'ওয়েফ্‌স্' ডি সিকার 'স্কিউস্কিয়া'র পূর্বসূরী।

ডভ্‌ঝেঙ্কোর 'আর্থ' এত উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসিত হয়নি সম্ভবতঃ এই কারণে যে, ছবিটির দর্শক ছিলেন সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। তা হলেও সমালোচকরা একইরকম উৎসাহে ছবিটির সমালোচনা প্রকাশ করলেন। সবচেয়ে সুন্দর বিচার অবশ্য ফ্যাসিস্টদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তাঁরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ভেনিসে প্রদর্শিত ছবিটির প্রিন্ট বাজেয়াপ্ত করে নিলেন।

ভেনিসে প্রথম চলচ্চিত্র-উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রায় একই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। উমবের্তো বার্বারোর উদ্যোগে পুডোভ্‌কিনের 'সিনেমাটোগ্রাফিক থিম্‌স'-এর ইতালীয় অনুবাদ 'Il soggetto Cinematograficos' প্রকাশিত হল

বার্বারো লিখেছেন, "পুডোভ্‌কিনের এই ছোট বইটি নতুন উপলব্ধিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করল। আমার মনে হল, এই বইটি পড়ার আগে চলচ্চিত্রের জগৎ আমার কাছে যেন অবাস্তব ও অচেনা ছিল। এই উপলব্ধি বা ধারণাও সবচেয়ে প্রবল ছিল না, আমার সবচেয়ে প্রবল উপলব্ধি চলচ্চিত্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেল। কেননা, পুডোভ্‌কিনের প্রশান্ত উদ্‌ঘাটন আমি এবং অন্যান্যরা যে সংস্কৃতির সেবা করছিলাম, তাকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙেচুরে দিল, যদিও আমি এই সংস্কৃতিকে সব সময়ই অসহনীয় ভাবতাম…'আদর্শগত শিল্প', 'বাস্তবসম্মত শিল্প', 'সম্পাদনা'…এক প্রশস্ত রাজপথ, শিল্প সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার এক নির্দিষ্ট পথ, ইতালীতে বর্তমান সমস্ত কিছুর বিপরীত…বইটি ছিল ফ্যাসিজমের আবহাওয়া, এমনকি ইতালীয় সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত নামী ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যের সীমানার বাইরে, এই ব্যবধান এত বিশাল ছিল যে, আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে বইটিকে একান্ত অবাস্তব ভেবেছিলাম এবং এর ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করেছিলাম।"

"কিন্তু বইটি প্রশংসায় সাড়া জাগিয়ে তুলল। সংবাদপত্রের উল্লেখেও প্রশংসার মালা…এবং আমরা অনুশীলন করতে বসলাম, এবারে বেশ কঠিন বিষয় কেননা এগুলি ছিল পুডোভ্‌কিনের ছবি।"

পুডোভ্‌কিনের উজ্জ্বল বইটি এবং এই সোভিয়েত পরিচালকের অন্যান্য রচনাবলী পরবর্তীকালে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। অনেক তরুণ পরিচালক, অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান, চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের কাছে বইটি পাঠ্যপুস্তকের মত অবশ্য পঠনীয় হয়ে উঠল। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৩৩ সাল প্রথম প্রত্যক্ষ করল এই প্রভাবের বাস্তব ফসল। আলেক্সান্দ্রো ব্লাসেত্তির ছবি "১৮৬০" মুক্তিলাভ করল। ছবিটি উল্লেখযোগ্য, এক সুস্পষ্ট অধ্যায়ের স্মারক, ইতালীর চলচ্চিত্রে দিনবদলের এক সুস্পষ্ট দিকচিহ্ন, ছবিটি অত্যন্ত সুষ্ঠু, প্রশ্নাতীত, এবং আমি বলব যে সোভিয়েত ছবির অনিবার্য প্রভাবের অতুলনীয় চিহ্নে চিহ্নিত। ইতালীর রাইজঅরগিমেন্তোর গৌরবময় কাহিনী নিয়ে ছবিটি গ্যারিবাল্ডির "থাউজাণ্ড" এর কিছু কিছু ঘটনা নিয়ে গিউসেপ্পে সিজারে আব্বার রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। গ্যারিবাল্ডির লক্ষ্য ছিল বুরবনদের হাত থেকে সিসিলির দুই রাজ্যকে মুক্ত করা। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের স্মারক "পোটেমকিন" ছবিটির মত '১৮৬০' ছবিটিও ইতালীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এই অধ্যায়ের, সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে অনুসরণ করেনি বরং কিছু কিছু নির্দিষ্ট মুহূর্তে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গত

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রভাবে সমৃদ্ধ এই ছবিটি সম্পর্কে করাডো আলভারোর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে কোন নায়ক ছাড়া এই ছবিটির মূল চরিত্র হচ্ছে জনতা এবং ছবিটি ঘটনার গতির ছন্দে নির্ভরশীল। ছবিটি সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রতীক 'দি ব্যাটলশিপ পোটেমকিন,' 'ডিসেণ্ডাণ্ট অফ চেঙ্গিজখান,' এবং 'ব্লু এক্সপ্রেস' প্রভৃতি ছবিগুলির অনুসারী। এ এক অত্যন্ত উপভোগ্য কৌশল কেননা এই কলা-কৌশল ব্যক্তিগত কাহিনী ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এক সামগ্রিক চরিত্রে গ্রথিত করে এবং সহযোগী ভূমিকাগুলি সমগ্র ঘটনাকে অবলম্বন করে বিধৃত হয়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা জনগণের আন্দোলন ও ধারণাতে মিলিত হয়। '১৮৬০' ছবিটি এই কলাকৌশলের সার্থক দৃষ্টান্ত।"

আলভারো (যিনি বহু বছর পরে, নয়া-বাস্তবতার যুগে নিজেই ছবিতে কাজ শুরু করেছিলেন, যিনি 'বেকনস ইন দি ফগ' এবং 'ট্রাজিক হান্ট' ছবিতে চিত্রনাট্য রচনার কাজ করেছিলেন।) '১৮৬০' ছবিতে সোভিয়েত প্রভাবের বিশদ ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া ব্লাসেট্টি নিজেও এই প্রভাবকে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ব্লাসেট্টির কথায় প্রথম যুগের সোভিয়েত ছবিগুলি যেমন 'ডিসেণ্ডাণ্ট অফ চেঙ্গিসখান,' 'দি ব্যাটলশিপ পোটেমকিন,' 'মাদার' ও আরো অনেক ছবি আজকের নতুন ইতালীয় চলচ্চিত্রে এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রভাব সমান ভাবে পড়েছে সেই সমস্ত তরুণদের ওপর যাঁরা ফিল্ম স্টুডিওতে কাজ করছিলেন এবং সেই নবীন উৎসাহীদের যাঁরা পরবর্তীকালে স্টুডিওতে এসেছিলেন। যদি আমার ব্যক্তিগত মতামত কোন প্রয়োজনে লাগে তাহলে আমি বলবো যে, সে যুগের উল্লেখযোগ্য সোভিয়েত ছবিগুলি সম্পর্কে আমার অত্যন্ত উচ্চ ধারণা রয়েছে যদিও ছবি অনুযায়ী এই ধারণার বিভিন্নতা রয়েছে। আমি কিছুটা কমখ্যাত ছবি নিকোলাই এক পরিচালিত 'রোড টু লাইফ' সম্পর্কে সবচেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করি। আমি ছবিটিকে শুধুমাত্র প্রশংসা করিনা বা ছবিটি সম্পর্কে কেবল অভিভূতই নই, আমি নিশ্চিন্তভাবে বুঝেছি ছবিটি অপূর্ব কলাকৌশলে সমৃদ্ধ এবং প্রবলরকম দর্শনীয়তা ছাড়াও 'রোড টু লাইফ' এক নতুন, সজীব এবং প্রাণবন্ত মানবতার আলোকবর্তিকা স্বরূপ........."

সে বছরে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রভাবে সমৃদ্ধ আরো একটি ছবি মুক্তিলাভ করলো। ছবিটি এমিলো সেকৃচি নির্দেশিত 'স্টীল'। পুডোভকিন, আইজেনস্টাইন প্রমুখ সোভিয়েত পরিচালকদের তত্ত্বগত রচনাবলী প্রতিশ্রুতিময় ইতালীয় চলচ্চিত্রের নতুন শক্তির বিকাশে ও সমৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করলো। এবং এইভাবে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারিত হল ইতালীয় ছবির জগতে। এখন চলচ্চিত্র বিষয়ক সোভিয়েত গ্রন্থ ও পুস্তকাবলী ইতালীতে অনুবাদ হয়েছে বিপুলভাবে।

এইভাবে আমরা এলাম ১৯৩৪ সালে যখন ভেনিসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল। বেশ কিছু সংখ্যক কাহিনী ও তথ্যচিত্র নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই উৎসবে যোগদান করলো। ১৯৩২ সালের উৎসবের সময় যে ধরণের পরিবেশ ছিল এবারের উৎসবের পরিবেশ ছিল তার বিপরীত। নাজীবাদের অভ্যুদয়ে ইয়োরোপের রাজনৈতিক অবস্থা তখন সমস্যাসঙ্কুল। বিগত উৎসবের প্রস্তুতিহীনতা এবারে ছিলনা বরং এবারের উৎসব ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। কিন্তু এই সুসংগঠনের সঙ্গে উৎসবে পুলিশের অনুপ্রবেশ ঘটলো। নিম্নোক্ত ছবি-গুলি ভেনিসের দ্বিতীয় উৎসবে প্রদর্শিত হল। গ্রিগরী আলেকজান্দ্রভের 'মেরী ফেলোজ,' আলেকজাণ্ডার ডভ্‌ঝেঙ্কো পরিচালিত 'ইভান,' ভ্‌ল্যাদিমির পেট্রভের 'দি স্টর্ম,' আলেকজাণ্ডার পটুশকোর 'দি নিউ গালিভার,' মিখাইল রম নির্দেশিত 'বল অফ ফ্যাট,' 'গ্রিগরী রোশাল ও ভেরা স্ট্রয়েভা পরিচালিত 'সেণ্ট পিটার্সবার্গ নাইট।' এছাড়া উৎসবে প্রদর্শিত তথ্যচিত্রগুলি ছিল, ইয়াকভ পসেলস্কি পরিচালিত 'দি পিপল অফ চেলুইস্কিন,' ঝিগা ভের্তভ নির্দেশিত 'থি্রি সঙস অ্যাবাউট লেনিন' ও সয়ুজ-কিনো প্রযোজিত 'স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল ইন মস্কো'। ছবিগুলি বিপুলভাবে সমাদৃত হল। এবং বিদেশের শ্রেষ্ঠ ছবি মনোনয়নের বিচারে সোভিয়েত ছবিগুলি সামগ্রিক ভাবে 'গোল্ডেন কাপ' পুরস্কারে ভূষিত হল। বিশেষভাবে উল্লেখ পেল 'ইভান' ও 'নিউ গালিভার,' 'বল অফ ফ্যাট' ও 'সেণ্ট পিটার্সবার্গ নাইট'।

সমালোচনায় অবশ্য একটি বিশেষ সুর শোনা গেল বিশেষ করে সেই সমস্ত সংবাদপত্রগুলিতে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে ফ্যাসিস্টদের কর্তৃত্বে ছিল। মতামত সোচ্চারিত হল যা পরবর্তীকালে যুদ্ধোত্তর যুগেও কিছু কিছু সমালোচক গ্রহণ করেছিলেন যে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের সুবর্ণ যুগ অবসিত হয়েছে। উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি অবশ্য এ জাতীয় সমালোচনার যথার্থতা প্রমাণ করেনা। বরং এই সমালোচনা একতরফা, অপরিণত ও উদ্ভট লাগে এই ভেবে যে সেবছর সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ্যাসিলিয়েভ ভ্রাতৃদ্বয় 'চ্যাপায়েভ'-এর মত মহৎ ছবি নির্মাণ করেছিলেন এবং পরবর্তী বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে 'আলেকজাণ্ডার নেভ্‌স্কী', 'ইভান দি টেরিবল', 'স্করস' ও 'দি রিটার্ণ অফ ভাসিল বর্তনিকভ' প্রভৃতির মত ছবি নির্মিত হয়েছিল।

যুদ্ধপরবর্তীকাল অবধি ভেনিসে ছবি প্রদর্শনের এটিই ছিল শেষ বছর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা তখন চতুর্দিকে। ফ্যাসিস্ট ইতালী

ইথিওপিয়া আক্রমণ করলো এবং এর অব্যবহিত পর থেকেই স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোকে বিপুলভাবে সাহায্য করতে শুরু করলো। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠী অবশেষে সাংস্কৃতিক প্রকাশ ও শিল্পসৃষ্টির সমস্ত স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করলো। চলচ্চিত্র তাদের বিশেষ মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠলো. বিদেশী ছবিগুলির ক্ষেত্রে সেন্সরশিপের বিধি-নিষেধ অত্যন্ত অনড় হয়ে উঠলো (এবং বিশেষ করে সোভিয়েত ছবিগুলির ওপর ভীষণভাবে কাঁচি চালানো হত।) সেন্সর কর্তৃপক্ষ ইতালীর চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ক্রমশঃ জগদ্দল পাথরের মত হয়ে উঠলো এবং বিদেশের ধ্বংসাত্মক আদর্শ থেকে ইতালীয় চলচ্চিত্রকে সযত্নে রক্ষা করার জন্য ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে সতর্ক হয়ে উঠলো। অপরদিকে আবার ফ্যাসিস্ট কর্তৃপক্ষ তাদের প্রচারচিত্র নির্মাণে সচেষ্ট হল এবং ইতালীয় চলচ্চিত্রকারদের এ ধরণের ছবি নির্মাণের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হল।

"ফ্যাসিস্টরা সোভিয়েত ছবির বহিরঙ্গকে অনুকরণ করতে চাইলেন এবং সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের পরীক্ষিত কলাকৌশল কিছু কিছু প্রচারচিত্রে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হলেন দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ব্ল্যাক শার্ট' ছবিটির কথা বলা যেতে পারে। সাধারণ নিয়মের বাঁধনে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের মহান শিক্ষাকে আবদ্ধ করার বিষয়ে এই ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠীর প্রচেষ্টার ফলাফলের কথা অনেকেই মনে করতে পারবেন………" (উমবের্তো বার্বারো)।

এই সমস্ত প্রচেষ্টা এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হল যখন আলেক-জান্দ্রভের ছবি 'মেরি ফেলোজ'-এর একাধিক দৃশ্য কার্লো এল, ব্রাগা-গলিয়া নির্দেশিত 'র‍্যাবিড অ্যানিমালস' (১৯৩৮) ছবিতে ব্যবহৃত হল। ফ্যাসিস্ট প্রচারমূলক ছবির প্রসঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক এক আঙ্গিক যা সোভিয়েত ছবির বক্তব্যকে সঠিকভাবে বহন করতে পেরেছিল– অন্ধ অনুসরণের এই প্রচেষ্টা আইজেনস্টাইনের ভাষায় মর্গে প্রাণ সঞ্চার করার মত হয়ে দাঁড়াল। তবুও এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটল যখন এই অনুকরণ একটু গভীর হয়ে গেল যখন এই আঙ্গিক বক্তব্যকে সামান্যভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হল তখনই প্রশ্নাতীত প্রচারচিত্রগুলির মধ্যে এমন ছবি দেখা গেল যার ব্যাখ্যার বিভিন্নতা ফ্যাসীবাদীদের মধ্যে সন্দেহ, বিতর্ক ও সংঘাতের সৃষ্টি করলো এবং অবশেষে সেই ধরণের বিতর্কমূলক ছবি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। এই ধরণের ঘটনা 'দি ওল্ড গার্ড' ছবিটির ক্ষেত্রে ঘটলো, ছবিটির পরিচালক ছিলেন সেই ব্লাসেটি যিনি এর আগে '১৮৬০' ছবিটি পরিচালনা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ব্লাসেটি সেই সময় নিরুপায় হয়ে ফ্যাসিস্টদের চাপে তাদের নির্দেশমত ছবি তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই সময়ে যখন ফ্যাসিস্টরা সোভিয়েত চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতাকে উপযোগিতামূলক ভিত্তিতে ব্যবহার করায় সচেষ্ট, তখন একদল তরুণ চলচ্চিত্রশিক্ষার্থী আত্মপ্রকাশ করলেন এবং নিজেরা সংঘবদ্ধ হলেন। এই তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন উমবের্তো বার্বারো এবং চিয়ারিনি। এঁদের দুর্গ হয়ে দাঁড়ালো রোমের এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম সেন্টার, যেখানকার পাঠ্যসূচী আইজেনস্টাইন ও পুডোভকিনের রচনাকে ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই সেন্টারে কিভাবে 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' ও 'দি এণ্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ' ছবির প্রিন্ট সংগৃহীত হয়েছিল এবং এখানে বারবার এ দুটি ছবি দেখানো হত। ('মাদার' ছবিটি যুদ্ধের পরে ইতালীতে প্রদর্শিত হতে পেরেছিল)। এইভাবে ইতালীয় দর্শক যা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প ছিল এই ছবি দুটি দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এক্সপেরিমেণ্টাল সেন্টারের বাইরে গোপনভাবে এই ছবিগুলির প্রদর্শনীর আয়োজনের প্রচেষ্টা করা হল। এক্সপেরিমেণ্টাল সেন্টার শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রায় মুক্ত বন্দরের মত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টা নিরন্তর সরকারী আইন ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ব্যাহত হত। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশ কোনো কোনো ছবির সম্পূর্ণ প্রদর্শনীতে বাধা দিতেন না সম্ভবত কর্তব্যরত পুলিশবাহিনী এই আবেগদীপ্ত ছবিগুলি দেখে অভিভূত হয়ে যেতেন। আমি 'পোটেমকিন' ছবির একটি প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলাম। প্রেক্ষাগৃহে হঠাৎ পুলিশ প্রবেশ করলো, যখন ছবির পর্দায় দেখা যাচ্ছে যে কশাকরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে। যখন নৌবাহিনীর সমস্ত জাহাজ পোটেমকিনের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন পোটেমকিন সাগরে পাড়ি জমানোর জন্য প্রস্তুত, যখন নাবিকদের 'হুররে' ধ্বনির সঙ্গে দর্শকরাও গলা মিলিয়েছে, তখনই পুলিশবাহিনীর মনে পড়েছে যে কি কারণে তারা প্রেক্ষাগৃহে এসেছে। কিন্তু তখন প্রদর্শনী বন্ধ করা বা প্রেক্ষাগার শূন্য করে দেওয়ার বিষয়ে তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করায় অনেক দেরী হয়ে গেছে।

সেই সময়ে যে তরুণ চলচ্চিত্রকারদের দল এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম সেন্টারে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের ছবি ও রচনা থেকে শিক্ষালাভ করছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে নয়া-বাস্তবতার যুগের পুরোধা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

আমরা আরো একটি উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনার সাক্ষী হলাম। চলচ্চিত্র থেকে উদ্‌গত আদর্শগুলি ক্রমশঃ এক এবং নিরন্তর প্রসারিত হয়ে ফ্যাসীবাদ বিরোধিতার স্রোতে ব্যাপ্ত হচ্ছিল। এই প্রতিবাদ ও বিরোধ চূড়ান্তভাবে প্রতিভাত হল আগামী দিনের প্রতিরোধ আন্দোলনে।

যুদ্ধের বছরগুলি ইতালীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বস্তুতঃ নতুন কিছুই সংযোজন করেনি, কেবলমাত্র এই দুঃসহ বছরগুলিতে জনগণের সামাজিক বোধ আরো পরিণত হয়েছিল। এবং এইভাবেই পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক বীজই শুধু রোপিত হয়নি, ধ্বনিত হয়েছিল আগামী দিনের আলোকোজ্জ্বল সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সঙ্কেত। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইতালীয় চলচ্চিত্রের সার্থক জয়যাত্রা শুরু হল। ১৯৪৬ সালের ২৩শে আগস্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর ভেনিসের অতীব সুদৃশ্য দোগে-র প্যালেসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল। নটি দেশ উৎসবে এই যোগদান করলো—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, তুরস্ক, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও ভ্যাটিকান। এই প্রথম ভেনিস উৎসবে সকলরকম বাধানিষেধমুক্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশকিছু তাৎপর্যময় ছবি নিয়ে এই উৎসবে যোগদান করলো এবং এইভাবে ১৯৩৪ সালে থেমে যাওয়া আলোচনা ও বিতর্ক আবার প্রবলভাবে শুরু হল। উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি ছিল ভ্যাসিলিয়েভ ভ্রাতৃদ্বয় পরিচালিত 'চাপায়েভ,' আলেকজাণ্ডার জারখী ও হেয়োসিফ হেইফিংজ নির্দেশিত 'বালটিক ডেপুটি', ভিক্টর এইসিমস্ত পরিচালিত 'দেয়ার লিভড্ এ লিটল গার্ল' ভ্লাদিমির পেট্রভ-এর 'গিল্টি ইনোসেন্টস,' মার্ক ডনস্কয় নির্দেশিত 'আনভ্যাঙ্কুইসড্' এবং মিখাইল চিয়াউরেলি নির্দেশিত 'দি প্লেজ'।

কিন্তু পরের বছরের ভেনিস উৎসব আরো গুরুত্বপূর্ণ আরো তাৎপর্যময়। এই উৎসবে পুডোভকিনের আরো একটি ছবি 'অ্যাডমিরাল নাখিমভ' দেখানো হল এবং এই উৎসবে সোভিয়েত ধ্রুপদী ছবির এক বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজিত হল। এই বিশেষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইতালীয় দর্শকরা দেখতে পেলেন ভিয়াচেস্লাভ ভিস্কোভস্কি নির্দেশিত 'জানুয়ারী ৯' (এ ছবিটি অবশ্য আগেও দেখানো হয়েছিল) আইজেনস্টাইনের 'দি ওল্ড এণ্ড দি নিউ' ও 'অক্টোবর' এবং গ্রিগরী আলেকজান্দ্রভের 'সার্কাস', 'মেরি ফেলোজ,' 'ভলগা-ভলগা' এবং 'স্প্রিং'।

ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সংঘাতের মধ্যবর্তী এই সময়টি ছিল সংক্ষিপ্ত। এই উৎসবগুলিতে ইতালীয় চলচ্চিত্রকাররা উপহার দিলেন নয়া-বাস্তবতা যুগের প্রথম কয়েকটি ছবি আলডো ভার্গানো পরিচালিত 'দি সান রাইজেজ এগেন,' রবার্তো রসেলিনী নির্দেশিত 'পয়সা' ও গিউসেপে দা স্যান্টিস পরিচালিত 'ট্র্যাজিক হান্ট'। কিন্তু এই আলোচনা যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শুরু হয়েছিল তা সংক্ষেপিত হয়ে গেল আবার সেই আন্তর্জাতিক অবস্থার জন্য যা সে সময়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রকোপে অত্যন্ত বিষাক্ত ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এই ঘটনা ফ্যাসিজমের অবস্থার অনুরূপ ছিলনা। দুই দেশের চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে যোগাযোগ এসময়ে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়নি। ইতালীর সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরোধারা এসময়ে এগিয়ে এলেন যাতে এই বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী বা গভীর না হয়।

ফ্যাসিজমের বদ্ধ নাগপাশ থেকে মুক্তির পর চলচ্চিত্রে উৎসাহী ইতালীর মানুষ সোভিয়েত চলচ্চিত্রের যা কিছু সম্পদ এযাবতকাল প্রদর্শিত হতে পারেনি তা দেখে নিতে সচেষ্ট হলেন। এই ধরণের ছবি দেখার জন্য চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেল এবং তাঁরা একে একে সমস্ত ছবি দেখলেন, অনেক সময় ভালো নয় এমন ছবিও, অনেক অনেক সময় ভালো ছবি। সবক্ষেত্রেই এই দুই ধরণের ছবির মান বিচারে তাঁরা দৃষ্টিভঙ্গীর স্থিরতা রাখতে পারলেননা, দ্রুততার সঙ্গে মাঝে মাঝে এমন মতামত দিলেন যা পরবর্তীকালে আবার সংশোধন করে নিতে হল। কিন্তু ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ এই দশকের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই দুই দেশের সংস্কৃতির মধ্যে বিশেষ করে দুই দেশের চলচ্চিত্রের মধ্যে যোগাযোগের ভঙ্গুর সেতু বজায় রাখা সম্ভবপর হয়েছিল।

এই বছরগুলিতে এই ধরণের উদ্যোগ, প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত ছিল বিভিন্ন সংস্থা, বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন, ফিল্ম ক্লাব, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে। এই সমস্ত সংগঠন নিয়মিতভাবে ছবির প্রদর্শনী, বক্তৃতা ও সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। এই সময়ে ইতালীর চলচ্চিত্রের বিকাশে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের অবদানকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ শুরু হল। এই ধরণের গবেষণা উমবের্তো বার্বারোকে বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কারে সাহায্য করলো যে আবিষ্কারের মূল সূত্র হচ্ছে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের পরীক্ষিত চলচ্চিত্র-শিল্পের মূল তত্ত্বই ইতালীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের নব অভিযান শুরুর উৎস স্বরূপ এবং এর অনিবার্য প্রভাব ইতালীয় চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির নব নব বিকাশে সাহায্য করেছে।

বহু সমালোচক, চলচ্চিত্রকার এবং বিশেষ করে চলচ্চিত্র শিল্পের ছাত্ররা ইতালীয় চলচ্চিত্রের বিপুল অগ্রগতিতে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রভাবের তাৎপর্যকে স্বীকার করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু পরোক্ষ প্রভাবের কথা বলেন, তাঁদের মতে এই প্রভাব চলচ্চিত্রের নয় এই প্রভাব শুধু তত্ত্বগত রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ কেননা শিল্পগত প্রকৃতি এবং নান্দনিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের বিভিন্নতা প্রত্যক্ষ ও সার্থক যোগাযোগের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। আবার কেউ কেউ এই প্রভাবকে ইতালীয় চলচ্চিত্র সংস্কৃতির বিকাশে চূড়ান্ত তাৎপর্যময় বলে বর্ণনা করেন। অন্যান্য অনেকে যেমন মারিও গ্রোমো মনে করেন সোভিয়েত প্রভাব ইতালীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে খুব ব্যাপক নয় কেননা ফ্যাসিস্ট শাসক গোষ্ঠী জনগণকে সোভিয়েত ছবি দেখার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়নি যদিও একই সময় তিনি স্বীকার করেন যে ইতালীয় ছবির পুনরুজ্জীবনে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের

ভূমিকা অনস্বীকার্য। এবং কেউ কেউ ব্লাসেট্টির মত তৎকালীন সোভিয়েত চলচ্চিত্রকে মহান শিল্পের আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে মতামত দিয়ে থাকেন। এছাড়া লুইগি চিয়ারিনি-র মত প্রখ্যাত চলচ্চিত্র গবেষকরা বলেন পুডোভকিন ও আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্র অনুশীলনের মূল সূত্র এবং আজকের দিনেও চলচ্চিত্র অভিধান অনুসরণে এবং সামগ্রিক ভাবে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও বিশদীকরণে অবশ্য প্রয়োজনীয়। এছাড়াও চলচ্চিত্র সমালোচনায় আন্তর্জাতিক খ্যাত সিজানী-র মন্তব্য উল্লেখযোগ্য "ডি সিকা ও রসেলিনীর প্রথমদিকের ছবিগুলিতে পুডোভকিন ও তাঁর সহকর্মীদের দৃশ্য-কল্পনা ও আঙ্গিকের প্রতিফলন দেখা যায়।"

সোভিয়েত ছবির প্রশংসা শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের জগতে অর্থাৎ চলচ্চিত্রের ছাত্র ও রসজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা চলচ্চিত্র দর্শকদের এক বিপুল অংশ সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্পের মহান কীর্তির সৌন্দর্য ও শক্তিতে অভিভূত ও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। সোভিয়েত ক্রুপদী ছবির আলোচনা ও প্রদর্শনীতে, বামপন্থী সাহিত্য-পত্রিকাগুলির বিতর্কে এবং সমকালীন ও পুরানো সোভিয়েত ছবির মধ্যাহ্ণ প্রদর্শনীতে জনগণ বিপুল উৎসাহে অংশ-গ্রহণ করলেন। সাধারণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সোভিয়েত ছবির সাফল্য বিচার করলেই এই জনপ্রিয়তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। সোভিয়েত তথ্য-চিত্র ও শিশু-চিত্র (শেষোক্ত বিভাগের সোভিয়েত ছবিগুলি বলা যায় ভেনিসের আন্তর্জাতিক উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কারসমূহের সিজন টিকিট কিনেছে) সাধারণ এবং সর্বসম্মত প্রশংসা অর্জন করেছে।

সম্ভবত যখন নয়া বাস্তবতার অত্যন্ত উজ্জ্বল তারকা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল তখন পুরানো অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আবার নতুন উৎসাহ দেখা গেল। বিশ দশকের সোভিয়েত ছবির পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষতঃ ঝিগা ভের্তভের 'সিনেমা ভ্যারাইটি' এই নতুন উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলো। চলচ্চিত্রগত প্রকাশ মাধ্যমের নিরন্তর অনুসন্ধান এক সৎ প্রচেষ্টা হিসেবে আজও অব্যাহত, এই অনুসন্ধান মননশীল দর্শকের সাথে একাত্ম হওয়ার সঙ্গে জড়িত। (এই ইতালীর চলচ্চিত্রের বাজারে 'ওয়েস্টার্ন' মার্কা ছবির এবং সাধারণভাবে বাস্তবতাজিত ছবির প্রাবল্য, এই সমস্ত ছবির এমন অনেক পরিচালক আছেন যাঁরা এর আগে 'আদর্শবাহী' ছবি নির্মাণে অগ্রণী ছিলেন।) তবুও সার্বিক নৈরাশ্য থেকে উত্তরণের পথ অনুসন্ধান চলছে, সোভিয়েত চলচ্চিত্রের বিশ দশকের মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে পরশমণি করে আজও ইতালীর চলচ্চিত্র-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চলেছে।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র এক মহৎ ও অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে, সোভিয়েত চলচ্চিত্র শুধু ইতালীর চলচ্চিত্রে নয় বস্তুতঃ সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র শিল্পকে বক্তব্য ও আঙ্গিকের দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন নিঃসন্দেহে বলা যায় অক্টোবর বিপ্লবের পরে পৃথিবীটা আর আগের জায়গায় রইলনা তেমনি বলা যায় যে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের আত্মপ্রকাশের পরে পৃথিবীর চলচ্চিত্রশিল্প আর আগের অবস্থায় রইলনা। এর আগে চলচ্চিত্র ছিল এক উপভোগ্য গতিশীল চাতুর্য, প্রযুক্তিবিদ্যার এক নব কৌশল যা মানুষের কৌতুহল নিবৃত্তিতেই সফল, পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র শিল্প হিসেবে পরিগণিত হল।

CHITRA-BIKSHAN ::

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 August 1979 Vol. 12 No. 11

Published by Asoke Chatterjee from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANEE, 131B, B. B. Ganguli Street, Calcutta-12. Cover : De-Luxe Printers.

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

দ্বাদশ বর্ষ
দ্বাদশ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর, '৭৯



চিত্রবীক্ষণ

সম্পাদক : অনিল সেন

প্রচ্ছদচিত্র : 'ইন্টারভিউ'
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

বিষয়সূচী

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় কর্পোরেশন লিমিটেড

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সমবায় পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত অর্থকরী কর্মসূচী রূপায়ণের নিমিত্ত প্রদত্ত বিবিধ ঋণদানের সুবিধা গ্রহণ করিবার জন্য সাধারণভাবে আদিবাসীগণের সমবায় সমিতিগুলিকে এবং বিশেষভাবে আদিবাসীগণের সমবায় সমিতিগুলিকে (lamps) আহ্বান জানান যাইতেছে।

- কৃষিকর্মের সহায়ক বীজ কীটনাশক ঔষধ।
- যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ।
- কৃষি ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও বিপণন।
- নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ।
- বিবিধ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
- পশুপালন, কুটীর শিল্প ও বিভিন্ন অর্থকরী প্রকল্প রূপায়ণ।
- সমবায় শস্য ভাণ্ডার পরিচালন ইত্যাদি।

এই বিষয়ে উদ্যোগী সমবায় সমিতিগুলিকে কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্রযত্নে অধিকর্তা তফসিলী ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ, ৯ নং রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭৩ এবং সংশ্লিষ্ট জিলার তফসিলী ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণের সহিত যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় কর্পোরেশন লিমিটেড।

আমাদের সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম শহরের মানুষ আজ এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হয়ে ন্যায্য দাবী আদায় ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন।

কিন্তু জনসাধারণের শত্রুরা মরিয়া হয়ে জনগণের এই সংগ্রামী ঐক্য নষ্ট করে দিতে চাইছে।

তারা চাইছে ধর্মের নামে বাঙ্গালীয়ানার নামে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ভাঙ্গন ধরাতে।

এ দেশ রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের। এ রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, সংগ্রামে-আন্দোলনে একে অন্যের সাথী ও অংশীদার। এখানে স্থান নেই কোন ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার। স্থান নেই মূঢ় ধর্মান্ধতার কিংবা কোন কুটিল ভেদবুদ্ধির।

সংগ্রামী জনগণ ধর্ম বা প্রাদেশিকতার ভেদাভেদ জানে না, মানে না।

বিচ্ছিন্নতাবাদী চরম প্রতিক্রিয়ার অশুভ শক্তিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করুন।
সব রকমের প্ররোচনা চক্রান্তকে পরাস্ত করুন।
পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করুন।

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা জনসাধারণের শত্রু

আইসিএ ৮৮৪৩/৭৯

॥ ওদের বলতে দাও ॥

সরকার বদল মানেই নতুনভাবে কিছু পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি। ব্যাপারটা এতো স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে এ নিয়ে মাথা ঘামানো মানে মাথা ধরা। নতুন মন্ত্রী মানেই কিছু সদিচ্ছার বাণী সজোরে সশব্দে ছড়িয়ে দেওয়া। আর এই দুয়ের যোগফল হচ্ছে 'কমিশন', 'স্টাডি গ্রুপ' বা 'ওয়াকিং গ্রুপ' ইত্যাদির তৈরী ভারী মাপের রিপোর্ট। নতুন যখন কিছুটা পুরাতন হয়ে যাবে তখন হারিয়ে যাবে এই প্রতিশ্রুতি, দফতরের কোণে লালফিতার বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে সেই রিপোর্টের সুপারিশ।

কথাটা উঠলো কেন্দ্রীয় সরকারের 'ফিল্মস ডিভিসন' প্রসঙ্গে। আজ প্রায় এক যুগ ধরে মাঝে মধ্যে শোনা যায় 'ফিল্মস্ ডিভিসন'-এর কর্ম-পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা। ষাট দশকের মধ্যভাগে ভাবনগরীর যুগে এক ঝোড়ো হাওয়া এসেছিলো কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু অন্ধকারের জীবরা তো আলো হাওয়া সহ্য করতে পারেনা। তাই অচিরেই আশার আলো নিভে গেল।

এখন আবার হৈ-চৈ হচ্ছে 'ফিল্মস ডিভিসন'-কে স্বয়ংশাসিত করা হবে কি হবেনা তাই নিয়ে। সরকার নিয়োজিত কমিটির সুপারিশ মানতে যখন সরকারই গররাজী, তখন অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। যে সরকারই গদীতে আসুন না কেন, তারা দেশজোড়া প্রচারের এই সহজলভ্য ঢাকটিকে নিস্তব্ধ করতে চাননা, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে 'ফিল্মস ডিভিসন' কবে স্বয়ংশাসিত হবে, সে কথা চিন্তা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কি চলবে! দিনের পর দিন ভারত জুড়ে ফিল্মস ডিভিসনের এই একচেটিয়া প্রচার কি অব্যাহত গতিতে চলবে?

সারা পৃথিবী জুড়ে যে নতুন চলচ্চিত্র আন্দোলন চলছে তার প্রাণকেন্দ্র হ'ল স্বল্পদৈর্ঘের ছবি আর তথ্যচিত্র। কিন্তু পৃথিবীর সর্বোচ্চসংখ্যক ছবি নির্মাণের ক্ষেত্র এই দেশ ভারতবর্ষে 'ডকুমেণ্টারী' বলতে খুব স্বাভাবিকভাবেই বোঝায় মন্ত্রীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বা সরকার কিভাবে গ্রামে নতুন জীবন আনছে তার ছবি! 'সৃজনশীল বাস্তবতা'র সঙ্গে এইসব ছবির বাস্তবতার আসমান জমিন ফারাক। ফিল্মস ডিভিসনের ছবি যতোই নির্লজ্জ প্রচার বা নিম্নমানের হোক—ম্যালেরিয়া রোগীর ক্লোরোকুইন খাওয়ার মত সারাদেশের আবালবৃদ্ধবণিতাকে এইসব অসহ্য ছবিকে সহ্য করতে হয়। কারণ সেই বৃটিশ জমানার আইন অনুযায়ী সমস্ত প্রেক্ষাগৃহকে আবশ্যিকভাবে 'ফিল্মস ডিভিসন'-এর ছবি দেখাতে হবে। আর এই একচেটিয়া অধিকার পেয়েই তারা নির্মূল করতে চায় নতুন চিন্তাধারা, বিতর্কমূলক ভাবনা আর জীবনের বাস্তব ছবি।

সাহিত্যিকের কালি কলম আর চিত্রকরের রং-তুলির মতো চলচ্চিত্র এতো সহজ তৈরী হয়না। তাই যারা বহু কষ্ট করে বহু টাকা যোগাড় করে ছবি বানান তারা অন্তত এটুকু আশা করেন যে তাদের ছবি দেখানো হবে। কিন্তু বেসরকারী ছবি কার্যত বাক্সবন্দী হয়ে থাকবে যদি না ফিল্মস ডিভিসন বা রাজ্য সরকার তা কিনে নেন। সরকারের মনোমত না হলে সে ছবি যে বিক্রী হয় না এই সহজ সত্যটাকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না।

আজকে তরুণ চিত্রানুরাগীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় তৈরী করছেন স্বল্পদৈর্ঘের ছবি। এরা প্রচলিত নিয়মের গণ্ডী অতিক্রম করে তৈরী করছেন নতুন ছবি, তুলছেন বিতর্ক, ভাবাচ্ছেন দর্শকদের। আজ এই আন্দোলন ক্ষীণকায়—কিন্তু সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকলে একদিন এরই থেকে সৃষ্টি হতে পারে এক নতুন চলচ্চিত্র আন্দোলন।

আজকে তাই প্রশ্ন উঠছে যাদের ছবি সরকার (কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার যাই হোক না কেন) কিনছেন না তারা কি সুযোগ পাবেন সাধারণের কাছে তাদের ফিল্মকে পৌঁছে দিতে। বিতর্ক, দ্বিমত এতো শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা চাই এই তরুণ চলচ্চিত্রকাররা তাদের তৈরী স্বল্পদৈর্ঘের ছবি দেখানোর সুযোগ পান। আমরা দাবী জানাচ্ছি প্রেক্ষাগৃহগুলিতে মাসের মধ্যে অন্তত এক সপ্তাহ সরকারী পরিবেশনার বাইরের স্বল্পদৈর্ঘের ছবি বাধ্যতামূলকভাবে দেখানোর জন্য আইনের পরিবর্তন করা হোক—এব্যাপারে স্বাধীন চলচ্চিত্র প্রযোজকেরা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গঠন করতে উৎসাহী হবেন এবং চলচ্চিত্র পরিবেশকরাও আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন।

বাক্সবন্দী রেখে চলচ্চিত্র তৈরী অর্থহীন। আমরা চাই সেই বন্দীত্বের অবসান।

ওদের বলতে দাও।

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, থারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

'জলসাঘর'-এর মহিম চরিত্র প্রসঙ্গে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

(১)

'জলসাঘর' ছবির মহিম চরিত্র ও তার চরিত্রায়ণ নিয়ে সম্প্রতি একটি পত্রিকায় কিছু বিতর্ক উঠেছে। বিতর্কের মূল সূত্র বর্তমান লেখকের পাঁচ/সাত বছর আগের লেখা 'জলসাঘর' ছবির মূল্যায়ন যা 'চিত্রবীক্ষণে'-ই প্রকাশিত হয়েছিল। সেই আলোচনায় জলসাঘর সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত একটি মূল্যায়নে ছবির মূল ত্রুটির একটি দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল ছবিতে সত্যজিৎ রায় দ্বিমুখী ভ্রান্তি ঘটিয়েছেন, (ক) সামন্ততান্ত্রিক বিশ্বম্ভর রায় চরিত্রের প্রতি অযৌক্তিক পক্ষপাত, এবং (খ) বিপরীত দিক থেকে নব্যবুর্জোয়া চরিত্র মহিমের প্রতি অযৌক্তিক অবিচার। এখন প্রশ্ন উঠেছে, প্রথম ভুলটি সত্যজিৎ রায় অবশ্যই করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি আদৌ কোন ভুল কিনা, কেননা নব্যবুর্জোয়া চরিত্রের সবচেয়ে মন্দ দিক যেটি 'টাকার গরম' বা 'সবার ওপর হল টাকা' এই অসংস্কৃত বোধ যা নব্য-বুর্জোয়ার চরিত্রে দানা বেঁধে ছিল এবং আজো আছে—তাকে প্রচণ্ড ভাবে তিরস্কৃত করা হয়েছে মহিম চরিত্রের মধ্যে এবং সেদিক থেকে সমস্ত ছবির মধ্যে অন্ততঃ মহিম চরিত্রের রূপায়ণে সত্যজিৎ রায়-ই সঠিক।

প্রশ্নটি ভেবে দেখার—কেননা এটি শুধুমাত্র 'জলসাঘর' ছবির সঠিক মূল্যায়নের জন্যই জরুরি নয়, সামন্ত যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের উত্তরণপর্বে নব্যবুর্জোয়া চরিত্রগুলিকে—সমগ্র বিশ্বসাহিত্য জুড়ে এবং চলচ্চিত্রেও যারা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে—তাদের কোন নান্দনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা দরকার—সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণাকে নির্ভুল করার জন্যও জরুরি।

সুতরাং প্রশ্নটি 'জলসাঘর' ছবির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ প্রশ্নটিকে তার সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা দরকার। সেই পরিপ্রেক্ষিতটি কি? সেটি হচ্ছে—মধ্যযুগের সামন্ত শ্রেণীকে সামাজিক উত্তরণ প্রক্রিয়ায় পরাভূত করে একটি নূতন যুগ নূতন মূল্যবোধ নিয়ে জন্ম নিল, শিল্প বিপ্লব একে ত্বরান্বিত করল এবং রেনেসাঁ ও ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে এই উত্তরণ একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে পৌছোচ্ছিল। এটা হচ্ছে ইউরোপের চেহারা। আমাদের দেশে এই উত্তরণ স্বভাবতঃই, পিছিয়ে পড়া দেশের মত, সমান ভাবে ঘটেনি—কিন্তু উত্তরণের মূল্যবোধগুলি দেরী করে এলেও এসেছে। এবং সামগ্রিক বিশ্লেষণে ইউরোপীয় উত্তরণের লক্ষণগুলি আমাদের ক্ষেত্রেও কম বেশি প্রযোজ্য।

বিশাল মনুষ্যজাতির অগ্রগতির হিসেব নিকেশ করার সময় আমরা লক্ষ্য করে এসেছি এই অগ্রগতি বিশ্বের সর্বত্র সমান ভাবে হয়নি—যার জন্য এখনো আদিম সমাজ ব্যবস্থার কিছু কিছু রূপ আফ্রিকায় বা আমাদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কিছু কিছু উপজাতি মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এটা আজ আর নূতন কিছু কথা নয়। কিন্তু যেটা আমরা সব সময় খেয়াল করিনা সেটা হ'ল এই যে, সামগ্রিক উত্তরণ মানেই এটা নয় যে বিগত যুগের (পরাভূত যুগের) **সমস্ত কিছুর-ই** উত্তরণ। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও উত্তরণ মানে **সর্বক্ষেত্রে** সমানভাবে উত্তরণ নয়। এমনও সম্ভব যে একটা বিশেষ অবস্থায় পরাভূত যুগে একটা বিশেষ ক্ষণে কয়েকটি 'ভালো' জিনিষ গড়ে উঠেছিল, সামগ্রিক ভাবে যুগটি মানুষের অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর হওয়া সত্বেও—এবং সামগ্রিক উত্তরণ ঘটাতে গিয়ে সেই 'ভালো' জিনিষগুলিকে হারাতে হয়েছে।

যেমন মধ্যযুগে পলাতক দাসরা ছোট ছোট 'শহরে' এক ধরণের গিল্ড সিস্টেম পত্তন করে ও সেখানে যে সব কামার, কুমোর, তাঁতী ও ছোট কারিগর শিল্পী ছিল—এরা একধরণের সন্তুষ্টি ভোগ করত। এবং যেহেতু তারা ছিল গিল্ড-এর মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ ও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে শ্রম বিভাজন (division of labour between the individual guilds) তখনও তেমন দানা বাঁধেনি, তাই কারিগরদের মধ্যেও শ্রম বিভাজন ঘটেনি। ফলে প্রত্যেক কারিগর বা শ্রমিককে (worker) তার হেতার পত্র (tools) দিয়ে যা করা সম্ভব সবই করতে হ'ত···তাই যে-মানুষ চাইত তার কাজে সে হবে একজন দক্ষ ব্যক্তি তাকে তার বিদ্যায় হতে হত সববিষয়ে পারদর্শী। মধ্যযুগের কারিগরদের মধ্যে তাই দেখা গেছে তাদের কাজ সম্পর্কে এক বিপুল আগ্রহ এবং তাতে পারদর্শিতা অর্জনের তাগিদে তারা সীমাবদ্ধভাবে হলেও এক শৈল্পিক চেতনায় উত্তীর্ণ হতে পারত···সেই তুলনায় আধুনিক যুগের (বুর্জোয়া যুগের) একজন শ্রমিকের কাছে তার 'কাজ' এক বিরক্তিকর উদাসীন ব্যাপার (এমনকি অনেক সময় বিতৃষ্ণার)।' কথাগুলি স্বয়ং এঙ্গেলস ও কার্ল মার্কসের।(১) এর ফলে সে যুগে এই বিশেষ অবস্থায় একজন শিল্পী বা কারিগর তার শ্রমের যে ফল তার সঙ্গে এক বিশেষ সামঞ্জস্য (Harmony) সূত্রে বিধৃত থাকত, তাই তার চরিত্রের সুপ্ত শক্তিগুলি কিছুটা পূর্ণতা পেতে পারত, ধনতান্ত্রিক যুগে অত্যধিক শ্রম বিভাজনের ফলে কর্মের সঙ্গে কর্মীর সেই সামঞ্জস্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ায়—আজ আর সেই চারিত্রিক পূর্ণতা বা অখণ্ডতা, সহজ লভ্য নয়।

এই উত্তরণ পর্বের নিপুণ বিশ্লেষণগুলিতে মার্কস এবং এঙ্গেলসই শুধু নন, সে সময়ের মহৎ মানবতাবাদী শিল্পীরা যেমন শীলার, মহাকবি গোটে এবং

বালজাক নব্যবুর্জোয়া যুগের প্রারম্ভ কালেই মানুষের ব্যক্তিত্বের এই অবক্ষয় বা ভাঙনকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে গেছেন।

এ বিষয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হচ্ছে গ্যেটের "উইলহেল্‌ম মেইস্টারের শিক্ষানবীশী" (Wilhelm Meister's Apprenticchip) নামক অসামান্য উপন্যাসটি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, ইণ্ডাস্ট্রির বিস্তার, আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার, ভারত ও চীনের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ বেড়ে যাওয়া—এই সমস্ত কিছু নিয়ে পৃথিবী ক্রমশঃ যত ঘনিষ্ঠ হতে থেকেছে এবং মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা, সাংস্কৃতিক ক্ষুধা যত বেড়েছে, জানার আগ্রহ ও নিজেকে বিস্তারিত করার সুপ্ত আগ্রহ তীব্রতর হয়েছে, ততই দেখা গেছে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে এবং যে পলাতক দাসরা একদিন গ্রামের সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য তৎকালীন ছোট্ট ছোট্ট শহরে এসে গিল্ড স্থাপন করেছে, তারাই ধীরে ধীরে নব্যবুর্জোয়ার প্রাথমিক রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ চালিয়েছে। এটা নব্যবুর্জোয়াদের তৎকালীন প্রগতিশীল ভূমিকামাত্র নয়, বৈপ্লবিক ভূমিকা। কিন্তু এর ফলে যেমন সামগ্রিক উত্তরণ সম্ভব হয়েছে, তেমনি এমনকি সেই মধ্যযুগেও শ্রম বিভাজন (divison of labour) না থাকায় উপরিউক্ত শিল্পী কারিগর যে তাদের কর্মের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছিল, ও মানবিক পূর্ণতার স্বাদ কিছুটা পেয়েছিল—সেটি নূতন উত্তরিত বুর্জোয়া যুগে ক্রমশঃ শ্রম বিভাজন তীব্রতর হওয়ায় অপসৃত হয়েছে। মানুষ ক্রমশঃ 'যন্ত্রের একটা অংশে পরিণত হয়েছে' (মার্কস, 'লুডিক ফয়েরবাখ' আলোচনা) অর্থাৎ যা একটা অনুন্নত পর্বের একটা বিশেষ অবস্থায় ছিল কিছুটা মানবিক, **সামগ্রিক উত্তরণ সত্ত্বেও** শ্রম বিভাজন তাকে করে তুলেছে ক্রমশঃ 'যান্ত্রিক'। এবং কর্মের এই বিভক্তিকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ, ক্রমশঃ নব্যবুর্জোয়ার চিন্তাধারাতেও এনেছে একই বিভক্তিকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ। সেই জন্যে গ্যেটে তার মানসপুত্র ইউলহেল্‌ম্ মেইস্টারের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "আরো লৌহ উৎপাদন করে হবে কি, যদি আমার অন্তরটাও গলানো লোহায় ভরে যায়?" চিন্তার এই বিভক্তিকরণ বা যান্ত্রিকতার আর একটা রূপ হচ্ছে সূক্ষ্মতার বা সৌজন্যের সব আবরুকে সরিয়ে ফেলে শোষণ ও শাসনের আসল উৎসটির নগ্ন রূপটিকে চিনতে পারার পর—(যার নাম অর্থ বা সম্পদ বা সোনা) মনের ও চিন্তার সবটুকু সেখানেই সমর্পণ করে ফেলা—এবং বিশ্বের সবকিছুকে টাকার মূল্যে বিচার করার প্রবণতা। অবশ্য তাই বলে কোন সামন্ত প্রভুর এটা মনে করে আত্মসন্তুষ্টি ভোগ করার সুযোগ নেই যে তারা এই অর্থশক্তির দাপটেই রাজত্ব করেনি, কিন্তু তবু তখন একে ঘিরে অনেক আবরু ছিল, যেমন ধর্মের আবরু একধরণের সংস্কৃতির আবরু, ঐতিহ্য বা সংস্কারের আবরু --কিন্তু বুর্জোয়ারা এগুলিকে সব আবরুহীন করে ফেলল, নগ্ন সত্যটাকে নগ্নতর করে ফেলল, এবং তার প্রয়োগ হল আবরুহীন ভাবে। গ্যেটের মেইস্টার বলছে "বুর্জোয়ারা চেষ্টা করলে অনেক কিছু শিখতে পারবে, জ্ঞান অর্জন করবে, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হয়ে যাবে তার কাছে মানুষ সম্পর্কে প্রশ্নটা হবে না 'তুমি কি?' হবে—'তোমার কি আছে।' অর্থাৎ গ্যেটের মতে—এর পর মানুষের পরিচয় হবে তার কি আছে—কত সম্পদ, টাকা, সম্পত্তি—এই দিয়ে। প্রশ্ন এটা কি প্রাক-বুর্জোয়া যুগে ছিল না? ছিল এবং গ্যেটের মেইস্টারই তার উল্লেখ করেছে, কিন্তু এরকম আবরুহীন নির্লজ্জ রূপ নিয়ে নয়। কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোতে মার্কস এবং এঙ্গেলস এই নব্যবুর্জোয়া শ্রেণী সম্পর্কে লিখছেন, "It has pitilessly torn asunder the motely feudal ties that bound man to his 'natural surperiors' and has left remaining no other nexus between man and man than naked self interest than callous". "Cash payment". It has drowned the most heavenly ecstasis of religious fervour, of chivalrous enthusiasm, of Philistine sentimentalism in the icy water of egotistica calculation. It has resolved personal worth into exchange valne, and in place of numberless indefeasible chartered freedoms, has set up that single un-conscionable freedom —Free Trade. **In other word, for explortation, valued by relegious allusions, it has substituted naked, shameless, direct, brutal exploitations".(২)**

এতদসত্ত্বেও এই উপরিউক্ত প্যারাগ্রাফের ওপরই মার্কস-এঙ্গেলস লিখছেন, "The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionary part." এই ঐতিহাসিক বোধশক্তি বা সচেতনতা তৎকালীন অনেক মহৎ শিল্পীদের মধ্যেও ছিল না। শ্রম বিভাজনের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর চিন্তার মধ্যে যে সংকীর্ণতা এসেছিল, আবরুময় শোষণকে বে-আবরুভাবে ব্যবহারের যে রুক্ষতা—সেটাই সেই সব মহৎ মানবতাবাদীকে বেশি আহত করেছে এবং অনেক সময় অসচেতন বা সচেতনভাবে এর বিপক্ষে 'অভিজাত শ্রেণী'র গুণগান করে বসেছেন। গ্যেটের 'মেইস্টার' উপন্যাসেও এর লক্ষণ আছে, যেজন্য সেসময়ের কিছু পরে যুগ-সচেতন কিছু সমালোচক উক্ত উপন্যাসের ক্যাসেলের দৃশ্য পর্য্যায়ের ঘটনার আলোচনায় গ্যেটে কর্তৃক অভিজাতদের গৌরবান্বিত করাকে গ্যেটের 'যুগ চেতনার অভাব' বা 'বেহিসেবীপনা' বলে উল্লেখ করে গেছেন।(৩) কিন্তু আজকে এত কাল পরে পুনশ্চ ইউলহেল্‌ম্ মেইস্টারের শিক্ষানবীশী' পড়লে বোঝা যায় গ্যেটের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যদিও ছিল, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তিনি নব্যবুর্জোয়া যুগের অগ্রাগমনকে একেবারে চিনতে পারেননি, এটা ঠিক নয়। উক্ত উপন্যাসেই শেষের দিকে 'অভিজাত'দের গৌরবদানকে তিনি প্রায় ধূলিসাৎ করেছেন যখন দেখা যায় একটির পর একটি পারম্পরিক

কন্যাদানের মাধ্যমে বিবাহসূত্রে গজদন্ত মিনারবাসী অভিজাতরা একে একে নূতন যুগের প্রতিভূ বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্যেটের যেখানে মহৎ মানবিক প্রতিবাদ ছিল বুর্জোয়াদের টাকার মূল্যে সব কিছুকে দেখার বিরুদ্ধে, এবং অতিরিক্ত শ্রমবিভাজনের ফলে তাদের খণ্ডিত মানবসত্তার বিরুদ্ধে—সে প্রতিবাদ সেখানে আজো মহত্তর ভূমিকায় উজ্জ্বল, একই সঙ্গে নূতন যুগের অপ্রতিরোধ্য গতিকে তিনি অস্বীকার করেন নি। এবং কোনমতেই তিনি অপসৃত পরাভূত যুগ সম্পর্কে কোন মোহ বিস্তার করেন নি। তাই সেই যুগকে বোঝার ব্যাপারে গ্যেটের 'মেইস্টার'কে যুগান্তকারী গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করেছেন অনেক শ্রদ্ধেয় আলোচক তার মধ্যে জর্জ লুকপাচ অন্যতম।

গ্যেটের কথা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, গ্যেটেকে বলা হয়ে থাকে অখণ্ড মানবসত্তা বা 'হার্মোনিয়াস ম্যান' এর মহান প্রবক্তা। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে দেখলে ক্রমশঃ শ্রমবিভাজনের ফলে বুর্জোয়াদের মানবসত্তা যে ক্রমশঃ সংকীর্ণতর ও খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে এটা গ্যেটে কখনোই সমর্থন করতে পারেন না। স্বয়ং এঙ্গেলসও তা পারেন নি তাই রে'নেসার সময়কার বিশাল মানুষগুলি—দান্তে, দ্যভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো– এঁদের কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধাবনত এঙ্গেলস যেমন একদিকে জানিয়েছেন এঁরাও ছিলেন বুর্জোয়া যুগের প্রতিভূ, মধ্যযুগীয় সমস্ত মূল্যবোধ থেকে ছাড়া পাওয়া নূতন যুগের মানুষ, এবং এক একটা 'কলোশাস'—কিন্তু "কোন মতেই এঁরা সংকীর্ণ বুর্জোয়া ছিলেন না।" এঙ্গেলস লিখেছেন যে ক্রমশঃ শ্রম বিভাগের ফলে এঁদেরই উত্তর পুরুষ যেমন "একপেশে সংকীর্ণ ও খণ্ডিত মনের হয়ে পড়েছিল—এই রে'নেসার স্রষ্টারা ছিলেন তার থেকে মুক্ত।"[৪]

সুতরাং নব্য বুর্জোয়াদের এই যে (ক) টাকার মূল্যে সবকিছুকে বিচার করার প্রবণতা এবং (খ) মানব সত্তার বিভাজন (শ্রম বিভাজনের ফল)—এই দুটি ত্রুটি অবশ্যই অনেককে বিচলিত করেছে এবং এদের মধ্যে যাঁরা বুর্জোয়া শ্রেণীর তৎকালীন বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি, তাঁরা 'অভিজাতদের' পক্ষে চলে গেছেন। গ্যেটের মধ্যেও এর চিহ্ন কিছু আছে, সম্ভবতঃ তাঁর অতলস্পর্শ প্রতিভা তাঁকে শেষ সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু এ প্রবণতা এখনো চলছে, একালেও, এবং তারই একটি উদাহরণ 'জলসাঘর' কিনা সেটা আমাদের বিচার্য।

এই প্রবণতার ভুলটা কোথায়? ভুলটা হচ্ছে নব্য বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ তার চরিত্রকে না উপলব্ধি করা। আমরা জানি নব্য বুর্জোয়ারা 'ধোয়া তুলসী পাতা' হয়ে আসে নি, কিন্তু এটাও জানি এরা যে 'পাপ' কে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সেটা মধ্যযুগের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেও অন্য ও আবরুময় চেহারায় যে ছিল না তা নয়, এবং এটাও জানি আবরুময় শোষণকে যে আবরু করে তোলার জন্য শোষণের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে পরবর্তী কালে মানুষ বুঝতে পারায় অনেক সুবিধেও হয়েছে, পরবর্তীকালে শ্রমিক শ্রেণী বুঝতে পেরেছে মারটা তার ওপর কোথায়, কী ভাবে ঘটানো হচ্ছে। নব্য বুর্জোয়াদের **ভালমন্দ** দুটো দিকই সবচেয়ে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস এবং সম্ভবতঃ কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোই তার সবচেয়ে বড় দলিল। সেখানে খুব পরিষ্কারভাবে ('বুর্জোয়া ও শ্রমজীবী' অধ্যায়ে) দেখান হয়েছে, কীভাবে বিগতকালের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই বুর্জোয়ারা ইতিহাসের মঞ্চে এল, দেখান হয়েছে কীভাবে সমস্ত অভিজাতদের দ্বারা নিপীড়িত একটি শ্রেণী অগ্রগামী হয়ে মধ্যযুগীয় 'কম্যুন' এর মত স্বশাসিত সংস্থা সৃষ্টি করেছিল, কিভাবে তৎকালীন উৎপাদন পদ্ধতির পশ্চাদপদতা ঘুচিয়ে ছিল...এবং আধুনিক শিখা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দেখান হয়েছে, যে নগ্ন সত্যটা আবরুর আড়ালে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পশ্চাদপটে একদিন লুকানো ছিল—তাকে বুর্জোয়ারা নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়েছে—এতে যেমন কিছু কিছু মানবিক মূল্যবোধের ক্ষয় হয়েছে তেমনি শোষণের নগ্নরূপকে জানতে পারায় নিপীড়িত মানুষের ভবিষ্যত বংশধররা, আজকের শ্রমজীবী শ্রেণী হয়েছে উপকৃত। যে সব জীবিকা, যেমন পুরোহিতগিরি, ডাক্তারি, কবি ও শিল্পীর জীবিকা, বৈজ্ঞানিকের জীবিকা—যার উপর এতকাল গৌরবচ্ছটা ছড়ান হ'ত—তাদের পরিচয়কে দাঁড় করিয়েছে বেতনভুক শ্রমজীবী (বুদ্ধিজীবী) হিসেবে—যেটা তাদের আসল রূপ। মধ্য যুগের সামন্তযুগীয় উদ্গাতারা যে 'বীরত্বে'র জয়গান গায়, তার পাশবিকতাকে উদ্ঘাটিত করেছে নব্য বুর্জোয়া শ্রেণী। **এই শ্রেণীই বিশ্বে প্রথম প্রমাণিত করেছে মানুষের কাজের কী অসীম ক্ষমতা মানুষ কী না করতে পারে।** বুর্জোয়ারাই প্রথম আধুনিক শহরের সৃষ্টি করেছে। সপ্তডিঙা নিয়ে এরাই মহাসমুদ্র পার হয়ে নবনব দেশ আবিষ্কার করেছে। নব্য বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রকৃতিই ছিল অবিরাম উৎপাদন পদ্ধতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান, নূতনতর আবিষ্কার, অনবরত একটা চাঞ্চল্যের মধ্যে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা—যা আর আগে কোন যুগে ঘটেনি। বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়ারা পঞ্চাশ বছরে যা করেছে; বিগত সহস্র বছরের সামগ্রিক পরিবর্তন তার কাছে শিশু মাত্র, বুর্জোয়াদের কীর্তি পুরাকালের সব পীরামিডিয় কীর্তিকে করে দিয়েছে ম্লান। বুর্জোয়ারাই প্রথম মানুষকে বুঝিয়েছিল নগ্ন সত্যটা কী, জীবনের বাস্তব অবস্থাটা কী এবং তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই বা কী। তারাই অভিজাতদের দ্বারা প্রচারিত ধর্মীয় বাণীতে অভিসিক্ত এই মিথ্যা তত্ত্বকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছিল যে তত্ত্ব বলত মানুষের সত্য বংশপরম্পরাগত।

সুতরাং সামন্ত যুগের উত্তরণ পর্বে নব্যবুর্জোয়াদের বৈপ্লবিক ভূমিকা খাটো করে দেখার অর্থ সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া। এরই সঙ্গে মানবসম্পর্ককে টাকার সম্পর্কে নামিয়ে আনার প্রবণতার জন্য বুর্জোয়াচরিত্রের প্রতি গ্যেটের ধিক্কারও ভুলে থাকা উচিত নয়।

সাহিত্যে শিল্পে চলচ্চিত্রে চিত্রিত এই উত্তরণপর্বের নব্যবুর্জোয়াচরিত্র-

গুলিকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে গেলে আমাদের তাই দুধরণের বিভ্রান্তি থেকেই দূরে থাকতে হবে। প্রথম বিভ্রান্তি হচ্ছে, নব্যবুর্জোয়ার সামগ্রিক ভূমিকা বৈপ্লবিক বলে, তার চরিত্রে শ্রমবিভাজনজনিত যে খণ্ডীকরণ ও তজ্জনিত একধরণের বর্বরতা এসেছিল এবং সব সম্পর্ককে আর্থিক সম্পর্কতে পরিণত করার কুৎসিত যে প্রবণতা তার ছিল—তার এই ত্রুটিকে এড়িয়ে যাওয়া। এই ভুলটি কোন কোন মার্কসবাদী কখনো কখনো করে থাকেন। (যেমন সাত বছর আগের 'জলসাঘর' আলোচনায় এই রকম ভুল আমি করেছিলাম: **কিন্তু দ্বিতীয় ভ্রান্তিটি আরো মারাত্মক**—সেটি হচ্ছে, বুর্জোয়া চরিত্রের উপরিউক্ত ত্রুটি দেখে নব্যবুর্জোয়াশ্রেণীর সামগ্রিক এবং বিরাট বৈপ্লবিক ভূমিকাকে অস্বীকার করে বিগতকালের অভিজাতদের গৌরবান্বিত করা, তাদের মধ্যে 'এই পবিত্র যুগের অবসান' দেখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা এবং তাকে নিয়ে রোমান্টিক হয়ে পড়া বা বিগত আরো ক্ষতিকারক যুগের কিছু কিছু 'ভালো' বা তথাকথিত ভালোর জন্য নস্টালজিয়া উদ্রেক করান—অথবা যারা এই ভাবে 'অভিজাত'দের সঙ্গে একাত্মতার দরুনই যে নব্যবুর্জোয়াদের 'টাকাসর্বস্ব' মানসিকতাকে আক্রমণ করেছে, গোটের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য বা অখণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবত্বের তাগিদে যে নয়—তাদের এই উদ্দেশ্য না বুঝে **নব্যবুর্জোয়ার 'কদর্য' দিকটিকে আক্রমণ মাত্রই প্রগতিশীল কাজ** বলে চিহ্নিত করা। এই ভুলটিও অনেকে করে থাকেন, এঁদের উদ্দেশ্যে মার্কস এঙ্গেলসের সেই শ্লেষবাক্যগুলি স্মরণীয় যা তাঁরা লিখেছিলেন 'ফিউডাল সোস্যালিজম'-এর বিরুদ্ধে। যে অদ্ভুত 'সমাজতন্ত্র'-এর নাম নিয়ে একদা পরাভূত 'অভিজাত'রা বুর্জোয়া চরিত্রের দোষগুলিকেই শুধু দেখিয়ে ও নিজেদের শোষণ যে কত 'নিরীহ' ছিল তা বলে বেড়িয়ে তাদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাত।

ওপরের আলোচনা থেকে এটাই আশা করা যায় যে সেই উত্তরণ পর্বের মহৎ সাহিত্যিকরা সেকালের নব্যবুর্জোয়ার চরিত্রায়নে উপরিউক্ত দু ধরণের বিভ্রান্তিকে পরিহার করবেন। এবং সত্যই বেশির ভাগ তাই করেছেন। গোটের অর্ধশত বৎসর পরে সেই নূতন বুর্জোয়া যুগ থেকে তিনি যেকোন ঐতিহাসিকের চেয়েও ভাস্বর করে রেখে গেছেন, সেই অমর বালজাক একই অভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিলেন, সচেতনভাবে তাঁর শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও। বালজাকের বিভিন্ন উপন্যাসে অভিজাতদের সামনাসামনি নব্যবুর্জোয়া চরিত্রকে খাড়া করা হয়েছে, এবং কে না জানেন বালজাকের শ্রেণীগত সহানুভূতি ছিল এই অভিজাতদের প্রতিই, তবুও অভিজাতদের পতনের বর্ণনায় বালজাকের কলম হয়েছিল নির্মম শুধু তাই নয়, এঙ্গেলসের ভাষায়, "তিনি এই পতনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন, এবং সেই ভাবেই এদের বর্ণনা করেছেন যাতে বোঝা যায় অভিজাতরা **এই পতনেরই যোগ্য** (**deserving no better fate**)।" এঙ্গেলস এরপরে লিখছেন, বালজাক চোখের সামনে দেখেছিলেন তাদের যারা ভবিষ্যতের সত্যিকার মানুষ। এটাই হচ্ছে রীয়ালিজমের জয়, এবং এটাই হচ্ছে বালজাকের সবচেয়ে গরিমাময় দিক।"(৫) একেই একটি ভিন্ন পত্রে এঙ্গেলস লিখেছিন, "What boldness! What a **revolutionary dialecties in his poetic justice**।"(৬) এখানে **poetic justice**-র ডায়ালেকটিস্ কথাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যার ভিত্তিতে আমরা 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায় ও মহিম চরিত্র আলোচনা করব।

গোটে এবং বালজাকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার, তাঁরা নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থানে যাই থাকুননা কেন, তাঁদের সাহিত্যের দর্পণে অভিজাত এবং নব্যবুর্জোয়ারা যখনই মুখোমুখি হয়েছে, নব্যবুর্জোয়া চরিত্রের কদর্যতা অর্থগৃধ্নুতা ও টাকার মূল্যে সব কিছুকে দেখার প্রবণতাকে তাঁরা যেমন প্রচণ্ড তিরস্কার করেছেন—কিন্তু তা করতে গিয়ে কখনোই অভিজাতদের পক্ষে ঢলে পড়েন নি। গোটের ইউল্হেলম্ মেইস্টার অভিজাত সম্পর্কে একজায়গায় বলছে, "যেহেতু একজন অভিজাত উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদরাশি পেয়েছে সম্পূর্ণ আরামের জীবন সম্পর্কে সেতো নিশ্চিন্ত...তাই সাধারণতঃ এই সব সম্পদকেই জীবনের প্রাথমিক ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু ভাবতেও সে অভ্যস্ত, স্বভাবতঃই প্রকৃতিপ্রদত্ত মানবতার মূল্যকে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পারবেনা। অধঃস্তনদের প্রতি, এমনকি অন্য একজন অভিজাতের প্রতিও একজন অভিজাতের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদাই বাহ্যিক আড়ম্বর দ্বারা প্রভাবিত, অভিজাতরা তাদের খেতাব, পদমর্যাদা, তার রূপ, বহিরাবরণ জাঁকজমক ইত্যাদিকে ব্যবহার করে, কিন্তু কদাপি নিজেদের আসল স্বরূপটির নয় ('not his own worth')।" এথেকেই স্পষ্ট, বুর্জোয়া চরিত্রের যেটা সবচেয়ে বড় কদর্যতা, মার্কসের ভাষায়—"no other nexus between man and man than...callous cash payment" (মূলতঃ এই cash nexus কথাটি তরুণ মার্কস পেয়েছিলেন কার্লাইলের লেখা থেকে)—সেটা এত নগ্ন আকারে না হলেও মূলতঃ অভিজাত চরিত্রেও ছিল, এবং গোটেকে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত করার অপচেষ্টা হলেও, গোটেকে বোকা বানানো সম্ভব হয়নি, তিনি সত্যটা ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন।

এমনকি সেক্সপীয়ার, যার সময়ে ইংল্যাণ্ডের শ্রেণীদ্বন্দ্বের চেহারাটা গোটের জার্মানী বা বালজাকের ফ্রান্সের মত ছিলনা, অর্থাৎ অন্ততঃ অনেকের মতে সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে নব্যবুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমজীবী শ্রেণীর নেতৃত্ব দেয়নি, বরং বুর্জোয়া শ্রেণী অভিজাতদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল—এককথায় ফ্রান্স বা জার্মানীর মত সেক্সপীয়ারের সময়কালের ইংরেজ বুর্জোয়ারা 'বৈপ্লবিক' ভূমিকা নেয়নি—এবং তাই সেক্সপীয়ার যেখানে যেমন পেরেছেন নব্য বুর্জোয়াদের 'cash-nexus' কে আক্রমণ করেছেন, যার সবচেয়ে প্রকট মূর্তি শাইলক—এবং হ্যামলেটকে নব্য বুর্জোয়াদের সংগুণের প্রতীক ধরা হয়েছে ও তাকে সমর্থন করা হয়েছে বলে যে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করে

থাকেন—সে কথা না ভুলেও বলা চলে—সেক্সপীয়ার নব্য বুর্জোয়াদের সমর্থন না করুন, কিন্তু তা বলে অভিজাতদের বিপক্ষে নব্য বুর্জোয়াদের উপস্থাপিত করে অভিজাতদের গৌরবগান গেয়ে গৌরবান্বিত করেন নি। উৎপল দত্ত তাঁর অতি মূল্যবান "সেক্সপীয়ারের সমাজ চেতনা" গ্রন্থে লিখছেন "পচা ফিউডাল সমাজকেও গ্রহণ করা তাঁর (সেক্সপীয়ারের) পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল। 'টিমন' বা 'ওথেলো' যেমন বুর্জোয়া মতবাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ, 'কোরিওলানুস' এবং 'চতুর্থ হেনরি' ফিউডাল মূল্য বোধের ওপর তেমনি তীব্র আক্রমণ।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬৪)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নানান চারিত্রিক বিকৃতির জন্য নব্য বুর্জোয়াদের সমালোচনা করা এক জিনিস, কিন্তু সেই সমালোচনাকে ব্যবহার করে অভিজাতদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করান আর এক জিনিস। প্রথমটি গ্যেটে, শীলার, বালজাক এবং সেক্সপীয়ার সবাই কম বেশি করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি কদাপি নয়। সেক্সপীয়ারের প্রশ্নটি জটিলতর হওয়ায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলার অবকাশ এখানে নেই বলে তাঁকে বাদ দিলে, গ্যেটে, শীলার এবং বালজাক সম্পর্কে বলা চলে তাঁরা তদুপরি নব্য বুর্জোয়াদের সামগ্রিক বৈপ্লবিক ভূমিকাকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে কিন্তু অভ্রান্তভাবে স্বীকার করেছেন।

এখানে আর একটি জটিল প্রশ্ন আসে। নব্য বুর্জোয়ারা কি সচেতন-ভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে তাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল? যদি তা না করে থাকে, তাহলে তার জন্য তারা কি প্রশংসা দাবী করতে পারে? তাদের সবকিছুকে টাকার মূল্যে দেখার প্রবণতা, অর্থগৃধ্নুতা কিন্তু প্রত্যক্ষ বা সচেতন প্রক্রিয়া এবং সেজন্য তারা আক্রমণের যোগ্য। তাহলে কি এটাই ঠিক যে, যেহেতু তাদের, বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন ছিল অপ্রত্যক্ষ অসচেতন প্রক্রিয়া তাই তার জন্য প্রশংসা তাদের প্রাপ্য নয়, কিন্তু তাদের 'cash-nexus' বা অর্থগৃধ্নুতা ইত্যাদি ছিল প্রত্যক্ষ ও সচেতন কাজ—তাই তারা নিন্দাযোগ্য—এবং "তাই সামগ্রিকভাবে তারা নিন্দারই যোগ্য?" ব্যাপারটা যদিও জটিল, কিন্তু যেভাবে উপরোক্তভাবে কেউ কেউ এই জটিলতাকে সহজ করতে চান, সেটাও অত্যধিক ও যান্ত্রিক সরলীকরণ। আমার বিনীত ধারণা, একমাত্র দ্বান্দ্বিকভাবেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব। এই পদ্ধতি 'ইউলহেলম মেইস্টার' উপন্যাসে গ্যেটে নিয়েছেন বা বালজাক তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই কম বেশি নিয়েছেন ('Dialecties of Poetic Justice'—Engles)। অর্থাৎ তাদের ভালো দিকটির সঙ্গে খারাপ দিকটিও দেখাতে হবে, এবং খারাপের সঙ্গে ভালো দিকটি—এবং সামগ্রিক ভাবে তাদের দ্বান্দ্বিক রূপটি অন্য কোন সমাধানের নিদর্শন করছে কিনা। তা না করলে আমরা আর এক ধরণের ভ্রান্তির শিকার হব—যা পূর্বোক্ত দুটি ভ্রান্তিকে ধরে তৃতীয় ভ্রান্তি।

এই তিন রকম ভ্রান্তি থেকে দূরে সরে এসে বিচার করা যাক 'জলসাঘর' ছবির মহিম চরিত্র।

(২)

'জলসাঘর' ছবির মহিম চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সামগ্রিক ছবির আলোচনাতে যত স্পষ্ট হওয়া সম্ভব—অন্যভাবে তত নয়। কিন্তু এখানে সে অবকাশ নেই। এখানে মহিম চরিত্র প্রসঙ্গে ছবিটি সম্পর্কে বা অন্য চরিত্র সম্পর্কে যেটুকু না বললে নয়, সেটুকুই বলা হচ্ছে।

প্রথম প্রশ্ন—ছবিতে মহিম একজন নিছক নব্যবুর্জোয়া চরিত্র অথবা নব্যবুর্জোয়া চরিত্রের প্রতিনিধিত্বগুণ যার মধ্যে থাকবে এমন একটি নব্য-বুর্জোয়া চরিত্র? এর উত্তর, ছবিটি যেহেতু এক যুগ সন্ধিক্ষণকে নিয়ে এবং যেহেতু গৌরব সায়াহ্নের আলোয় রঞ্জিত একজন 'অভিজাত' এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র যার বিপক্ষে মহিম উপস্থাপিত, তখন মহিম নিছক মহিম নয়, তার মধ্যে নব্যবুর্জোয়ার শ্রেণী বিশেষত্ব বা টিপিক্যালিটি থাকা অবশ্যই উচিত। এ বিষয়ে যার দৃষ্টিভঙ্গী খুব স্বচ্ছ বলে প্রচারিত এবং এমনকি বুর্জোয়া এরিক রোড-ও যার এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন তার The History of Cinema' গ্রন্থে—সেই মার্কসবাদী পণ্ডিত জর্জ লুকাচ তাঁর The Historical Novel গ্রন্থে যুগসন্ধিক্ষণের ওপর লেখায় বা ঐতিহাসিক উপন্যাসে (এবং একই কথা চলচ্চিত্রে) এই ধরণের চরিত্রের চরিত্রায়ণে যে তিনটি স্তর বা মাত্রা থাকা দরকার বলে দেখিয়েছেন—তা হচ্ছে (১) চরিত্রটির ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরূপ বা ব্যক্তিরূপের স্তর, (২) চরিত্র যে সামষ্টিক মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অসচেতন বা সচেতন ভাবে তুলে ধরছে—সেই সামষ্টিক বা শ্রেণীরূপের স্তর এবং (৩) চরিত্রটির ব্যক্তিরূপ বা শ্রেণীরূপের (মূলতঃ শ্রেণীরূপের) মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক শক্তি রূপ নিচ্ছে—চরিত্রটির সেই ঐতিহাসিক স্তর—(historial dimension). লুকাচের বক্তব্য আক্ষরিক ভাবে না তুলে, তাঁর বক্তব্য মূলতঃ যা তাই বলা হল। লুকাচেরই হোক, বা যারই হোক—ঐতিহাসিক স্তর বিশিষ্ট যে কোন উপন্যাস, মহাকাব্য, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে যেসব প্রধান চরিত্র থাকে তাদের অমরত্ব যে নিহিত থাকে চরিত্রগুলির মধ্যে এই ত্রিরূপের মিলনের জন্য তার প্রমাণ টলস্টয়, বালজাক, গর্কী, চেখভের অমর চরিত্রগুলি—এবং এটা ঘটনা।

সুতরাং 'জলসাঘর' ছবিতে মহিম একদিকে (১) ব্যক্তিমানুষ, (১) অন্যদিকে তার মধ্যে তার শ্রেণী চরিত্রের লক্ষণ থাকা উচিত, (৩) তৃতীয়তঃ তার চরিত্রের একটি শৈল্পিক ঐতিহাসিক মাত্রা বা ডাইমেনশন থাকা উচিত। এবং এগুলি থাকা উচিত এক দ্বান্দ্বিক বিধি নিয়মে, যান্ত্রিক ভাবে নয়।

ব্যক্তি মানুষ হিসাবে মহিমের চরিত্রায়ণ, আমার মতে, নিখুঁত। গঙ্গাপদ বসুকে দিয়ে, তাঁর চেহারা, ভাব ভঙ্গী, বচন, চলন সব কিছু দিয়ে এমন একটি চরিত্রের 'ইমেজ' সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর প্রথম পর্বের প্রতিভার গভীর স্বাক্ষরবাহী। যাঁরা ব্যক্তিমানুষের স্তর ছাড়িয়ে মহিমকে অন্যভাবে দেখতে চাইবেন না তাঁদের স্মৃতির চরিত্র

চিত্রশালায় মহিম স্থান পাবার যোগ্য। কিন্তু এটা হচ্ছে খণ্ডিত দৃষ্ট, এদের স্মৃতির চিত্রশালায় ধূলি ধূসরিত. ব্যক্তি মহিম ক্রমেই বিস্মৃত হয়—এটাও স্মর্তব্য। তার কারণ এই ধরণের যুগ সন্ধিক্ষণের ওপর রচিত শিল্পে বিশুদ্ধ ব্যক্তি চরিত্রের ধারণাটাই মূলতঃ ভ্রান্ত।

অতএব মহিমের চরিত্রায়ণের দ্বিতীয় স্তর, তার শ্রেণী চরিত্রের বা টাইপ চরিত্রের প্রসঙ্গ অবশ্যই ধর্তব্য। এখানে তার মত নব্যবুর্জোয়া চরিত্রে সদাত্মক ও নঙাত্মক দিক মিলে মিশে আছে। বিনা দ্বিধায় বলা চলে মহিমের মত নব্যবুর্জোয়া চরিত্রের নঙাত্মক দিক, তার কল্প খণ্ডিত আত্মসত্তা, তার টাকার গরম,—এসব সত্যজিৎ তুলে ধরেছেন এবং যখনই সুযোগ পেয়েছেন এসব নিয়ে শুধু ব্যঙ্গ করেছেন তা নয়, তাকে হাস্যকর চরিত্র হিসেবে, প্রায় ভাঁড় সদৃশ চরিত্র হিসেবে, উত্থাপিত করেছেন। বোঝা যায়, মহিমকে আক্রমণ করার ব্যাপারে সত্যজিৎ রায় যেন রীতিমত স্ফূর্তি অনুভব করেছেন। এটি করা ঠিক হয়েছে কিনা সেটি বিচার্য। **আপাতঃ ভাবে অবশ্যই** ষোল আনা সঠিক। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে—এই ধরনের সচেতন-অচেতন দোষ-গুণ মেশান চরিত্রকে বিচার করার পদ্ধতি হল—"Dialecties of Poectic Justice". সেই ডায়ালেকটিকস্ তো দূরে থাকুক 'পোয়েটিক জাস্টিস' কি মহিমের প্রতি সত্যজিৎ রায় করেছেন? এখানে একটা প্রশ্ন উঠেছে, মহিমের 'টাকার গরম' ইত্যাদি মহিমের সচেতন দোষ বা প্রত্যক্ষ স্বরূপ আর নব্যবুর্জোয়া শ্রেণী হিসেবে মহিমের ভূমিকা তা নিতান্তই ব্যক্তি নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ অপ্রত্যক্ষ ও অসচেতন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া মাত্র—সুতরাং এই পরোক্ষ বা অসচেতন ভূমিকার সমর্থনের জন্যই মহিমের সচেতন স্বরূপকে অস্বীকার করার কারণ নেই। অস্বীকার কোনটাকেই করা উচিত নয়। কিন্তু প্রশ্ন কতটা গুরুত্ব দেব? সত্যই কি মহিমদের বা নব্যবুর্জোয়াদের ভূমিকা 'নিতান্তই' ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ? এটা ষোলআনা সঠিক নয়, এটাও একটি জটিল ব্যাপারের সরলীকরণ। বালজাক বা চেখভের সাহিত্যে অনুরূপ নব্যবুর্জোয়া চরিত্ররা তার প্রমাণ। বস্তুতঃ গ্যেটের 'মেইস্টার' ও বালজাক সাহিত্যের পর যে অমর শিল্পকর্মটি এই বিষয়ের ওপর একটি দিগনির্দেশক সৃষ্টি বলে সারাবিশ্বে স্বীকৃত সেটি হচ্ছে চেখভের "দ্য চেরী অর্চার্ড"—যার সঙ্গে 'জলসাঘর' ছবির বিষয়বস্তুর, এমনকি কিছু কিছু ঘটনারও এত মিল যে চোখে না পড়ে যায় না। সেখানেও মহিমের তুল্য একটি চরিত্র আছে লোপাখিন, পূর্বতন দাস এখন নব্যপুঁজিপতি—সেখানে কিন্তু তার অর্থমগ্ন খণ্ডিত সত্তা, যেজন্য সে প্রেমকে পর্যন্ত গ্রহণ করতে অসাড়—এসব দেখান হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে যে প্রগতিশীল ঐতিহাসিক শক্তি কাজ করছে, তাকেও সে সচেতনভাবে চিনতে পেরেছে এর চিহ্নও আছে। মহিমের মধ্যে এটা সত্যজিৎ (এবং তারাশংকরও) দেখাননি—এবং **সেটাই একমাত্র সম্ভাব্য ঘটনা** মনে করে তাবৎ নব্যবুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রকে ও তাদের ভূমিকাকে নিতান্তই ব্যক্তি নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ বলে ফরমান জারি করা **বাস্তবিকতা** নয়। তা যদি হয় তাহলে বিশ্ব সাহিত্যের অনেক অমর নব্যবুর্জোয়া চরিত্রকে এক কথায় খারিজ করতে হয়। তাছাড়া এঙ্গেলসের সেই কথাটা ভুলে থাকা অনুচিত যেখানে রেনেশাঁর মহৎ ধারকদেরও তিনি নব্যবুর্জোয়া বলেছেন, "যদিও তারা সংকীর্ণ বুর্জোয়া ছিলেন না" (F. Engles : Dialectics of Nature, Moscow Publication, page 21-22 এবং George Lukaes : "Writer & Critic". Merlin Press, London, page 91) সুতরাং শুধুমাত্র সঙ্কীর্ণ "বুর্জোয়াদেরই নব্যবুর্জোয়া বলে ধরে নেওয়াটা কি অধিক মনগড়া সরলীকরণ নয়? একই সঙ্গে এঙ্গেলসের আর একটি কথাও স্মর্তব্য, তিনি বলেছেন নব্যবুর্জোয়ারা খণ্ডিত সংকীর্ণ সত্তার অধিকারী হয়েছিল "কিছুটা পরবর্তীকালে যখন শ্রম বিভাজন তীব্রতর।" বুর্জোয়াদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে যদি কালানুসারে বিচার করা যায়, দেখা যাবে—উদয়-কালে এরা ছিল '**বৈপ্লবিক**' ক্রমশঃ **বিকৃত**, এবং আজ অন্তিমক্ষণে এরা চূড়ান্ত **প্রতিক্রিয়াশীল**। সুতরাং যখন আমরা নব বুর্জোয়াদের বিচার করব তখন তার "নবত্ব" সম্পর্কে আমাদের খেয়াল রাখা কি উচিত নয়? বস্তুতঃ এই 'নব' বা সেই যুগসন্ধিক্ষণে তাদের 'অপ্রত্যক্ষ' ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে **ততটা** অসচেতন ছিলেন না, **যতটা** মহিম চরিত্রায়ণের জন্য সত্যজিত রায়ের উদার প্রশংসাকারীরা ভাবেন। কয়েকটা সহজ উদাহরণ ধরা যাক—যেমন সামন্ত অভিজাতরা "নীলরক্তের পবিত্রতা" বা মানুষের সত্য বংশ পরম্পরাগত, অথবা তার "বংশপরম্পরাগত অধিকারের নাষ্যতা"—ইত্যাদি যে সব ধারণাকে সমাজে দৃঢ় প্রোথিত করে ছিল, তার বিরুদ্ধে নববুর্জোয়াদের লড়াই, অথচ ছবিতে মহিম এর উল্টো কথাই বলেছে। পেডিগ্রির জয়গান গেয়ে অভিজাতরা যে "শ্রম"কে ঘৃণা করে এবং সেই তুলনায় নিষ্কর্মা বসে কলানুরাগকে অনেক বেশি মূল্য দিয়েছিল, যারা সারাজীবনে এক ঘটি জল নিজে গড়িয়ে খায়নি তারা গৌরব বোধ করত কেননা তারা জলসা বসাত, ঠুংরীর রস উপভোগ করতে জানত। তাদের এই শ্রমবিমুখতাকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলেছিল নব বুর্জোয়ারা সেটা তাদের ছিল সচেতন কাজ। ঠিক এই প্রসঙ্গটি অন্যভাবে স্বয়ং টলস্টয় তুলেছেন তাঁর কিছুটা আত্মজীবনীমূলক অমর "লাইট সাইনস্ ইন দ্য ডার্কনেস্" নাটকে। সাধারণভাবে সামন্তযুগের রুদ্ধতা ও অনড়ত্বকে যে তারা ভেঙে দিয়েছিল, সেটা অনেক সময়ই ছিল তাদের সচেতন কাজ। এছাড়াও আর যেসব সচেতন প্রগতিশীল ভূমিকা তারা নিয়েছিল তার বিবরণ বালজাক সাহিত্যে আছে, এবং চেখভের "দ্য চেরী অর্চার্ড" নাটকেও। এই প্রসঙ্গে পাঠককে বিশেষ করে লোপাখিনের চরিত্রটি স্মরণ করতে বলি। জমিদার বাবুদের বসে বসে খাওয়া এবং মেকী সৌন্দর্যবাদও অবাস্তব রোমান্টিকতাকে লোপাখিন বেশ ভাল রকম ব্যঙ্গ করেছে একটা চেরীর বাগান, শুধু সৌন্দর্যদান ছাড়া যার আর কোন কাজ নেই—তার জায়গায় স্কুল প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, কলকারখানার প্রতিষ্ঠাকে লোপাখিন সচেতনভাবে

শুধু স্বাগত জানায়নি, হাতে নাতে করতে চেয়েছে, এটা তার মুনাফা অর্জনের স্পৃহার সঙ্গে মিশে গেছে বলেই কাজটা অসচেতন বা কাজটা বিশুদ্ধ স্বার্থান্বেষণ বলা চলেনা—সাধারণ মানুষের কথাও লোপাখিন ভেবেছে ও বলেছেও। এর কারণ লোপাখিনের চরিত্রায়ণের মধ্যে (১) তার অর্থ-মগ্নতা, তার খণ্ডিত মানবসত্তা এবং (২) তার শ্রেণী হিসেবে প্রগতি-শীল ভূমিকা—এই দুটিকে 'ডায়ালেকটিকস্ অব পোয়েটিক জাস্টিস' এর বিচারে এনে তুলে ধরা হয়েছে—এবং সৃষ্ট হয়েছে এক স্মরণীয় চরিত্র।

এর থেকে বোঝা যায় 'জলসাঘর' ছবির মহিম বিশুদ্ধ একটি "সংকীর্ণ বুর্জোয়া" হিসেবে চিত্রিত, নব্যবুর্জোয়ার অন্যান্য সচেতন গুণের চিহ্ন নেই, এমনকি খুব স্পষ্ট যে চিহ্নগুলি থাকা অবশ্যম্ভাবী ছিল—তার উদ্যম, তার আত্মশক্তির ওপর দৃঢ়তা—এগুলি পর্যন্ত নেই। ছবিতে তাকে দেখে দর্শকরা হেসেছে। যে যখনই অভিজাত বিশ্বম্ভর রায়ের সামনে উপস্থিত তখনই দেখা যায় সে নার্ভাস, তার মধ্যে একটা 'হেঁ হেঁ' ভাব, তার গরু চোরের মত চাহনি, একটা বিপন্ন অপ্রতিভতা—তার সামগ্রিক 'ইমেজ' এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা হীনত্ব এবং এটা সত্যজিৎ রায় বেশ ভালো ভাবেই ফুটিয়ে গেছেন দক্ষতার সংগে। পদে পদে সত্যজিৎ বলতে চেয়েছেন "দেখ এই অভিজাতের তুলনায় নব্য বুর্জোয়াটি কত হীন।" একে নিয়ে বেশ হাস্যরসের অবতারণাও করা হয়েছে। কেন? এতে কি জর্জ লুকাচ কথিত এবং এরিক রোড স্বীকৃত টাইপ চরিত্র হিসেবে বা শ্রেণী চরিত্রের প্রতিনিধিত্বগুণ থাকার প্রশ্নে মহিমের চরিত্রায়ণ ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে না? অবশ্যই যাচ্ছে। জলসাঘরের মহিম চরিত্রায়ণের গুণগ্রাহী যেসব আলোচক 'ছবিতে মহিম প্রায় আগাগোড়া হাসির পাত্র'—এটা দেখেও এর পিছনে সত্যজিতের উদ্দেশ্যটা ভুলে থাকতে চেয়েছেন তাঁদের প্রতি প্রশ্ন তাঁরা কি মহৎ বিশ্ব সাহিত্য থেকে এমন একটিও উদাহরণ দিতে পারবেন যেখানে এই যুগসন্ধিক্ষণের ওপর স্বীকৃত কোন মহৎ রচনায় নব বুর্জোয়ার প্রতিনিধিত্ব গুণ সম্পন্ন কোন চরিত্রকে নিয়ে পাঠকের 'আগাগোড়া' হাস্যোদ্রেক করান হয়েছে—বিশেষ করে যে নব বুর্জোয়া চরিত্র অভিজাত চরিত্রের বিপক্ষে উপস্থাপিত?

যদি স্বীকার করা হয়ও যে, শ্রমবিভাজন তীব্রতর হওয়ায় বুর্জোয়া চরিত্র এত বিকৃত খণ্ডিত হয়ে গেছে যে তা প্রায় 'ক্যারিকেচারের পর্য্যায়ে এসেছে (এটা ঘটতে পারে) তাহলেও লক্ষ্য করার যে এ ধরণের চরিত্র নব বুর্জোয়ার মধ্যে পড়ে না, এটা ঘটেছে আরো পরবর্তীকালে যখন তাদের নবত্ব গেছে ঘুচে। যারা উদয়কালে অভিজাতদের বিরুদ্ধে উদীয়মান তারা 'ক্যারিকেচার' শ্রেণীতে পড়ত না।

এবং মহিম তার গরুচোর ভাব, হীন চাহনি, বিশ্বম্ভর রায়ের সামনে তার অপ্রস্তুত ভঙ্গী, জমিদারের কবুতর কর্তৃক তার গায়ে মলত্যাগ দৃশ্যে তাকে নিয়ে সত্যজিতের মজা দেখান—এসব কিছু সৃষ্টি করেও সত্যজিৎ থামেননি—মহিমের কমিক ভাবভঙ্গীর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বজ্জাতি বা villainy-র মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। অবশ্যই এটি প্রকট নয়, এটি ঘটনার বিন্যাসের মধ্যে বা সংলাপে অতটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু মহিমের ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসুর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে তার চাহনি, তার প্রত্যক্ষ বিশ্বম্ভর রায়ের সামনে গোবেচারী 'হেঁ হেঁ' ভাব, আড়ালে ঘৃণা, বিশেষ করে বিশ্বম্ভরের বর্তমান দারিদ্র্য দেখে ভিতরে ভিতরে স্ফূর্তি, বিশ্বম্ভর রায়ের চাকরের কাছে কথা বলার সময় গলার স্বরে শ্লেষ—এর মধ্যে স্পষ্ট। ক্রিস্তিয়াঁ মেজ (Christian Metz) যাঁর 'A Semiotics of the Cinema' একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ, দেখিয়েছেন ঘটনা পরম্পরায় যে 'হোরা-ইজনট্যাল' রেখা তার মধ্যে দিয়েই শুধু ছবির বক্তব্য বলা হয় না, আর একটি 'ভার্টিকেল' রেখাও চলচ্চিত্র ভাষায় থাকে, যাকে বলা হয়েছে চলচ্চিত্রভাষায় paradigmatic dimension এর মধ্যে সেখানে একটি বস্তুর প্রতীকী উপস্থিতি, চরিত্রের অভিনয়ের একটি ভঙ্গীও একটি নূতনতর অর্থ সৃষ্টি করতে পারে। মহিমের কমিকী সূক্ষ্ম বজ্জাতিটা আছে সেই ছবির ভাষার paradigmatic dimension এর মধ্যে। (মেজ্ এর পূর্ণ বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য Film Theory And Criticism, O. U. P, Christian Metz : Page 103—119 এবং The Major Film Theory, O. U. P, page 220—229).

তাছাড়াও একটা প্রশ্ন আছে। ছবিতে বিশ্বম্ভরের শেষ করুণ ট্র্যাজেডির কারণ জলসা বসান নিয়ে, নববুর্জোয়া ধনী মহিমের সঙ্গে তার অসম প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা বিশ্বম্ভর অহংকারের বশে যেচে টেনে এনেছিল, এটাও যেমন ঠিক তেমনি শেষ ও মর্মান্তিক জলসা প্রতিযোগিতা তাকে নিতে বাধ্য করেছে মহিমের তথাকথিত 'স্পর্দ্ধা'। কারুর কারুর কাছে এটা মনে হয়েছে মহিমের 'জাতে উঠতে চাওয়ার' একটি প্রকাশ। এখানেও যারা এরকম ভাবছেন তাঁরা ভুল করছেন। নববুর্জোয়ারা শ্রেণী হিসেবে কখনো অভিজাতদের 'জাতে উঠতে' চায়নি, ইতিহাস এবং বালজাক, গোটে, চেখভ সেকথা বলে না। নববুর্জোয়ারা অভিজাতদের প্রতি বিদ্বিষ্ট, প্রতিশোধপরায়ণ, তারা জাতে উঠতে চাইবে কেন সেই শ্রেণীর যে-শ্রেণী তার কর্তৃত্ব হারিয়েছে? নববুর্জোয়ারা সেই কর্তৃত্ব চেয়েছে, অভিজাতদের মিথ্যা আড়ম্বরকে তারা ঘৃণা করেছে। নববুর্জোয়ার প্রতিনিধিত্বগুণ সম্পন্ন চরিত্রে এই গুণ থাকা উচিত। মহিম চরিত্রে যদি তা না থাকে, তাহলে টাইপ চরিত্র হিসেবে তা ব্যর্থ। কিন্তু বস্তুতঃ মহিম চরিত্রে অভিজাতের প্রতি ঘৃণা, তাকে অপদস্থ করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু এটা স্বাভাবিক শ্রেণী ঘৃণা হওয়া উচিত, এটা বজ্জাতি বা ভিলেনি নয়। সত্যজিৎ ব্যাপারটা এমন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন যাতে মনে হয় মহিমের টাকার গরম এমন একটা অবস্থায় এমন একজন করুণার পাত্র নিঃসঙ্গ নিঃসহায় 'মানুষকে' এমন ধ্বংসের পথে ফেলে দিল—যাতে করে দর্শকদের মহিমের প্রতি ক্রোধ জাগে, তার ভাঁড় সদৃশ ব্যবহারের মধ্যে মিশে মহিমকে একটা মিচ্কে

শয়তান মনে হয়, কেননা ছবিতে মহিমই তার টাকার গরমের জন্য বিশ্বম্ভর রায়ের মত ফুরিয়ে যাওয়া মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে তার দুর্বলতম স্থানে আঘাত করে তাকে এক অসম প্রতিযোগিতার নামাচ্ছে—যার মানে তার সর্বনাশ!

এক কথায় ছবির মহিম ব্যক্তি চরিত্র হিসেবে যত অনবদ্যই হোক, তার মধ্যে তার তৎকালীন শ্রেণীচরিত্র ফুটে ওঠে নি। শুধু দুটি দিক থেকে তার মধ্যে শ্রেণীচরিত্র ফুটে ওঠে—নঙাত্মক দিক থেকে তার মধ্যে একটি বুর্জোয়া চরিত্রের Cash-nexus বা অর্থসর্বস্বতা বা টাকার গরম। একথা ঠিক তার এই বদ্‌গুণটি, তৎসহ তার খণ্ডিত আত্মসত্তা. এগুলিকে সত্যজিৎ রায় ব্যঙ্গাঘাতে জর্জরিত করেছেন। যদি এটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়, তবে এই দিক থেকে সত্যজিৎ রায় সঠিক। কিন্তু সত্যজিতের এই ভালো কাজটি প্রায় সম্পূর্ণ ঢেকে যাচ্ছে এর পিছনে অন্য একটা উদ্দেশ্যের ছায়া প্রলম্বিত বলে, এবং এইখানেই এই একই কাজ গোটে ও বালজাক করলেও, সত্যজিৎ তাঁদের থেকে ভিন্ন।

অর্থাৎ আগে যে তিন ধরণের ভ্রান্তির কথা বলা হয়েছিল, তার প্রথমোক্ত ধরণের ভ্রান্তি যেমন ঘটান হয়নি; এবং কারুর কারুর কাছে সেজন্য সত্যজিৎ রায় প্রশংসার যোগ্য, তেমনি দ্বিতীয় ধরণের ভ্রান্তি (যা আরো গুরুতর ভ্রান্তি) তা ঘটান হয়েছে বলে সত্যজিৎ রায় সমালোচনার যোগ্য। তিনি নববুর্জোয়া চরিত্রের অর্থসর্বস্বতাকে, সংকীর্ণতাকে ঘৃণ্য মনে করেছেন (ঠিকই করেছেন), কিন্তু তা করতে গিয়ে নববুর্জোয়া শ্রেণীর সামগ্রিক বৈপ্লবিক ভূমিকাকেও অস্বীকার করে সোজা অভিজাতদের পক্ষে চলে পড়েছেন, এবং নানান প্রক্রিয়ায় দর্শককে অভিজাত মানুষটির সঙ্গে মানসিক ভাবে একাত্ম করে দিতে চেয়েছেন—যা, আগেই বলা হয়েছে, আরো বড় ভুল! তার ফলে দর্শক ছবিটির মূল বিষয় বস্তুর যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে—এক পচা ইতিহাস পরিত্যক্ত যুগের মূল্যবোধের প্রতি নস্টালজিয়া অনুভব করেছে।

সমস্ত ছবিটির মধ্যে এই যে একটা ভুল মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, যেজন্য পশ্চিমী প্রাতিষ্ঠানিক আলোচকরা লিখেছেন এছবি 'এক পবিত্র যুগের অবসানের ট্রাজেডি'—এর জন্য সত্যজিৎ যে সব প্রকরণ ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে মহিম চরিত্রের বিকৃত রূপায়ণও একটি। শুধুমাত্র মহিম (নববুর্জোয়া) চরিত্রের একটি বদ্‌গুণ 'টাকার গরম' কে চাবুক মারা হয়েছে দেখেই যারা সত্যজিৎ রায়ের 'মানবতাবাদী' চাবুক মারা হাতটি শ্রদ্ধায় চুম্বন করতে উদ্যত, তাঁরা এটা লক্ষ্য করছেন না যে, সেই একই হাত তাঁর দক্ষ ক্যামেরার মধ্য দিয়ে সেই মহিমের মত নব বুর্জোয়া চরিত্রের শ্রেণী লক্ষণের ভালো দিকগুলি সযত্নে পরিহার করেছে, দর্শকের কাছে 'সারাক্ষণ' মহিমকে একটি হাস্যোদ্রেককারী চরিত্রে পরিণত করিয়েছে তাতে সূক্ষ্ম বজ্জাতি মিশিয়েছে—এবং এর সর্বমোট ফল হয়েছে দর্শক মহিমের মধ্যে নব বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকার টিকিও দেখতে পায়নি, বরং তার মধ্যে একটা মিচকে শয়তানকে দেখে বিপরীত দিকের অভিজাত বিশ্বম্ভর রায়ের প্রতি ও তার অভিজাত মূল্যবোধের প্রতি আরো শ্রদ্ধাশীল হয়েছে। সুতরাং যদিও বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে নববুর্জোয়ার টাকার গরমকে চাবুক মারার জন্য সত্যজিতের কাজ প্রশংসনীয়, কিন্তু এই শুধুমাত্র চাবুকমারার যোগ্য হিসেবেই নব বুর্জোয়া মহিম চিত্রিত হওয়ায় এই 'প্রশংসনীয় কাজটি' যে ভুল ও পচা মূল্যবোধের দিকে আমাদের নিয়ে গেছে তার সামগ্রিক ফলাফলের বিচারে এই "প্রশংসনীয় কাজটিকে" তার কাব্যিক বিচার বলা তো চলেইনা, বলা চলে কিছুটা উদ্দেশ্যমূলক। তাছাড়া আরো একটা কথা স্মর্তব্য, এই টাকার গরম নববুর্জোয়ারা আকাশ থেকে পায়নি, সমস্ত সমাজেই এর অস্তিত্ব ছিল যদিও বাহ্যাড়ম্বরের আড়ালে (গোটের মেইস্টারের কথাগুলি স্মরণ করুন) সুতরাং একজন অভিজাতের বিপক্ষে উপস্থাপিত নববুর্জোয়াকে টাকার গরমের জন্য চাবুকমারাকে এবং এই প্রসঙ্গে অভিজাতদের পূর্বতন ভূমিকাকে এড়িয়ে যাওয়াও এক ধরনের পক্ষপাত। তাই সামগ্রিক বিচারে আমার মতে মহিমের টাকার গরমকে চাবুক মারা যেমন উচিত কাজ বলে স্বীকার করব, কিন্তু দ্বান্দ্বিক বিচারে এই ছবির অন্য বিষয় ও পরিস্থিতির সমাবেশে তা যে ভ্রান্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করছে সেটাও লক্ষ্য করব।

অতএব এর ফল মহিম চরিত্রের তৃতীয় স্তর—ঐতিহাসিক মাত্রা—সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। ছবি দেখার পর, যেমন চেখভের "দ্য চেরী অর্চার্ড" নাটক দেখার বা পড়ার পর, যে মনে হওয়া উচিত সামন্ত যুগ শেষ হয়েছে সামগ্রিক দিক থেকে ভালই হয়েছে, তেমনি শ্রমবিভাজন জনিত কিছু কিছু মানবিক মূল্যবোধেরও ক্ষয় হয়েছে—নূতন বুর্জোয়া যুগ এসেছে সামগ্রিক ভাবে ভালোই হয়েছে—তেমনি কিছু কিছু খারাপ মূল্যবোধ সৃষ্টি হচ্ছে —এবং এই সব কিছু হয়েছে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং এক সত্যিকার মহৎ উজ্জ্বল মানবিক পূর্ণতর ভবিষ্যতের তাগিদে যে ভবিষ্যতকে চেখভ "দ্য চেরী অর্চার্ড' নাটকে মূর্ত করেছেন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে জাগ্রত তরুণ ট্রফিমভের মধ্য দিয়ে—এই যে সামগ্রিক সত্যের নির্মল সত্যরূপ অর্থাৎ ছবির সামগ্রিক ঐতিহাসিক ডাইমেনশন, ছবির মধ্যে তা পাওয়া যায় না।

এবং এর একটি প্রধান কারণ মহিম চরিত্রের সামগ্রিক বিকৃত রূপায়ন। এবং নব বুর্জোয়ার ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকাকে যদি স্বীকার করি, তাহলে এইভাবে তার প্রতিনিধিত্বগুণ সম্পন্ন চরিত্রের প্রতি অন্ধ বিরূপতা এক অর্থে এক ধরনের প্রগতিকে প্রত্যাখ্যানের নামান্তর। কিন্তু এর মানেই প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়, যদিও কোন যান্ত্রিক মার্কসবাদী এভাবে ব্যাখ্যা করে অর্থ আরোপ করতে ভালোবাসেন, বরং মার্কস্ এঙ্গেলসের অনেক সাবধান বাক্য খেয়াল না করেই। প্রগতিকে কোন একটা 'ইস্যু'তে প্রত্যাখ্যান আমাদের মধ্যে অনেকেই করেন, যেমন আমাদের মা বাবাদের বেশির ভাগই এখনো এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের বিবাহকে মেনে নিতে

স্বেচ্ছায় রাজি নন, এটাও প্রগতির বিরুদ্ধাচরণ, কিন্তু তার মানেই তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল নন। **মানুষ সম্পর্কে, বিশেষ করে শিল্পীদের সম্পর্কে 'হয় এটা' আর না হলেই "একেবারে উল্টো'—এটা ভাবাই যান্ত্রিকতা।** মানুষ এত সহজ বিবর্ণ বস্তু নয়।

এই ছবির মধ্যে সত্যজিতের কোন প্রতিক্রিয়াশীলতার চিহ্ন নেই—যা আছে তা হচ্ছে তাঁর পশ্চাদমুখী মনোভাব, প্রগতি সম্পর্কে, সেই যুগ সন্ধিক্ষণ সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব। তবু ছবির মধ্যে এমন অনেক মুহূর্ত আছে যেখানে ঘটেছে মানবিকতার উজ্জ্বল উদ্ধার বিশেষতঃ যেখানে বিশ্বম্ভর রায়ের ব্যক্তি রূপই প্রধান বিষয়—অসাধারণ উচ্চস্তরের শিল্প নৈপুণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ও সব মিলিয়ে ছবিটি একটি 'মেজর ফিল্ম' আজো সাধারণ মধ্যবিত্ত দর্শক ছবিটি দেখে মুগ্ধ উদ্বেলিত।

কিন্তু ঐতিহাসিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্য ছবিটি ক্রমশঃ সচেতন হয়ে ওঠা দর্শক কি ভাবে নেবেন? তাই সামগ্রিক বিচারে এই 'চিত্রবীক্ষণ' পত্রিকায় সাত বছর আগে ছবিটি সম্পর্কে যে কথা লিখেছি তারই পুনরাবৃত্তি করছি : **ছবির অঙ্গে অঙ্গে চিত্রভাষায় অনুপম ঐশ্বর্য থাকা সত্বেও মধ্যবিত্ত পুষ্ট চিন্তাধারা স্বল্পকালীন আয়ুর মধ্যেই ছবিটির শিল্প মূল্য হারিয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।**

এর জন্য যেসব প্রধান কারণ দায়ী মহিম চরিত্রের ভ্রান্ত চরিত্রায়ণ তার একটি।

সূত্র নির্দেশিকা—

(১) K. Marx and F. Engles : TheG ermar Ideology. vol 1, Moscow, Page—24.

(২) K. Marx aud F. Engles ; Selected Works in One Volume, Moscow and Lawrance and Weshswart, Londan, page 38.

(৩) গোটের সমকালীন যে বিখ্যাত সমালোচক গোটের তথাকথিত অভিজাত প্রেমকে আক্রমণ করেছিলেন তাঁর নাম Frederich Schlegel. দ্রষ্টব্যঃ George Lukaes : Goethe and His Age, Merlin Press, London, Page 52.

(৪) F. Engles : Dialecties of Nature, Moscow, Page 20-22.

(৫) Engles to Margaret Harkner, Marx and Engles : "Selected Correspondence," Moscow, pp 379-81.

(৬) Engles to Laura Lafargues, 1883, "Engles and Laforgues : Correspondence Vol 1, Moscow, p-160

তৃতীয় বিশ্বের নবতম নির্ভীক চিত্র পরিচালক দারিয়ুস মেহরজুই ॥

প্রদীপ বিশ্বাস

তৃতীয় বিশ্বের একজন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক আহমেদ রাচেদি সম্প্রতি একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ছবি করার ব্যাপারে। তিনি বলেছেন : "we should make films about the armed revolution, even after 50 years we will still need to show it…the war of Liberation comes first, this is very important". এই মন্তব্য থেকে একটি বিষয় খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। সেটা হলো বর্ত্তমান তৃতীয় বিশ্বের ছবি নির্মাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং কিই বা তাদের ভূমিকা ছবি নির্মাণের ব্যাপারে। এরা চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে কি ভাবে ব্যবহার করতে চায় তাও উপরের মন্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়। বর্ত্তমান চলচ্চিত্র আন্দোলন যে মুক্তিকামী মানুষের সশস্ত্র সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে চলেছে, তাও তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের ভূমিকা প্রমাণ করে।

লাতিন আমেরিকা, আলজিরিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের চিত্র-নির্মাতাদের সঙ্গে ইরানের কতিপয় পরিচালক হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আমরা ইরানের চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ করে পরিচিত হতে পারিনি এ পর্য্যন্ত নানা কারণে। আমাদের এখানে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, ইরানের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারেনি দুটি কারণে। প্রথমটি হলো তৃতীয় বিশ্বের সম্পর্কে আমাদের একধরনের অনীহা। দ্বিতীয়ত ছবি আনা নেয়ার ব্যাপারে সরকারী গাফিলতি।

তৃতীয় বিশ্বের ছবি করিয়ে দেশগুলির মধ্যে ইরানের ছোট্ট স্থান আস্তে আস্তে চলচ্চিত্রের মানচিত্রে নতুন আলোর স্ফোটক হয়ে দেখা দিচ্ছে। ইরানকে চলচ্চিত্র আন্দোলনের শরিক হিসেবে যিনি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তিনি হলেন দারিয়ুস মেহরজুই। ইরানী সমাজ ব্যবস্থার শোষণ, নিপীড়ন ও অবক্ষয়ের চেহারাটি সর্বপ্রথম আমরা মেহরজুই-য়ের সৃষ্ট চিত্রগুলির মধ্যে পাই।

মেহরজুই খুব বেশীদিন চলচ্চিত্র আন্দোলনে আসেননি। তাঁর ছবিগুলি পর্য্যালোচনা করলে জানা যায় সত্তরের দশকের গায়ে গায়ে এই পরিচালক শিল্পীর আবির্ভাব। তবে তিনি খুব সম্ভবতঃ প্রথম ব্যক্তি যিনি মোটামুটি ভাবে শোষণ ভিত্তিক সমাজে জোর একটা নাড়া দেবার সাহস দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম ছবি 'দ্য কাউ' নির্মিত হয় সত্তর দশকের সামান্য কিছু আগে। একটি গরু হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ ছবির বিস্তার। গল্পের কেন্দ্র চরিত্র নিঃসন্দেহে একজন দরিদ্র কৃষক। শোষণ যন্ত্রের প্রতিঘাতে সে উন্মাদ হয়ে যায় তার একমাত্র মূলধন 'গরু' হারানোয়। এই সঙ্গে মেহরজুই তাঁর সমাজ কাঠামোর সংস্কার, ভয়, অশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়কে সমাজ-সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

মেহরজুই-য়ের পরের ছবি 'দ্য জানুক হাউস' ও 'দ্য পোস্টম্যান'। ছবি দুটি যথাক্রমে বাহাত্তর ও তিয়াত্তর সালে তৈরী হয়। বলা বাহুল্য মেহরজুই-এর এই ছবি দুটি তেমন সাড়া জাগাতে না পারলেও ছবি নির্মাণের পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে, নতুন ফ্রেম গঠনের এবং সেই সঙ্গে বিষয়-ভাবনার প্রবাহটি তিনি অব্যাহত রাখেন। এই ছবির বিদেশে প্রদর্শন তেমন না হওয়ায়, তুলনামূলক বিচার হয়তো বা সম্ভব হয়নি। তবে ইরানের নিজের মাটিতে, যতটুকু জানা যায়, উপরোক্ত ছবি দুটির কদর হয় এবং মেহরজুই পরিচালক হিসেবে নিজের ইমেজ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মেহেরজুই-এর সবথেকে বিতর্কিত ছবি 'দ্য সাইকেল'। ছবিটি নির্মিত হয় সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে। এবং রিলিজ হওয়ার সাথে সাথে ইরানের শাহ সরকার ছবিটির দেশে বিদেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দেন। এই সঙ্গে এই তরুণ পরিচালককে নানাভাবে বাধা দেয়া হয় যাতে করে এই শিল্পী-পরিচালক আর কোন সমাজ-সচেতন ছবি করতে না পারেন। কোন এক সাক্ষাৎকারে এই পরিচালক জনৈক চিত্র-সমালোচককে বলেন : "For three years I have done nothing. Only recently have they allowed me to do a documentary for television". এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার হয় যে শিল্পীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা কতখানি ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে ইরানের শাহ সরকারের শাসন যন্ত্রে। অবশেষে 'দ্য সাইকেল' ছবিটি সাতাত্তরে প্যারী উৎসবে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এখানেই ছবিটি যথেষ্ট সমালোচনা ও বিতর্কের ঝড় তোলে। ছবি প্রদর্শনের পর শিল্প জগতে বিদগ্ধ মহলে সাড়া পড়ে যায়। ছবিটি আপাততঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শনের ছাড়পত্র পেয়েছে।

'দ্য সাইকেল'-এর গল্প বলা হয়েছে এক দরিদ্র কৃষক সন্তান আলীকে নিয়ে। এই দরিদ্র যুবকের ধীরে ধীরে নৈতিক অধঃপতন ও তার শোষণ তীব্রতর করে দেখানো হয়েছে। আলী ও তার বাবা শহরে আসে বাঁচার তাগিদে। দারিদ্র যেহেতু এদের মরণসঙ্গী তাদের সংগ্রাম গড়ে ওঠে কেবল বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে। দেখা যায় শহরে রক্ত বিক্রীর পসার বসেছে। এবং মানুষের রক্ত নিয়ে অনৈতিক ব্যবসা জাঁকিয়ে চলেছে

শহরের অলিতে গলিতে। অসাধু ব্যবসায়ীরা দরিদ্র মানুষদের রক্ত অল্প মূল্যের বিনিময়ে কিনে নিয়ে তা চড়া দরে বিক্রী করে মুনাফা লুটে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা আলীকে দেখি তার রক্ত বিক্রী করতে। আলীও মেতে ওঠে এই অমানবিক ব্যবসায়। মুনাফা আরও মুনাফা এই উল্লাস আলীকে পেয়ে বসে। এই অর্থ নেশার মধ্যে আলী তার বাবাকে বাঁচাতে পারে না। সে মারা যায়। মৃত্যু এখানে করুণার অনুভূতি বয়ে আনে না। বরং দেখা যায় সরকারের চোখের উপরে রক্ত বেচা কেনার উৎসব জোর কদমে এগিয়ে চলে। অপরদিকে হতাশা, দারিদ্র, প্রবঞ্চনা, শোষণ পর্দার উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

মেহরজুই একজন নিষ্ঠাবান সচেতন পরিচালক। তিনি সমগ্র ইরানের অবক্ষয়ের চেহারাটি তাঁর ছবির ফ্রেমে রেখে দিয়েছেন। ছবিতে কোন পথ তিনি বলে দেননি, বলে দেননি কোন পথে মুক্তির উপায়। তিনি কেবল চরম বিপর্য্যস্ত সত্যকে, বাস্তবকে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন কোন মোহ, ভয় না রেখেই।

এই ছবি দেখে জনৈক সমালোচক বলেছেন : "Mehrjui's use of his principal characters as symbols of the various conflicting forces within contemporary Iran is also quite remarkable. Ali's father, Ali and Sameri, symbolize the forces of religion, oppression and youth at odds with one another." অর্থাৎ বর্তমান ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেহারা এবং সেখানকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে পরিচালক মেহরজুই-এর ছবিতে। আজ যখন দেখি তৃতীয় বিশ্বে সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে, লড়াই চলেছে ভেতরে বাইরে শোষণের বিরুদ্ধে, ইরান চলচ্চিত্রের বর্তমান অগ্রগতি এই প্রেক্ষাপটে উপেক্ষা করার নয়। দারিয়ুস মেহেরজুই এই নবতম অগ্রগতির প্রবাহ চলমান রাখতে এক নির্ভীক ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

মেহরজুই-এর ছবিগুলি এখনও ভারতের মাটিতে প্রদর্শিত হয় নি। আমাদের এখানে যারা তৃতীয় বিশ্বের ছবির জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে থাকেন, যারা নিপীড়নের বিরুদ্ধে তৈরী ছবি দেখতে চান, মেহরজুই-এর সাম্প্রতিকতম ছবি তাদের জন্য আবশ্যিক বিষয়। আমাদের এখানে বাইরের বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের ছবি নিয়ে আসার অনেক অসুবিধে আছে, বাধা আছে। এই অসুবিধের কথা আমাদের অজানা নয়। তবুও বলে রাখা ভাল ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ এবং ব্যক্তিগতভাবে যারা আমাদের এখানে ছবি আনা নেবার ব্যাপারে নিজ নিজ স্তরে লড়াই করে চলেছেন, তারা যদি মাঝে মাঝে এই অজানা তৃতীয় বিশ্বের ছবির অ্যালবাম ভারতীয় দর্শকের কাছে তুলে ধরতে পারেন, তাহলে মনে হয় বহু আকাঙ্খিত পাওনার স্বাদ কিছুটা মিটতে পারে।

সিনে ক্লাব, আসানসোলের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র ● সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন—

"ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত। কর্মসূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন, যাঁর ছবির ওপর বিদেশে অন্তত: পক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশ —অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)—এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতার অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে কিভাবে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে—এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপুচিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ীর আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে—যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫ তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে—এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশাকরি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা ক্লাবের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :"

যোগাযোগের জন্য :

CINE CLUB OF ASANSOL

16, Municipal Market, G. T. Road (West)

ASANSOL

Phone : 3338

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফেড ইন্।



দুর্গা (সন্ধ্যা রায়)

ছবি : ধীরেন দেব

দুর্গা ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে যায়।

দুর্গা : বাপ্ রে!

কাট্ টু।

পদ্ম পেছন ফিরে আবার শুয়ে পড়ে।

দুর্গা : উ কি? কের শুলে যে!....ওঠো।

পদ্ম : ক্যানে?

দুর্গা : বাঃ আমি যে তোমার কাছেই এলাম!

পদ্ম : উ—! কি আমার আপনজন!

দুর্গা : (হেসে) নাই?....বুকে হাত রেখে বলো!.... আমি যে তোমার সতীন গো!

পদ্মর কাছে অসহ্য ঠেকে। সে উঠে একটা ঝাঁটা হাতে তুলে দুর্গার দিকে ছোঁড়বার জন্ত।

পদ্ম : কি বুঝি?

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার



দেবু পণ্ডিত (সৌমিত্র চ্যাটার্জি)

ছবি : ধীরেন দেব

দুর্গা : কি হইছে গিরিশদা!

গিরিশ : খানাপুরী ! জরিপ শুরু হয়ে গেইচে ! যাও যাও মাঠে এক্ষুনি চলে যাও।

বলেই সে ছুটে বেরিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮০

স্থান—ধানখেত।

সময়—দিন।

পাকা ধানের ওপর দিয়ে ভারি লোহার চেন টেনে টেনে জমি মাপছে লোকরা। ধান গড়িয়ে পড়ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮১—১৮৩

স্থান—গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

উত্তেজিত একদল গ্রামবাসী নানা দিক থেকে ছুটে যায় ধানখেতের দিকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮৪

স্থান—দেবুর ঘর।

সময়—দিন।

ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় বিলু দেবুকে একবাটি পিঠে আর পায়েস খেতে দিচ্ছে। দেবু পণ্ডিত আসনে বসে।

দূরের গোলমালের শব্দ জোরে হতে থাকে। দেবু উঠে পড়ে।

দেবু : কি হল ?

বিলু : ও কি !

দেবু পণ্ডিত জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮৫

স্থান—দেবুর বাড়ির পাশের রাস্তা।

সময়—দিন।

জানলা দিয়ে দেখা যায় একদল গ্রামবাসী ছুটে যাচ্ছে ধানক্ষেতের দিকে। তারা রয়েছে সেই দলে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮৬

স্থান ও সময়—দৃশ্য ১৮৪'র মত।

দেবু : কি হয়েচে—তারা ?

দৃশ্য—১৮৭

স্থান ও সময়—দৃশ্য ১৮৫'র মত।

তারা : শিগ্ গির আসেন !....মাঠে শেকল টানছে !

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮৮

স্থান ও সময়—দৃশ্য ১৮৪'র মত।

দেবু : সে কি ?

দরজার কাছে চলে আসে সে।

বিলু : শোনো—

দেবু : আসছি বিলু—

দেবু পণ্ডিত ছুটে বেরিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৮৯

স্থান ও সময়—দৃশ্য ১৮০'র মত।

বিগক্লোজ শট্। হতভম্ব পাতু বায়েন।

পাতু : নাই !…নাই !! (পাশে দ্বারকা চৌধুরীর কাছে গিয়ে) শুনেন,…শুনেন চৌধুরীমোশায় !…. বইলছে আমার জমি নাই !! তবে তো আমি নাই !!—আপনি নাই,—মাথার ওপর কেউ নাই, …ভগবান শুদ্ধু নাই !!

জায়গাটা ঘিরে জমাট ভিড়। চারিদিক থেকে আরও আরও লোক আসছে।

বিরক্ত পেশকার একটা ম্যাপ খুলে পাতুকে দেখায়।

পেশকার : আমি তার কি করব ! এইতো…এইতো কাগজ !…আছে কোথাও ?…ভাখ্, এখান থেকে এখান অব্দি স—ব কঙ্কনার বাবুদের মালজমি—

দ্বারকা বলেন কি পেশকার বাবু,… চার পুরুষ ধরে মন্দিরে যে ঢাক বাজায় ওরা !

পাতু আজ্ঞে হাঁ—দেবোত্তরের চাকর ! নিষ্কর চাকরান জমি আমাদের…

পেশকার ওসব চাকরান ফাকরান বুঝি না ! এখানে তার কোনো হদিশ নেই—

হঠাৎ পাতু বায়েন ঝাঁপিয়ে পড়ে পেশকারের ওপর।

পাতু : (পাগলের মতো) নাই !…হদিশ নাই ! গেল কুথা ?… কাইল তক্ ছিল…আইজ গেল কুথা… বল্ !

পেশকারের গলা চেপে সজোরে ঝাঁকাতে থাকে পাতু। মুহূর্তের মধ্যে অন্যান্য সেটলমেন্ট কর্মচারীরা ছুটে আসে, পাতুকে মারতে আরম্ভ করে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে যায় উল্টোদিকে।

দেবু পণ্ডিত সেই দিক থেকে ছুটে আসছে।

কলরব : "পণ্ডিত, পণ্ডিত এসে গ্যাচে"

দেবু : কি, কি হয়েছে পাতু? পাতুকে অমন করে মারছে কেনে?

পাতু : শোনেন গো…শোনেন পণ্ডিত মশাই…আমার জমি—

নায়কা : ঐ ভাখো, ঐ ভাখো…

সঙ্গে দেবু পণ্ডিত পাতুর পেছনে তাকিয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে—

দেবু : ও কি !!

কাট্ টু।

সেটলমেন্ট অফিসের কয়েকজন কর্মচারী ভারী চেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাকা ধানখেতের ওপর দিয়ে। সব ধান নষ্ট হচ্ছে।

কাট্ টু।

দেবু : (ছুটে গিয়ে) এসব কি করছেন?….এঁ্যা?….কি করছেন আপনারা? বন্ধ করুন!…বন্ধ করুন বলছি!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একদল লোকের মধ্য থেকে একটা চেনা গলা শোনা যায়।

কাছনগো : (off voice) কে, কে বন্দ কত্তে বল্লে?

লোকটা দেবুর দিকে তাকায়, সে কাছনগো।

দেবু : (অবাক হয়ে) আপনি!

কাছনগো : যাক্, চিনতে পেরেছেন তাহলে?

কাট্ টু।

ক্যামেরা চার্জ করে দেবুকে। দেবু আগের দিনের ঘটনা মনে করে অবাক হয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯০

স্থান—দেবুর বাড়ির সামনের রাস্তা।

সময়—দিন, পৌষলক্ষ্মীর আগের দিন।

একই কম্পোজিশনে দেবু ও কাছনগো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

কাছনগো : আ মোলো! অমন মরা মাছের মতো চেয়ে আছিস কেন!….বোবা নাকি?

দেবুর মুখ কঠিন হয়। তীক্ষ্ণ স্বরটি আগের মতই শোনা যায়। কাছনগোর চোখের ওপর তাকিয়ে দেবু উত্তর দেয়—

দেবু : না!…কি বলবি বল্!

কাছনগো : (বিস্মিত) কি বল্লি!!…আমায়….আমায় তুই "তুই" তোকারি করলি!

দেবু : সে তো তুই আগে করলি।

কাছনগো : ও!…আচ্ছা!….ঠিক আছে!…কী….কী নাম তোর?

দেবু : আমার নাম শ্রীদেবনাথ ঘোষ।…তোর?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯১

স্থান—ধানখেত।

সময়—দিন।

ক্যামেরা ট্র্যাক ব্যাক্ করলে দেখা যায় কাছনগো দেবু পণ্ডিতের সামনে দাঁড়িয়ে মুচকে হাসছে।

কাছনগো : অধীনের নাম শ্রীবক্তিনাথ বাঁড়ুজ্জে। বলুন কি সেবা কত্তে পারি?

দেবু : এ অন্যায়! এমন করে ধান নষ্ট করে শেকল টেনে নিয়ে যাওয়া—নিয়ম আছে আপনাদের?

কাছনগো : নিয়ম!

দেবু পণ্ডিতের কাছে এগিয়ে এসে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ দেয়।

কাছনগো : পড়ে দেখুন।

দেবু খবরের কাগজটা খোলে।

কাট্ টু।

কাগজের হেড লাইন—

জননেতা শ্রী জে এল ব্যানার্জী গ্রেপ্তার সরকারী জরিপে বাধাদানের পরিণাম।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—কাছনগো দেবুর দিকে তাকিয়ে আছে।

কাট্ টু।

দেবু কয়েক মুহূর্তের জন্য বিহ্বল।

কাট্ টু।

কাছনগো : এখন আমি যা বলব তাই নিয়ম। বেশি কপ্চালে দাওয়াই আমার জানা আছে। (কর্মচারীদের) একি! থামলি কেন?—চালা! চালা!

কাট্ টু।

কর্মচারীরা আবার শেকল টানা শুরু করে।

কাট্ টু।

হঠাৎ দেবু পণ্ডিত 'না' বলে চিৎকার করে ছুটে যায় ধানখেতের মধ্যে। কর্মচারীদের হাত থেকে শেকল কেড়ে নিতে যায়।

দেবু : দেখি…দেখি…

সংঘর্ষ বাধে। দেবু চেনটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দূরে।

কাট্ টু।

শেকলটা ঝপাং করে মাটিতে পড়ে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯২

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির—

সময়—দিন।

মথুর গ্রামের দিকে ছুটতে ছুটতে আসছে।

মথুর : পুলিশ—! পুলিশ আসচে গো!

অনেক : এঁ্যা?

মথুর : হ্যাঁ!…পণ্ডিতকে ধরে নিয়ে গেছে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৩

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

বিলু চকিতে বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়।

বিলু : সে কি?

দুর্গা : (হাঁপাতে হাঁপাতে) এই মাত্তর খবর পেলাম। তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি!

বলেই দুর্গা ছুটে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৪

স্থান—ছিরু পালের গোলা ঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ছিরু পাল ও গড়াই বারান্দায় বসে আছে। ভবেশ ঝড়ের গতিতে বারান্দায় ঢোকে।

ভবেশ : ছিরু! ছিরু আছো নাকি?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৫

স্থান—গ্রামের পথ—সজনেতলা।

সময়—দিন।

জগন ডাক্তার ক্যামেরার দিকে ছুটে আসতে আসতে কয়েকজন গ্রামবাসীকে দেখে সেদিকে আসতে।

জগন : শিগ্‌গির…শিগ্‌গির বা উদিকে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৬

স্থান—বায়েনপাড়ার ঝোপঝাড়।

সময়—দিন।

অনিরুদ্ধ : (এক বাউড়িকে) এঁ্যা? কি বুলছিস তু?

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

উচ্চিংড়ে পদ্মর হাত ধরে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে যায়।

উচ্চিংড়ে : হি গো!…এসো না। দেখবে এসো—

পদ্ম রাস্তার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৮

স্থান—গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

লং শটে দেখা যায় একদল পুলিশ গ্রামের রাস্তা দিয়ে আসছে। দেবু গ্রেপ্তার হয়েছে; তার হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি বাঁধা। বৃন্দাবন, দ্বারকা চৌধুরী হরিশ এবং অন্যান্যদের নিয়ে বেশ বড় একটা দল পেছন পেছন আসছে। সবাই নীরব। শুধু রাঙাদিদি পুলিশ অফিসারের পাশাপাশি আসছে আর প্রতিবাদের সুরে বলছে—

রাঙাদিদি : শুনছ! বলি শুনছ!…গট্ গট্ করে হেঁটে চলে যাচ্ছ যে!

দুর্গা ডানদিক থেকে ফ্রেমে ঢোকে।

রাঙাদিদি : বলি হ্যাগা দারোগা!…চুরি…না জোচ্চুরি…না ডাকাতি…না ডাকাতি করেছে বাছা, যে পৌষলক্ষ্মীর দিনে টেনে নিয়ে চলে?…বচ্ছরকার দিন,…ঘরের মরা বেড়ালটাও বার করে না কেউ—

হরিশ : আহা পিসি, তুমি থামো—

রাঙাদিদি : কেনে? থামব কিসের ভয়ে শুনি?

হরিশ : আহা, বলছি তো আমরা দেখছি। তুমি মেয়েছেলে…

রাঙাদিদি : মেয়েছেলে !...আমার সাড়ে তিন কুড়ি বয়েস হল,—আমি আবার মেয়েছেলে কি রে? একশোবার বুলব !....হাজার বার বুলব !.... আমাকে কি করবি?....বাঁধবি ? নে, নে, নে, —বাঁধ কেনে ?....পণ্ডিতের মত লোক, দড়ি দিয়ে বাঁধছিস—

বলতে বলতে রাঙাদিদি কেঁদে ফেলে।

দেবু : চুপ করো রাঙাদিদি, আমি তোমার কাছে, হাতজোড় করছি—

রাঙাদিদি দেবুর কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহে তার মুখ ও মাথায় হাত বোলায়।

রাঙাদিদি : আমি তোকে আশীর্বাদ করছি ভাই !...সায়েব তোকে দেখা মাত্তর ছেড়ে দেবে !....চেয়ারে বসিয়ে বুলবে—পণ্ডিত লোক তোমাকে কি জেহেল দিতে পারি বাপ ?....ঘরে তোমার কচি বৌ ছেলে....

রাঙাদিদি কাঁদতে থাকে।

কাট্ টু।

কম্পোজিট ক্লোজশট—দেবুর চোখ জলে ভরে আসে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্ পদ্মর চোখে জল।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দুর্গার চোখেও জল। সে দেবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে—

দুর্গা : চলো,—ঘর চলো একবার !

কাট্ টু।

দেবু পুলিশ অফিসারের দিকে তাকায়।

পু. অ. : চলুন !

কাট্ টু।

দৃশ্য—১৯৯

স্থান—ধানখেত।

সময়—দিন।

লং শটে দেখা যায় ছিরু পাল কাতুনগোকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। গড়াই ও ভবেশ রয়েছে সঙ্গে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০০

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনস্টেবল আর হাতকড়া পরান কোমরে দড়ি বাঁধা দেবু পণ্ডিতকে নিয়ে উঠোনে ঢোকে। দুর্গা আর রাঙাদিদি আগেই ঢুকে যায়। দেবু সামনের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্ বারান্দায় স্তম্ভিত আহত বিলু দাঁড়িয়ে—

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্ বিলু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কুসুম বিলুর ছেলেটাকে দেবুর কাছে নিয়ে আসে। একটু থেমে দেবু বলে—

দেবু : সাবধানে থেকো....এঁরা সবাই রইলেন—

বিলু আর সহ্য করতে পারে না, ডুকরে মুখ ফিরিয়ে কেঁদে ওঠে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০১

স্থান—দেবুর ঘর।

সময়—দিন।

বিলু সশব্দে কেঁদে ওঠে। ঘরের দরজায় মাথা রাখে। কান্নাটা চেপে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে সে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু।

কাট্ টু।

বিলু কাঁদছে। ব্যাক গ্রাউণ্ডে দেখা যায় পুলিশের দল দেবু পণ্ডিতকে নিয়ে যাচ্ছে।

বিলু ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে। ক্যামেরা পেছনে সরে এসে দেখায় শূন্য আসন খাবার থালা মিষ্টি তেমনিই পড়ে আছে মেঝেতে।

ব্যাক গ্রাউণ্ডে বেজে ওঠে "যেয়োনা যেয়োনা পৌষ, যেয়োনা ঘর ছেড়ে—পিঠে ভাতে সুখে রাখো স্বামী পুত্তুরে—"

গানটির সুর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০২

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির সামনের রাস্তা।

সময়—দিন।

দেবুর বাড়ির সামনে বড় ভিড়। ছিরু পাল, ভবেশ আর গড়াই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসে। দেবু বাড়ি থেকে বেরোতেই—

ছিরু : খুড়ো শোনো! (দারোগাকে) একটু…

দেবু দাঁড়িয়ে পড়ে।

ছিরু পাল তার কাছে গিয়ে নীচু গলায় বলে—

ছিরু : যদি পর না ভাবো, একটা কথা বলি।…দেখলে তো নিজের লোকের মুরোদ। এদিকে একটা ব্যবস্থা হয়েচে…এখন তুমি যদি রাজী হও তো—

দেবু ছিরু পালের কথা যেন ঠিক বুঝতে পারে না।

ছিরু : মানে, এমন কিছু নয়। ধরো ঐ কানুনগো সায়েবের কাছে গিয়ে একটু হঁয়ে করলে…আর সন্দের দিকে একটা ছোট মোট সিদে—

দেবু : ছি:! ছি: ছিরু!

ছিরু : (অবাক হয়ে) ক্যানে? এতে তো—

দেবু : ছি:!…ছি ছি ছি…

প্রচণ্ড বিরক্তিতে সে মাথা নেড়ে ছিরু পালকে ফেলে এগিয়ে যায়।

অনিরুদ্ধ উল্টোদিক থেকে ছুটে এসে দেবুর মুখোমুখি হয়।

অনিরুদ্ধ : (ধরা গলায়) দেবু ভাই!

চোখ দিয়ে জল গড়ায় তার। অনিরুদ্ধর পিঠে সস্নেহ হাত বুলিয়ে এগিয়ে যায় বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীর দিকে। পায়ে প্রণাম করে।

চৌধুরী : (দু হাতে বুকে জড়িয়ে, আবেগ কম্পিত গলায়) ভগবান এর বিচার করবেন…ভগবান—

সে আর কথা বলতে পারে না।

পুলিশ অফিসার দেবু পণ্ডিতের কাছে এসে বলে—

পু. অ : এবার চলুন দেবু বাবু—

জগন : (off voice) দাঁড়ান!

কাট্ টু।

জগন ডাক্তার হাতে একটা মালা নিয়ে এগিয়ে আসে। দেবুর গলায় সেটা পরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে—

জগন : বলো, শ্রীদেবু ঘোষের—

সবাই : জয়—!

জগন : শ্রীদেবু ঘোষের—

সবাই : জয়—!!

জগন : শ্রীদেবু ঘোষের

সবাই : জয়—!!!

একটা বিদ্যুৎচালিত মুহূর্ত যেন। উলুধ্বনিও শোনা যায়।

ক্যামেরা দুর্গা, রাঙাদিদি, অন্তাজদের ওপর প্যান্ করলে দেখা যায় সবাই উলু দিচ্ছে।

কাট্ টু।

পদ্মর ভেজা চোখ। সেও উলু দিচ্ছে।

কাট্ টু।

দেবু এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে হাত জোড় করে এগিয়ে যায়—

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৩

স্থান—গ্রামের পথ।

সময়—দিন।

গ্রামের মহিলারা সব রাস্তার দুধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। তারা সকলেই উলু দিচ্ছে, কেউবা শাঁখ বাজাচ্ছে।

দেবু হাত জোড় করে ফ্রেমে ইন্ করে এগিয়ে যায়। ক্যামেরাও ট্রলি করে। এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় দেবু ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যায় আর ক্যামেরা তখন চার্জ করে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ছিরু পালের বৌ লক্ষ্মীমণির ওপর। সে ভেজা চোখে শাঁখ বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৪

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

টপ্ শট্। পুলিশ অফিসার কনেস্টবল সহ দেবু পণ্ডিত ফ্রেমে ঢুকে এগিয়ে যায় একটু দূরে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে। গাঁয়ের লোকরা ক্যামেরার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত চণ্ডীমণ্ডপের কাছে এসে থামে। পাথরে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—গ্রামবাসীরা।

কাট্ টু।

পুলিশ দলের সঙ্গে সঙ্গে দেবু পণ্ডিত নদীর বাঁধের দিকে যেতে থাকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৫

স্থান—নদীর পাড়।

সময়—দিন।

নদীর উঁচু পাড় দিয়ে পুলিশ দলের সঙ্গে দেবু পণ্ডিত যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৬

স্থান—সাধারণ, শিমুল গাছ।

সময়—দিন, বসন্তকাল।

ক্যামেরা বাঁ থেকে ডাইনে প্যান্ করে কতগুলো শিমুল গাছ দেখায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৭

স্থান—সাধারণ, (মাঠ)।

সময়—দিন, গ্রীষ্মকাল।

সারা মাঠ ফেটে চৌচির।

বাঁধের ওপর দিয়ে ধুলো উড়ছে।

শুকনো গাছের ডাল।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৮

স্থান—সাধারণ (গ্রাম)।

সময়—দিন, বর্ষাকাল।

বৃষ্টি হচ্ছে। ক্যামেরা টিল্ট আপ্ করে দেখায় ধান খেত।

চাষীরা ক্যামেরার পাশ দিয়ে চলেছে খেতে।

টপ্ শট বৃষ্টিতে ঢাকা ধান খেত।

মাঠের মধ্যে ফড়িং উড়ছে।

মেঘে ঢাকা আকাশ।

বাঁশ পাতায় জল পড়ছে।

বৃষ্টির মধ্যেই গ্রামের ছেলেরা রথ টানচে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২০৯

স্থান—দুর্গাপুজোর মণ্ডপ।

সময়—দিন, শরৎ কাল।

ক্যামেরা দুর্গা প্রতিমার মুখের ওপর থেকে পিছনে সরে এসে গ্রামকে দেখায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১০

স্থান—কাশবন।

সময়—দিন, শরৎকাল।

শরৎকালের ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা নীল মেঘের ওপর থেকে ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করে শালবনের ওপর।

লং শটে দেখা যায় চারটি লোক দূর থেকে ক্যামেরার দিকে আসছে।

কাছে আসলে বোঝা যায় ওরা হচ্ছে যতীন, রাম সিং, একজন কনেস্টবল ও একটা কুলির মাথায় যতীনের মালপত্র।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১১

স্থান—বাঁধের পাশে শালের জঙ্গল।

সময়—দিন।

দুর্গা তাড়াতাড়ি নদীর দিকে ছুটে যায়। হঠাৎ ডান দিকে কি দেখতে পেয়ে থেমে যায়।

দুর্গা : (গালে হাত দিয়ে) হেই মা!

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ একটা গাছের গোড়ায় এগিয়ে কাত হয়ে বসে আছে। পা ছড়ানো, মাথা ঝুলছে। পাশে একটা দিশি মদের খালি বোতল।

কাট্ টু।

দুর্গা অনিরুদ্ধর কাছে যায়। ঝুঁকে পড়ে তাকে ঠেলা দেয়।

দুর্গা : এ্যাই! শুনচ!

অনিরুদ্ধ ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়।

দুর্গা : ঐ ছাখো!...বলি শুনচ?...না: আর পারি না বাপু!....ওঠো ওঠো ওঠো....ওঠো!

দুর্গা অনিরুদ্ধকে ঠেলে টেনে তুলতে চেষ্টা করে।

অনিরুদ্ধ : (চোখ না খুলেই ধমকে) এ্যা—ও!

দুর্গা : উ—! আবার বলে এ্যা-ও....বলি কাল রেতে ছিলে কুন্ চুলোয় শুনি?

অনিরুদ্ধ : ক্যানে? তু ছাড়া কি আর মরবার জায়গা নেই?

দুর্গা : হ্যাঁ, খুব আচে! (বোতলটা তুলে) একজন খেয়ে মরচে,—আর একজন না খেয়ে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১২

স্থান—পদ্মর ভাঁড়ার ঘর।

সময়—দিন।

পদ্মর চেহারা আগের তুলনায় অনেক খারাপ, রুক্ষ, রুগ্ন। সে পাগলের মত ভাঁড়ার ঘরের পাত্রগুলো খুঁজছে।

উচ্চিংড়ে দরজার কাছে বসে কাঁদছে আর ঘিন্ ঘিন্ করছে।

উচ্চিংড়ে : হুঁ : !··· খিদে পেয়েছে · হুঁ হুঁ····কখন থেকে দিদি ?

পদ্ম উত্তর দেয় না। বৃথাই খোঁজে পাত্রগুলো !

উচ্চিংড়ে : (একটু থেমে) সকাল !

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৩

স্থান—নদীর পাড়ের শালের জঙ্গল।

সময়—দিন।

দুর্গা কোনক্রমে টেনে তোলে অনিরুদ্ধকে এবং ধরে ধরে কয়েক পা এগিয়ে নিয়ে যায়।

তারপর আবার ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে যায়।

দুর্গা : দূর্ ! থাকো তবে !

একটু দূরে রামসিং, কনেস্টবল, যতীন আর কুলীকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

রাম : আরে এ দুগ্ গা—

দুর্গা : ও মা !····এসে গ্যাচো ?···এ্যাদ্দেরি হল যে !

অনিরুদ্ধ : (হঠাৎ চোখ বুজেই ধমকে ওঠে) চল্ শালা ! দুগ্ গা কি ? দুগ্ গা মাই বল্।

যতীন এবং রাম সিং অবাক হয়ে থমকে যায়।

দুর্গা : (হেসে) ও কিছু লয় ! আসেন !··· আসেন বাবু—

ওরা চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৪

স্থান—গ্রামের পথ।

সময়—দিন।

ছিরু পাল ও ভূপালের ওপর থেকে ক্যামেরা প্যান্ করে। গ্রামের পথে একটু দূরে দেখা যায় দুর্গা, যতীন, রামসিং, কনেস্টবল এবং কুলি আসছে।

ছিরু : কে রে ভূপাল ?

ভূপাল : (তীক্ষ্ণ চোখে) উ...নজরবন্দীবাবু মনে লাইগছে !

ছিরু : কি বাবু ?

ভূপাল : উ 'ভিটিচু' না কি বলে····স্বদেশীবাবু। ক'দিন হল থানায় এসে রইছে যে !···এখুন বুঝলাম।

ছিরু : কি বুঝলি ?

ভূপাল : আজ্ঞে দুগ্ গা....সেদিন ছোট দারোগার ওখানে দেখলাম কি না !

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৫

স্থান—থানা।

সময়—দিন।

ক্যামেরা দুর্গার ওপর থেকে সরে এসে ছোট দারোগাকে কম্পোজিশনে ধরে। ঘরের বাইরে তখন ভূপাল ও অন্যান্য চৌকিদার মাইনে নিচ্ছে।

দুর্গা : জান্ না গো ছোটবাবু !····গরীবের খুব উবগার হয় তালে····

দারোগা : শুধু রাখবার ব্যবস্থা করলে হবে না, বুঝলি ! ঐ সঙ্গে ছোকরার মাথাটাও যদি কচ্ কচ্ করে চিবিয়ে দিতে পারিস····সরকারের কাছ থেকে সেটা বকশিস !

দুর্গা : (হেসে) হেঁ হেঁ····উ আর আপনাকে বইলতে হবে না !···মাথা চিবানো····(নীচু গলায়) হুঁ হুঁ·· নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখেন ক্যানে !

দারোগা : স্ স্ স্ ! (বিরক্ত হয়ে) যা ভাগ্ !

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—দিন।

দুর্গা খিল্‌খিল্ করে হাসতে হাসতে ফ্রেমে ঢোকে। তারপর আসে যতীন, রামসিং ও অন্যান্যরা।

দুর্গা : আপনারা দাঁড়ান,···আমি আইসচি—

দুর্গা উঠোনে ঢোকে।

যতীন পাখির ডাক শুনে আকৃষ্ট হয়। ক্যামেরার সামনে এগিয়ে এসে সে পাখিটাকে খুঁজতে চেষ্টা করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

দুর্গা কতগুলো টাকা পয়সা সামনে রাখে। ক্যামেরা ট্র্যাক ব্যাক্ করলে দেখা যায় পদ্ম বারান্দায় বসে আছে।

দুর্গা : এই ঘর ভাড়া পাঁচ, আর খোরাকি আট। এক মাসের আগাম।...ভালো করে তুলে রাখো।... কৈ রাখো?

রাম : (off voice) এ দুগ্‌গা—

দুর্গা : যাইরে বাবা, যাই—

দরজার কাছে ছুটে গিয়ে আবার কি মনে করে ফিরে আসে পদ্মর কাছে।

দুর্গা : ও হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার...। (গলা নামিয়ে) ছোট দারোগা বুল্‌ছিল—দেখতে অমন হলে কি হবে,... লোকটা নাকি বোমা বানায়!

পদ্ম : এঁ্যা?

দুর্গা : হ্যাঁ গো!...পারোতো এট্টু নজর রেখো দিকিনি।

দুর্গা ফ্রেমের বাইরে চলে গেলে ক্যামেরা চার্জ করে পদ্মর ওপর। সে কিঞ্চিৎ বিচলিত।

Mixes into

দৃশ্য—২১৮

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির বৈঠকখানা।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্ যতীনের আঙুল বাঁশি বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্ যতীন বাঁশি বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

ঘোমটা মাথায় পদ্ম দরজা দিয়ে উঁকি দেয়। উচ্চিংড়ে এসে তার পাশে দাঁড়ায়। পদ্ম ফিস্ ফিস্ করে তার কানে কিছু বলে। উচ্চিংড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যতীনের খাটিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। যতীন তখনও বাঁশি বাজাচ্ছে।

উচ্চিংড়ে : বাবু! বাবু!

যতীন : উঁ?

উচ্চিংড়ে : মা মণি শুধোলে, বিছনা কি তুমি পাততে পারবে—না পেতে দেবে?

যতীন : পারব।

উচ্চিংড়ে : বাইরে চলে যায়। যতীন আবার বাঁশি বাজাতে শুরু করে।

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে পদ্মর কাছে ফিরে আসে। সে আবার উচ্চিংড়ের কানে কানে কি যেন বলতেই সে যতীনের কাছে যায়।

উচ্চিংড়ে বাবু!

যতীন উঁ?

উচ্চিংড়ে মা মণি বল্লে, নতুন জায়গা। শোবার সময় ঐ জানালাটা বন্ধ করে রেখো। ওম্ আসবে।

যতীন : আচ্ছা।

উচ্চিংড়ে চলে যেতে আবার যতীন বাঁশি বাজাতে শুরু করে।

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে পদ্মর কাছে আসতেই আবার সে তার কানে কানে কিছু বলে। এবং সে যতীনের কাছে যায়।

উচ্চিংড়ে : বাবু! বাবু!

যতীন : উঁ?

উচ্চিংড়ে : মা মণি শুধোলো, তোমার খাবার ওখানে পাঠিয়ে দেবে?

যতীন উচ্চিংড়ের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক মুহূর্ত বাদে বলে—

যতীন : তোর মা মণিকে বল্, আমি খাবো না।

উচ্চিংড়ে : (দরজার আড়ালে দাঁড়ানো পদ্মর দিকে তাকিয়ে) বলছে খাবে না।

কাট্ টু।

পদ্ম দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

পদ্ম (নীচু গলায়) ক্যানে?

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে (যতীনকে) ক্যানে?

যতীন তোর মা মণিকে বলে দে, যে মা ঘরে জায়গা দিয়েও বাইরে ঘোম্‌টা টেনে দাঁড়িয়ে থাকে—তার কাছে আমি যাই না।

কাট্ টু।

পদ্ম দরজার আড়ালে লজ্জিতভাবে দাঁড়িয়ে, জিভ কাটে।

কাট্ টু।

যতীন সোজা পদ্মর কাছে চলে আসে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২১৯

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা পদ্মর কাছে এগিয়ে আসে যতীন।

যতীন : সেই তখন থেকে খালি দেখে যাচ্ছি!... খোলো! ....খোলো!... ঘোমটা!... খোলো!

ঝুপ্ করে মাথা নীচু করে যতীন পদ্মর পায়ে হাত দেয়, প্রণাম করে। পদ্ম যেন লাফিয়ে ওঠে।

পদ্ম : হেই মা!

যতীন : (পুনরুক্তি করে) হেই মা!! (তারপর জোর দিয়ে) হ্যাঁ মা!…এখন থেকে তুমি আমারও মা মণি! কি?…থাকবে মনে?

ক্যামেরা পদ্মর আনন্দউজ্জ্বল মুখের ওপর চার্জ করে। সঙ্গীত বেজে ওঠে। আনন্দে, উত্তেজনায় পদ্মর গলা আটকে যায়।

যতীন (off) : এ্যাই! কি যেন নাম তোর?

উচ্চিংড়ে (off) : উচ্চিংড়ে।

যতীন (off) : চল্‌তো রান্নাঘরে।

ওরা দুজন বারান্দায় নেমে আসে। যতীন মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পদ্মকে বলে—

যতীন : ও কি!….খিদে পায় না বুঝি?….এসো।

পদ্ম রান্নাঘরের দিকে ছুটে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৭০

স্থান—ছিরু পালের গোলা ঘর ও বারান্দা।

সময়—দিন।

দাসজী ছিরু পালের সঙ্গে দাবা খেলছে। ছিরু পালের দিকে সে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে—

দাসজী : এ্যাঁ? বলো কি হে?

ছিরু : "মা",…বুঝলেন—"মা"!….একবারে না বিইয়েই গণেশ জননী!

দাসজী : (চোখ টিপে) তা, …গণেশটির বয়েস কতো?

ছিরু : হেঁ হেঁ….বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি!

দাসজী : (   ) ই!!… কর্মকার কিছু বলে না?

ছিরু : কাকে বলবে?…উদিকে কামারশালে তালাচাবি ইদিকে কঁচিমালের থাঁই!….ঘরে ফিরে তবে তো?

(চলবে)

CHITRA-BIKSHAN ::

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 September 1979 Vol. 12 No. 12

Published by Asoke Chatterjee from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANEE 131B, B. B. Ganguli Street, Calcutta-12. Cover : De-Luxe Printers